

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৯৭৬

প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
প্রাণেশ মণ্ডল

মুদ্রাকর :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমতী বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়
করকমলেষু

সূচী

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে দ্বিতীয় চিন্তা

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অনেক কিছুই এ-পর্যন্ত লেখা হয়েছে। লেখকদের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বশ্রেণীর লেখক আছেন। বেশকিছু লেখা খুবই উচ্চ ধরনের।

ঐসব লেখা পড়ে, বিশেষত প্রগতিশীলদের রচনাদি পড়ে, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যেসব ধারণা সাধারণ পাঠকের মনে গড়ে ওঠে, তার দু'একটিকে কিছু নাড়াচাড়া করতে চাই। পাঠকরা স্মরণ রাখবেন, আমি স্বভাবে ভীরু এবং ভক্তিপরায়ণ। আমার ভীরুতা আমার ভক্তিকে মজবুত করেছে। সুতরাং বৃহৎ লেখকদের প্রবল বক্তব্যের সঙ্গে সমঝোতায় নামবার ইচ্ছা বা শক্তি আমার নেই। তবে মানুষমাত্রেরই মনে দ্বিতীয় চিন্তা ওঠে—তারই কিছু নিবেদন করতে চাই।

বিদ্যাসাগর-বিষয়ক রচনাদি পড়ে আমার মনে হয়েছে :

(১) বিদ্যাসাগরের প্রধান কাজ ছিল বিধবাদের ধরে-ধরে বিয়ে দেওয়া। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছিল, তিনি যেন প্রায় প্রতি রাত্রে কেঁদে বলতেন—হে হরি! আরও একটি দিন কেটে গেল, কিন্তু কোনো বিধবার বর জোগাড় করতে পারলুম না!

(২) বিদ্যাসাগর যতই ধুতি-চাদর পরুন, পায়ে তালতলার চটি দিন, আসলে তিনি সাহেব। কারো-কারো মতে, বাজে ইংরেজ সাহেব নন, খাঁটি রেনেসাঁসী সাহেব।

এই জাতীয় ধারণা, আমার সন্দেহ হচ্ছিল, আমার কূট মনেই বুঝি শুধু জেগেছে। সন্দেহভঞ্জনের জন্য বিদ্যাসাগর-ভক্ত সরল কিছু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তাঁরা বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে যেসব কথা ভক্তিভরে বলেছেন, তার থেকে উপরের দুটি ধারণার সমর্থন পেয়েছি।

পাঠকগণ আশ্বস্ত হোন, বিদ্যাসাগরের জীবনীপাঠক হিসাবে আমার জানা আছে—বিধবাবিয়ে প্রবর্তন ব্যাপারটা বিদ্যাসাগরের জীবনে কত বড ঘটনা ছিল। আমি এও জানি, বিদ্যাসাগর নাকি বিধবাবিয়ে প্রবর্তনকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি মনে করতেন।

ঠিক, তবে, বিদ্যাসাগরের তুলনায় বিদ্যাসাগরের কীর্তি কারো-কারো কাছে ছোট ব্যাপার। যেমন ধরা যাক, স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। বিবেকানন্দ খুবই বিদ্যাসাগরভক্ত। তাঁর ভক্তি, বিদ্যাসাগর-বিষয়ক অনেক লেখকের চেয়ে কম পাকা নয়। তিনি সানন্দে বলেছেন, উত্তর ভারতে তাঁর বয়সের এমন কোনো মানুষ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ যার উপরে বিদ্যাসাগরের ছায়া পড়েনি। তিনি একথাও সগৌরবে বলেছেন, রামকৃষ্ণের পরেই আমি বিদ্যাসাগরের অনুগামী। সুতরাং বিবেকানন্দের বিদ্যাসাগর-ভক্তির অভাব ছিল না। তারই জোরে তিনি মনে করতে পেরেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁর বিরাট শক্তিকে এমন একটি সংস্কারে প্রয়োগ করেছেন—যা জনগণের জীবনকে বিশেষ

স্পর্শ করে না। আর বিবেকানন্দের ছিল জনগণ-'বাতিক'। তিনি সবকিছুরই হিসাব করতেন—ব্যাপক জনসমষ্টির কল্যাণের মাপকাঠিতে। বিধবাবিয়ের সমস্যা, তাঁর মতে, বড় জোর হিন্দু উচ্চশ্রেণীর কিছু মানুষের সমস্যা। নিম্নবর্ণে বিধবাবিয়ে পূর্বাবধি প্রচলিত। তাছাড়া সমস্যাটার উৎপত্তির পিছনে ধর্মনৈতিক কারণের মতো অর্থনৈতিক কারণও যথেষ্ট। জনসমষ্টিতে স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক হারের প্রশ্নও আছে। যেদেশে কুমারী মেয়ের বিয়ে হয় না, সেদেশে বিধবাবিয়ের জন্য ব্যস্ত না হলেও চলে। আসল সমস্যা বিধবাবিয়ের নয়—তা বাল্যবিবাহের এবং বহুবিবাহের। পুরুষের বহুবিবাহ যদি বন্ধ করা যায়, বিধবাবিয়ের সমস্যা প্রায় থাকে না—এবং নারীর বাল্যবিবাহ বন্ধ করলে বালবিধবা হওয়ার সম্ভাবনাও দূর হয়। বিবেকানন্দ বলতেন, যে-লোক বাল্যবিবাহ দিতে পারে, তাকে আমি খুন করতেও পারি।

সুতরাং বিধবাবিয়ে প্রবর্তনের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর যতখানি হৃদয়চালিত, ততখানি বুদ্ধিচালিত নন। ভরসা করি, একথা বললে কেউ রাগ করবেন না যে, রামমোহনের মনীষা বিদ্যাসাগরের ছিল না। তাই তিনি বিভিন্ন সংস্কারসাধনে রামমোহনের তুল্য সাফল্যলাভ করতে পারেননি।

তাহলেও, অনেকের সঙ্গে আমি জানি, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন কী প্রচণ্ড সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। হিন্দুসমাজ মূলে নাড়া খেয়েছিল। সেই শিহরিত সমাজ নতুন চিন্তায় ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, জ্ঞাতে অজ্ঞাতে প্রস্তুত হয়েছিল পরিবর্তনের জন্য। বিদ্যাসাগর বহুসংখ্যক বিধবার বিয়ে হয়তো দিয়ে উঠতে পারেন নি, তাঁর দেহান্তের পরেও বিধবাবিয়ের যথেষ্ট চল হয়নি, কিন্তু তিনি যে-সামাজিক নবচেতনার সৃষ্টি করেছিলেন, তার দ্বারা পরবর্তী সংস্কার আনা সহজ হয়েছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য কালের তাগিদের মূল্য যথেষ্ট। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রবর্তন-সংস্কারের চেয়ে অনেক বড় বৈপ্লবিক সংস্কার বিবাহবিচ্ছেদ ব্যবস্থা হিন্দুসমাজ কার্যত বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করেছে পরবর্তীকালে। এক্ষেত্রে কালের তাগিদের কথা মনে রেখেও বলতে হবে—বিদ্যাসাগর প্রমুখেরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন বলেই এ-জিনিস হিন্দুসমাজে সহজে ঘটতে পেরেছে, যা ঘটেনি, ধরা যাক, মুসলমান সমাজে, যেখানে এখনও পুরুষের বহুবিবাহের অবাধ সুযোগ এবং সমাজের প্রায় অর্ধাংশ বোরখাবন্দী, কারণ—ঐ সমাজে বিদ্যাসাগর জাতীয়েরা আবির্ভূত হননি।

এসব কথা জানি, মানি, তবু—ঐ সবকিছুই হয়েছে পরোক্ষ ফল হিসাবে। প্রত্যক্ষ ফলের হিসাবে—বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রবর্তন-সংস্কার ব্যর্থ, কারণ, আগেই বলেছি, যথেষ্ট সংখ্যক বিবাহযোগ্য বিধবা তখনি বিবাহিত হয়নি, আর আজকে, কাল পরিবর্তিত হয়েছে বলে, বিধবাদের বিয়ে বা সধবাদের বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে সমাজ মাথা ঘামাচ্ছে না। এক্ষেত্রে একান্নবর্তী পরিবারপ্রথার ক্রমবিলয় এবং সাধারণের মন গ্রাম থেকে শহরমুখী হওয়াই প্রধান পরিবর্তন-কারণ। পুরাতন সংস্কার যতক্ষণ প্রবল ছিল বিদ্যাসাগর শত চেষ্টাতেও কিছু ক'রে উঠতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকে দোষ দেন, তিনি

নাকি শরীরধর্মী বিধবা দেখলে গুলি করে মারতেন। দরদী শরৎচন্দ্র খুব কাঁদাকাটা ক'রে এই কথা বলেছেন, যদিও একই শরৎচন্দ্র বিধবা রাজলক্ষ্মীকে এমন বড় প্রেম দিয়েছেন, যা জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে না এনে কেবলই ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়। এবং রবীন্দ্রনাথ, সংস্কারমুক্ত রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম-পন্থায় বিধবা রোহিণীর জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা না ক'রে বিধবা বিনোদিনীর জন্য মৃদুতর শাস্তিব্যবস্থা করেছিলেন—যাবজ্জীবন কারাবাস, না—কাশীবাস!

কথায় কথায় সরে গেছি। বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমার কিন্তু কদাপি সন্দেহ হয়নি—বিদ্যাসাগর বিধবা দেখলেই পাত্রী-বিবেচনা করতেন! বিদ্যাসাগর হিন্দুসমাজেরই মানুষ ছিলেন—হিন্দুসংস্কারকে তিনি যথেষ্ট মান্য করতেন। তিনি নিশ্চয় বিধবাদের বিয়ে দেওয়াকে, গৌরীদান করার মতো পুণ্যকর্ম মনে করতেন না। মাঝে-মাঝে সে-রকম মনে হয় বটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, সংস্কারকরা বিশেষ ঝোঁকে থাকেন বলে সময়বিশেষে সংস্কার বিষয়ে পরিমাণহীন জোর দিয়ে ফেলেন—বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। আসল ব্যাপার, বিদ্যাসাগর মানুষের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। কোনো সামাজিক প্রথার নাম ক'রে মানুষের সহজ অধিকার অস্বীকার করাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি—তারই বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছেন। বিধবাদের যদি ইচ্ছা হয় তো তারা যেন বিয়ে করতে পারে, সেই অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার অধিকার সমাজের নেই, বিশেষত পুরুষ যখন যথেচ্ছ বিবাহে অধিকারী। বিধবাবিয়ের পক্ষে বিদ্যাসাগরের লড়াইকে আমি মানুষের স্বাধীনতার পক্ষে লড়াই বলেই মনে করতে চাই।

উল্টোপক্ষে যদি কেউ আধুনিকতায় আক্রান্ত হয়ে এমন মনে করেন যে, বিদ্যাসাগর অবাধ যৌন স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, কিংবা আত্মশাসনকে অনুচিত মনে করতেন, তাহলে দুঃখের সঙ্গে বলতে হবে, তিনি বিদ্যাসাগরকে কড়াক্রান্তিও বোঝেননি। বিদ্যাসাগর, যিনি নিজ জীবনে কেবলই ত্যাগ ক'রে গেছেন (ত্যাগের আধুনিক প্রতিশব্দ 'আত্মনিগ্রহ')—তিনি ত্যাগের মর্যাদা নষ্ট ক'রে ভোগকে বদন ব্যাদান করবার সুবিধা ক'রে দিতে প্রাণপাত করেছিলেন—এমন অশালীন কথাবার্তা না বলাই ভালো। মনে করিয়ে দেব, বিদ্যাসাগরের আদর্শ মানুষেরা ত্যাগেরই বিগ্রহ—ভোগের নয়। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর রীতিমত ঐতিহ্যবাদী। বিদ্যাসাগর শেক্সপীয়ার পড়েছিলেন, শেক্সপীয়ারের অনুরাগীও ছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক কালিদাস। এবং বিদ্যাসাগরের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নারী-চরিত্র হল সীতা। সীতার বনবাসের শেষে সীতাচরিত্রের বন্দনা ক'রে বিদ্যাসাগর লিখেছেন:

> "সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন; তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কখনও কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিতে পতিপরায়ণতা গুণের এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয়, বিধাতা মানবজাতিকে পতিব্রতাধর্মে উপদেশ দিবার নিমিত্ত সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্বগুণসম্পন্না কামিনী কোনও কালে ভূ-মণ্ডলে

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ন্যায় সর্বগুণসম্পন্না পতি পাইয়া কখনও কোনও কামিনী তাঁহার মত দুঃখভাগিনী হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।"

হা বিধাতঃ! বিদ্যাসাগর এ কী করলেন !! সর্বকালে পৃথিবীর সর্বোত্তম নারী হলেন পাতিব্রত্যধর্মের প্রতিমা—ত্যাগ বা আত্মনিগ্রহকে বরণ করেই যিনি বিদ্যাসাগরের চোখে মহিমান্বিত !!! এবং বিদ্যাসাগর কী জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল—তিনি সীতার প্রতি প্রভূত অন্যায়কারী রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে সীতার মুখে বা মনে অভিযোগমাত্র দিলেন না ('সীতার বনবাস' অনুযায়ী বলছি)—যা এমনকি সীতার আদিস্রষ্টা বাল্মীকি পর্যন্ত না দিয়ে পারেননি !

বিচিত্র কথা, সীতার বন্দনায় খ্রীস্টান মধুসূদন (যিনি বানরনেতা রামচন্দ্রকে মোটে পছন্দ করতেন না), অজ্ঞেয়বাদী (উহু) বিদ্যাসাগর এবং অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ জোট-বদ্ধ। এই সীতা, পুনশ্চ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ভোগবতী নন, ত্যাগব্রতী।

সুতরাং আমাদের এই সিদ্ধান্তই করতে হচ্ছে, বিদ্যাসাগর যদিও স্বাভাবিক দেহধর্মকে স্বীকার করতেন, স্বাভাবিক জীবনযাপনে মানুষের অধিকার আছে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু তাঁর নিজ হৃদয়ে ত্যাগ-তপস্যার প্রতিমার জন্যই পূজাবেদী নির্মিত ছিল, এবং তিনি নিজ জীবনের ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা ঐ দেবীর পূজার যোগ্যতা চূড়ান্তভাবে অর্জন করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর আমাদের সমাজে আকস্মিক বিচ্ছিন্ন আবির্ভাব—একথা যাঁরা বলেন তাঁরা বিদ্যাসাগরের বিরাটত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েই ঐ কথা বলেছেন, বড়জোর এইটুকু মেনে নিতে পারি, নচেৎ আমরা তো জানি যে, 'বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়' এটা নিছক কাব্যিক প্রবচন, এবং ইতিহাসের গর্ভে ঐতিহাসিক পুরুষেরা জন্ম নেন, এটা কাব্যিক শোনালেও বাস্তব সত্য। বিদ্যাসাগরকে সৃষ্টি করবার মতো শক্তি এই সমাজের না থাকলে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ঘটত না কদাপি।

বিদ্যাসাগর ধুতি-চাদর-পরা ইংরেজ—এও একটি কাব্যচমৎকার কথা। বিদ্যাসাগর আত্যন্ত ভারতীয়, কোনো সন্দেহ না রেখে। কোনো মানুষ যদি বড় হয়ে পড়েন, যদি তিনি সামাজিক জড়ত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, অমনি তিনি বিদেশী হয়ে পড়বেন—এ বড় মজার কথা। একথা মানলে লেনিন রাশিয়ান নন, মার্কস জার্মান নন, মাও সে তুং চীনা নন। স্বদেশী দৃষ্টান্তে ফিরে এলে বলতে হয়—রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র—কেউ ভারতীয় নন। কথাটা আমি একেবারে উল্টে বলতে চাই—বিদ্যাসাগর যেহেতু নিজ সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন সমাজের কল্যাণের জন্য—তাই তাঁর থেকে বড় স্বাদেশিক সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ যে বিদ্যাসাগরকে পৌরুষের মহাপ্রকাশ বলেছেন—সেই পৌরুষ বিদ্যাসাগরকে আত্মমর্যাদা দিয়েছিল—যার জোরে

সদর্পে সগৌরবে তিনি তাঁর ভারতীয়ত্ব নিয়ে বিচরণ করতেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ ভারতীয় যিনি ভারতীয় শ্রেষ্ঠ বস্তুকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিবেকানন্দের বিদ্যাসাগর-আনুগত্যের মূলে বিদ্যাসাগরের এই ভারতীয় দর্প। বিবেকানন্দ বারবার বিদ্যাসাগরের একটি গল্প বলতেন: বিদ্যাসাগরকে বড়লাট আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগর ধুতি-চাদর-চটি পরেই সেখানে হাজির হন। তাঁর অ-দরবারী পোশাক দেখে তাঁকে গেটে আটকানো হলে তিনি অনবদ্য নাটকীয় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন—"কেন আ-মা-কে কি আমন্ত্রণ জানানো হয়নি!" বিদ্যাসাগর বলতে চেয়েছিলেন—আমার পোশাককে নয়, আমি মানুষটিকেই তো আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, ধুতি-চাদর নিয়েই যে-আমি গড়ে উঠেছি! পরানুকরণপ্রিয় পরমুখাপেক্ষী তৎকালীন শিক্ষাভিমানী ভারতীয় উচ্চসমাজে বিদ্যাসাগর তাই ভারতীয় মর্যাদার প্রতীক—বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে।

সুতরাং বিদ্যাসাগরী চটি নিয়ে (যা আমাদের শিরোধার্য) বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকুন—তাঁকে রেনেসাঁসী বুট পরিয়ে বিপদে ফেলার প্রয়োজন নেই। সংস্কারক বিদ্যাসাগর এখনো বেঁচে থাকলে অবশ্যই কৌতুকবোধ করতেন যদি দেখতেন, তিনিই সংস্কারযোগ্য মনুষ্য হয়ে উঠেছেন। আর, স্মরণ করিয়ে দেব, বিদ্যাসাগর তাঁর এই আত্মমর্যাদা 'নিস্তেজ' ভারতীয় রক্ত এবং 'অধঃপতিত' ভারতীয় সমাজ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর বিষয়ে তাঁর অনবদ্য রচনায় বিদ্যাসাগরকে 'মাতার পুত্র'—এই অভিধায় ভূষিত করেছেন। সার্থক কথা। বিদ্যাসাগর তাঁর মাতার কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছিলেন দেখতেই পাই। তিনি এই সমাজের আরও অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছেন। করুণার দেবীকে দেখেছিলেন বিধবা রাইমণির মধ্যে, সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্বশীলতা এবং পরার্থপরতাকে দেখেছেন মায়ের বড় মামা রাধামোহন বিদ্যাভূষণের মধ্যে। পরিবর্তিত সমাজে একান্নবর্তী পরিবার অচল, একথা বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, কিন্তু একান্নবর্তী পরিবার-চক্রকে যেখানে ত্যাগ ও প্রেমের রক্তস্নেহ ঢেলে সচল রাখা হয়েছিল, সেখানে তাঁর অকুণ্ঠ প্রণতি। পুরাতন ভারতীয় ধারার মনুষ্য রাধামোহন বিদ্যাভূষণ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কিছু বক্তব্য:

> "অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্যা এই পরিবারে যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধাসহকারে সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।…ফলকথা এই, অন্নপ্রার্থনায় রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ হইয়া কেহ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে-অবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যত হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়া সকলেই পরম সমাদরে অতিথিসেবা ও অতিথিপরিচর্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।…অনুগত গ্রামবৃন্দের লোকদের বিবাদভঞ্জন, বিপদমোচন, অসময়ে সাহায্যদান প্রভৃতি কার্যই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবনযাত্রার সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অনেক অর্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, কিন্তু সেই অর্থের সঞ্চয়, অথবা

স্বীয় পরিবারের সুখসাধনে প্রয়োগ, একদিন একক্ষণের জন্যও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কেবল অন্নদান ও সাহায্যদানেই সমস্ত বিনিয়োজিত ও পর্যবসিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, প্রাতঃস্মরণীয় রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত অমায়িক, পরোপকারী ও দয়াপন্ন পুরুষ সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।"

'পাতুলনিবাসী মুখটী' রাধামোহন বিদ্যাভূষণ নামক 'ইংরাজের' কাছে সুতরাং বিদ্যা-সাগর অনেক কিছু শিখেছিলেন !!

রাধামোহনের চরিতকথা বলবার সময়ে বিদ্যাসাগর তাঁর হৃদয়বত্তার কথাই বেশি বলেছেন। আর নিজ ঠাকুর্দার কথা বলবার সময়ে তাঁর পৌরুষবীর্যের উপরই বিদ্যাসাগর অধিক জোর দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের অসমাপ্ত 'আত্মচরিতে'র আদর্শপুরুষ কোনো সন্দেহ না রেখে রামজয় তর্কভূষণ। এবং, এখানে আমি বলতে বাধ্য, প্রগতিশীল মান-বিকতার দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের মনোভাব অত্যন্ত গর্হিত।

আধুনিক চিন্তাশীলতা, যুক্তিশীলতা কাউকে পরোয়া করতে দায়বদ্ধ নয়। পত্নীর প্রতি রামচন্দ্রের অবিচারের জন্য লক্ষ্মণ বা সীতার চেয়ে বেশি কান্না কলমে কেঁদেছেন একালের মানুষ। শ্রীচৈতন্যের পত্নীত্যাগ এবং পত্নীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচলিত দাম্পত্য আচরণের অভাব নিয়ে ফোঁস্‌-ফাঁস্‌ অনেক শুনেছি। সন্ন্যাস নামক উৎপাতটা ভারতবর্ষের কত সর্বনাশ করেছে, সে বিষয়েও আমরা অবহিত হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর—প্রগতিশীল বিদ্যাসাগর—তাঁর নিতান্ত অবিচারী, নিষ্ঠুর, দায়িত্বহীন ঠাকুর্দার প্রতি অমন ভক্তিপরায়ণ হলেন কি করে? তাহলে কি বিদ্যাসাগর নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় বংশাভিমানের দুর্বলতায় ধরা দিয়েছিলেন?

বিদ্যাসাগরের আত্মচরিত থেকে আমরা জেনেছি—

রামজয় তর্কভূষণ উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ও চার কন্যা জন্মেছিল। তর্কভূষণের সঙ্গে তাঁর দুই বড় ভাইয়ের মনকষাকষি হয়। বড় ভাইয়েরা 'অবমাননাব্যঞ্জক বাক্যপ্রয়োগ' করেন। তাতে তাঁর 'অন্তঃকরণ নিরতিশয় ব্যথিত' হয়। এবং তিনি স্ত্রীপুত্রকন্যাসমেত সাতটি প্রাণীকে শ্বাপদবৎ ভাইদের কাছে ফেলে 'কাহাকেও কিছু না বলিয়া' এককালে দেশত্যাগী হন।

তারপর কী হল? দেবরদের হাতে বহু লাঞ্ছনার পরে দুর্গাদেবী ৬টি নাবালক ছেলে-মেয়ের হাত ধরে বাপের বাড়ি গেলেন। বাবা স্নেহে সমাদরে তাঁদের গ্রহণ করলেন, কিন্তু ভাই ও ভাইয়ের বৌ দেখলেন মহা আপদ। "কিছুদিনের মধ্যেই পুত্রকন্যা লইয়া পিত্রালয়ে কালযাপন করা দুর্গাদেবীর পক্ষে বিলক্ষণ অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি: ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্যা তাঁহার উপর অতিশয় বিরূপ। অনিয়ত কালের জন্য সাতজনের ভরণপোষণের ভারবহনে তাঁহারা কোনোমতে সম্মত নহেন। তাঁহারা দুর্গাদেবী ও তদীয় পুত্রকন্যাদিগকে গলগ্রহবোধ করিতে লাগিলেন। রাম-সুন্দরের বনিতা কথায় কথায় দুর্গাদেবীর অবমাননা করিতে আরম্ভ করিলেন।" এক্ষেত্রে

দুর্গাদেবীর বাবার কিছু করার ছিল না—একমাত্র করণীয় রূপে তিনি 'সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত'চিত্তে 'স্বীয় বাটীর অনতিদূরে এক কুটীর নির্মিত করিয়া' দিতে পেরেছিলেন। সেখানে দুর্গাদেবী আশ্রয় নিয়ে সুতো কেটে সাতজনের ভরণপোষণ যেভাবে হওয়া সম্ভব সেইভাবে ক'রে গেলেন বছরের পর বছর। অবস্থা এই পর্যায়ে পৌছেছিল যে, তাঁর বড় ছেলে ঠাকুরদাসের বয়স ১৪/১৫ হলে একাকী তাঁকে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় কলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল।

অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা, স্পষ্টবাদী বিদ্যাসাগর নিছক আত্মসম্মানের প্রেরণায় ছয় সন্তানের জনক ঠাকুর্দার গৃহত্যাগ করাকে—যার ফল স্ত্রীপুত্রকন্যার সর্বনাশ—মোটেই নিন্দা করেননি, বরং এই ব্যক্তির প্রতি সর্বোচ্চ প্রশস্তি বর্ষণ করেছেন। বিদ্যাসাগরের চোখে তিনি 'সাক্ষাৎ ঋষি'। বিদ্যাসাগরের জন্মকালে তিনি যে পরিহাসবাক্য বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাকে বহু সমাদরে উল্লেখ করেছেন, এবং বিদ্যাসাগরের ব্রাহ্ম জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ধর্মপরায়ণ যোগী তীর্থপর্যটনকারী' রামজয় তর্কভূষণের অলৌকিক স্বপ্নদর্শনের উল্লেখ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি, যার দ্বারা রামজয় জানতে পেরেছিলেন, "তাঁহার বংশে এক শক্তিশালী অদ্ভুতকর্মা মহাপুরুষের আগমন হইবে, সে শিশু উত্তরকালে বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে, তাহার কার্যকলাপে দেশের গৌরব বর্ধিত হইবে, সে দয়ার অবতার হইয়া তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিবে।" জীবনীকার আরও অগ্রসর হয়ে লিখেছেন, "শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উক্ত সিদ্ধপুরুষ রামজয় তর্কভূষণ শিশুর জিহ্বার তলে আলতায় কিছু লিখিয়া বলিয়াছিলেন, এ শিশু উত্তরকালে সকলকে পরাজয় করিবে, ইহার প্রতিজ্ঞার পরাক্রমে চারিদিক কম্পিত হইবে, দয়াদাক্ষিণ্যে সকলে মুগ্ধ হইবে। আমিই ইহার দীক্ষাগুরু হইলাম, এ বালক আর অন্য গুরু গ্রহণ করিবে না; আমার স্বপ্নদর্শন আজ সফল হইল, আমার বংশ পবিত্র হইল।" পিতামহ সূতিকাগৃহেই তাঁর দৈবশক্তিসম্পন্ন পৌত্রের নাম 'ঈশ্বরচন্দ্র' রেখেছিলেন, একথাও উক্ত জীবনী থেকে জানতে পারি। 'দৈববলসম্পন্ন মহাপুরুষ'দের জন্মকাণ্ডে 'অলৌকিকতা' থাকতে পারে, ব্রাহ্ম জীবনীকার তা মেনে নিয়েছেন, এবং বিদ্যাসাগরের 'পূর্বপুরুষ ও শৈশবচরিতবিষয়ক বিবরণের অধিকাংশ [যে] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরচিত শৈশবচরিত হইতে গৃহীত হইয়াছে' তাও জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে জেনেছি, বাকি 'বর্ণিত বিষয়ের কোনো কোনো অংশ তাঁহার [বিদ্যাসাগরের] নিকট শুনিবার সুযোগ'ও উক্ত গ্রন্থকারের হয়েছিল।

রামজয় বিদ্যাসাগরের দীক্ষাগুরু—একথা কি চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরের কাছ থেকেই শুনেছিলেন? এই কথাটা পূর্ববর্তী শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনীতেও আছে। কিন্তু কেবল শম্ভুচন্দ্রের উপর নির্ভর ক'রে সংবাদ বণ্টনের ইচ্ছা চণ্ডীচরণের ছিল না, আমরা জানি।

সে যাই হোক, জন্মমাত্রে পিতামহকে দীক্ষাগুরুরূপে বিদ্যাসাগর পান বা না-পান—পিতামহের চরিত্র যে বিদ্যাসাগরের বরেণ্য তা তাঁর লেখা থেকেই আমরা পাই। তাঁর বিষয়ে বিদ্যাসাগর লিখেছেন:

"তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন ; কোনও অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে অথবা কোনও প্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন।... উপকার প্রত্যাশায় অথবা অন্য কারণে তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল।"

ভাইদের নীচতায় পীড়িত রামজয় গৃহত্যাগ করেছিলেন। বহু বৎসর পরে দেশে ফিরে এসে তিনি শাসকের নীচতার ও উৎপীড়নের সম্মুখীন হলেন। এবার গৃহত্যাগ করলেন না, সদর্পে অবজ্ঞা ক'রে চললেন।—

"তর্কভূষণ মহাশয়...সর্বদা সর্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, এ-গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সকলই গরু।"

গ্রামের সকলেই গরু, একথাটা তর্কভূষণ মহাশয় সন্দেহাতীতভাবে ঘোষণা করার জন্য অব্যর্থ দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। একদা বিষ্ঠাপূর্ণ একটি স্থানের উপর দিয়ে যেতে তাঁকে নিষেধ করা হলে তিনি বলেছিলেন—"এখানে বিষ্ঠা কোথায়? আমি গোবর ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না। যে-গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সেখানে বিষ্ঠা কোথা হইতে আসিবেক?"

তাই বলে তর্কভূষণ উগ্র অহঙ্কারী ছিলেন না। তিনি "নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন। কি ছোট, কি বড়, সর্ববিধ লোকের সহিত সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন।"

তবু তাঁকে অহঙ্কারী মনে হত কেন, সেকথাও বিদ্যাসাগর ব্যাখ্যা করেছেন :

"তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন।"

আর ছিল তাঁর ভয়ঙ্কর সরলতা :

"তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন ; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান ধনবান্ ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।"

তর্কভূষণ নামক ধার্মিক মানুষটি যে সর্বদা অহিংসাচর্চা করাকেই ধর্মচর্চা করা বলে বিবেচনা করতেন না, তার দৃষ্টান্তও সানন্দে বিদ্যাসাগর দিয়েছেন। তিনি "অতিশয় বলবান, নিরতিশয় সাহসী, এবং সর্বতোভাবে অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন। এক লৌহদণ্ড তাঁহার চিরসহচর ছিল ; উহা হস্তে না করিয়া কখনও বাটীর বাহির হইতেন না।" এই লোহার ডাণ্ডা দিয়ে তিনি কিভাবে হিংস্র মানুষ-ডাকাত, এবং পশু-ভালুককে সায়েস্তা করেছিলেন, তার বিশেষ বিবরণ বিদ্যাসাগর দিয়েছেন। সগৌরবে লিখেছেন, ভালুকের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত শরীরে ধারণ করেছিলেন।

পিতামহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মোট বক্তব্য :

"তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এজন্য, সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া নির্দেশ করিতেন।"

পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের রচনা বিদ্যাসাগরের মনোজগৎকে অনেকখানি প্রকাশ করেছে। সাংসারিক ব্যাপারে অত্যন্ত দায়িত্বশীল বিদ্যাসাগর-পিতা ঠাকুরদাস বিদ্যাসাগরের আদর্শ পুরুষ নন—দায়িত্বহীন, আপসবিরোধী রামজয় তাই। রামজয়ের বিষয়ে লিখবার সময়ে বিদ্যাসাগর জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আত্মকথাই বলে গেছেন। ও-কাহিনী যতখানি রামজয়ের, সেই পরিমাণে বিদ্যাসাগরের।

পুরাতন কথায় ফিরে আসা যাক। রামজয় তর্কভূষণের জন্ম ইংলণ্ডে নয়, ফ্রান্স জার্মানী কিংবা রোমে নয়—ভারতবর্ষেই। চীনে রাশিয়ায় বা আমেরিকায় নয়—বাংলাদেশে। বিদ্যাসাগর এই বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষেরই মানুষ। এ দেশে অবিদ্যাসাগর এবং বিদ্যাসাগর দুইই আছে। অবিদ্যাসাগরের তীর থেকে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে, চোখ বন্ধ ক'রে ছুটতে-ছুটতে শহরের সাজানো অ্যাপার্টমেন্টে (যার ঘরে-ঘরে লাগোয়া পায়খানা) ঢুকে পড়লে বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি কোথায় তা দৃষ্টির অগোচরে থেকেই যাবে। বিদ্যাসাগরের জন্মস্থানের নাম বীরসিংহ—ইংরেজ আমলের আগেই ঐ নাম দেওয়া হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচর্চা

১

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিশীল সাহিত্যজীবনের ব্যাপ্তি মোটামুটি ত্রিশ বৎসর। কালব্যাপ্তির তুলনায় তাঁর সৃষ্টিপরিমাণ আপেক্ষিকভাবে অল্প। কিন্তু সেই পরিমাণের মধ্যে তাঁর কৃষ্ণবিষয়ক রচনার পরিমাণ আবার আপেক্ষিকভাবে বেশিই ধরতে হবে। কৃষ্ণ-ভাবাত্মক তিনটি গ্রন্থই আমরা পেয়ে যাচ্ছি—ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। তাছাড়াও নানা প্রসঙ্গে কৃষ্ণকথা এসেছে তাঁর সাহিত্যে। বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি কোনো মনুষ্য বা দেবতা গ্রাস করে থাকেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু সাহিত্যে কৃষ্ণচর্চা প্রথমাবধি করেননি। বঙ্গদর্শনে ১২৮১ চৈত্র মাসে প্রকাশিত 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধ থেকে যদি তাঁর কৃষ্ণচর্চার সূচনা ধরি তাহলে মনে রাখতে হবে, তার আগে তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ পেরিয়েছে এবং দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী গ্রন্থাকারে বেরিয়ে গেছে; বিবিধ প্রবন্ধ, সাম্য, এমনকি কমলাকান্তের দপ্তরও প্রকাশিত। বঙ্গদর্শনের সম্পাদনাও তিনি কয়েক বৎসর ধরে করছেন। আবার, বঙ্গদর্শনের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধকে তাঁর বিক্ষিপ্ত আগ্রহ বলে যদি সরিয়ে রাখা যায় (তেমন করার কারণ আছে: ঐ লেখাটি রচনাক্ষেত্রে অন্তত ধারাবাহিক কৃষ্ণচর্চার পরিচায়ক নয়) তাহলে প্রচার পত্রিকার ১২৯১ শ্রাবণ সংখ্যায় 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধ কিংবা একই পত্রিকায় একই বৎসরের আশ্বিন সংখ্যায় সূচিত ধারাবাহিক 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনা থেকেই তাঁর আসল কৃষ্ণচর্চার সূত্রপাত বলতে হবে—যখন তাঁর বয়স ৪৬ হয়ে গেছে। এর দশ বৎসরের মধ্যেই তাঁর দেহাবসান হবে। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবনের শেষ দশ বৎসরেই নিবিষ্টভাবে কৃষ্ণচর্চা করে গেছেন।

২

সহসা আঘাতে চৈতন্যোদয় জাতীয় একটা ব্যাপারকে বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী হিন্দুধর্ম ও দর্শনচর্চার সঙ্গে সাধারণত যুক্ত করা হয়—যে-ঘটনা ঘটেছিল ১৮৮২-র সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে। সেই বঙ্কিম-হেস্টি বিতর্কের পরেই বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম এবং তার প্রতিভূ কৃষ্ণকে অবলম্বন করে প্রচারকার্যে নেমে পড়েন—এমনও বলা হয়। হেস্টি-বিতর্কের বিদ্যুৎস্পর্শের চমক-মূল্য অবশ্যস্বীকার্য, কিন্তু তার আগে কি বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন?

তথ্যমুখে কথাটা দাঁড়ায় না। তাঁর রচনাদির মধ্যে হিন্দু ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতনতা, এমনকি মমত্বযুক্ত আকর্ষণ পূর্বাবধি দেখা যায়। তথাপি কতকগুলি প্রশ্ন থাকেই, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রামাণ্য জীবনীর অভাব অনেক প্রশ্নের উত্তরকে অমীমাংসিত করে রেখেছে।

বঙ্কিম নাকি নাস্তিক ছিলেন।

'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ'-এ ধৃত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিকথায় পাই, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবনী রচনার প্রয়াসকে উৎসাহ দেননি, কারণ তাঁর "জীবন অসার, তা লিখিয়া কি হইবে?" বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "জীবনে অনেক ভ্রমপ্রমাদ আছে।…আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন।…আমার জীবনের কতক বড় শিক্ষাপ্রদ, সকল বলিলে লোকে ভাবিবে কি যে কী একরকমের অদ্ভুত লোক ছিল। আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্মে আমার মতিগতি অতি আশ্চর্য রকমের। কেমন করিয়া তাহা হইল, জানিলে লোকে আশ্চর্য হইবে।"[১]

খুবই দুঃখের বিষয়, 'নাস্তিক' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মতিগতি পরিবর্তনের 'আশ্চর্য' কাহিনী শ্রীশ মজুমদারকে বলেননি।

ঈশ্বর-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঔদাসীন্যের সাক্ষ্য দিয়েছেন কালীনাথ দত্ত। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে (বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স যখন ২৬) কালীনাথ বঙ্কিমকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কীটাণু, পুকুরের দূষিত জল, উদ্ভিদের সূক্ষ্মভাগ, জীবশোণিত পরীক্ষা করে পরীক্ষিত বস্তুর "অপরূপ শোভা-সৌন্দর্যে" আশ্চর্যান্বিত হতে দেখেছেন। "জগতের মধ্যে কেবল আমরাই কুৎসিত আর আর সমস্তই সুন্দর।" কালীনাথ লিখেছেন: "এই সমস্ত পরীক্ষার সময় আমি কখনো তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরভক্তির অপার উচ্ছ্বাস দেখি নাই; কখনো ঈশ্বরের নামগুণ শুনি নাই, বা ঈশ্বরবিশ্বাসের কোনো পরিচয় পাই নাই।" তিনি আরও লিখেছেন:

"বঙ্কিমবাবুর এতগুলি সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁর জীবনে ঈশ্বরবিশ্বাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইত। আমি থিওডোর পার্কারের Ten Sermons নামক পুস্তকখানি তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন এবং সপ্তাহান্তে তাহা আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'Such worst English I have never read!' আমি পার্কারের লেখার ও ইংরাজির খুবই ভক্ত ছিলাম। তাঁহাকে হেয়জ্ঞান-সূচক মন্তব্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম।"[২]

তাহলে ২৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরপ্রসঙ্গে নিরুত্তাপ। এই পর্বে তিনি কোঁত্, বেন্থাম, মিল, স্পেনসার ও তাঁদের অজ্ঞেয়বাদী বা নিরীশ্বরবাদী মানবদর্শনে নিমজ্জিত। কিন্তু তখনো কি স্বয়ং নাস্তিক? তাঁর কৃষ্ণভক্ত পিতার প্রতি তাঁর ভক্তি, পিতার জীবনে সন্ন্যাসীদের অপ্রাকৃত প্রভাব সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস, চট্টোপাধ্যায় পরিবারে অলৌকিকভাবে আগত গৃহদেবতা রাধানাথকে কেন্দ্র করে পূজাপার্বণ—এ সকলের প্রভাব কি তাঁর জীবনে ছিল না? তাঁর ছোটভাই পূর্ণচন্দ্র অবশ্য স্মৃতিকথায় বালক বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণবিষয়ক একটি অসুবিধাজনক প্রশ্নের কাহিনী শুনিয়েছেন। বিখ্যাত পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামণি এই বালককে এক দোলপূর্ণিমার দিন চট্টোপাধ্যায়দের পূজাবাড়িতে বসে শ্রীকৃষ্ণের অনেক কথা বলেছিলেন। "এই উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটি এই যে, যে-শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য আপনি কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, যে-শ্রীকৃষ্ণের নাম ইতর-ভদ্র, মেয়ে-পুরুষ সকলেই জপ করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ কি বোলশো

গোপিনীর ভর্তা ছিলেন ? তিনি গোপিনীদিগের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন ?"[৩] কাহিনীটি যদি সত্য হয়, হওয়া আশ্চর্য নয়, কেননা বঙ্কিম রীতিমতো পকবালক ছিলেন, তাহলে বড়জোর এর থেকে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর কিছু কূট প্রশ্ন ছিল এইটুকু বোঝা যায়, (যেসব প্রশ্নের মীমাংসার জন্য জীবনপ্রান্তে তিনি বেশ কিছু পৃষ্ঠা ব্যয় করবেন), কিন্তু নাস্তিকতা প্রমাণিত হয় না।

নাস্তিক না হোন, বঙ্কিমচন্দ্র যে, যৌবনে ধর্মবিষয়ে অনুৎসাহী ছিলেন তা তাঁর জীবনীকার এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের "হৃদয়ে ধর্মভাব বদ্ধমূল হয়।" এই ধর্মভাব বদ্ধমূল হওয়ার কিছু কারণ তিনি জানিয়েছেন :

"ধর্মভাবের সূচনা পূর্ব হইতেই কিছু কিছু হইয়াছিল—কোনও কারণ অবলম্বনে সহসা হৃদয়ে জাগিয়া ওঠে নাই। যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা আসন্নপ্রসবা তখন তিনি রাধাবল্লভের মন্দিরে গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে পদ্মাসনে বসিয়া সাশ্রুনয়নে ঠাকুরকে কত ডাকিয়াছিলেন। লোকচক্ষুর সম্মুখে এই তাঁহার প্রথম ডাক। তারপর দুই-তিন বৎসর যাইতে না যাইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আবার কাতর হইয়া রাধাবল্লভের চরণে পড়িতে দেখিলাম। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র কঠিন রোগগ্রস্ত—মরণাপন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র কাঁদিতে-কাঁদিতে নিশিশেষে ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রিতাবস্থায় নবদূর্বাদলশ্যাম বংশীবদন রাধাবল্লভকে স্বপ্নে দেখিলেন। পরদিন ঠাকুরের নির্মাল্য আনিয়া শিশুর মাথায় দিলেন। শিশু অচিরে আরোগ্যলাভ করিল। তদবধি বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ধর্মভাব বদ্ধমূল হইল—ভক্তির ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইল।"[৪]

এই কি নাস্তিক থেকে আস্তিক হওয়ার কারণ, যা তিনি শ্রীশ মজুমদারকে বলেননি ? তাহলে—একান্ত জিজ্ঞাসার পথে ঈশ্বর (অথবা কৃষ্ণ) বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে আসেন নি— তিনি এসেছিলেন উপায়ান্তরহীনের প্রার্থনাপূরণের পথ ধরে ? কথাটা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রখর মনস্বী পুরুষের পক্ষে আপাত শ্লাঘাযোগ্য নয়। আমাদের তো মনে হয়, কৃষ্ণ কখনই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে অনুপস্থিত থাকেন নি। ঈষৎ পরবর্তীকালে তাঁর ভক্ত-পিতার একখানি ছবি ললিতচন্দ্র মিত্রের (দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র) বর্ণনা থেকে দেখে নেওয়া যায়, যে-চিত্র অল্পবিস্তর বঙ্কিমচন্দ্রের চোখের সামনে পূর্বাবধি ছিল :

"পত্নীর পরলোকগমনের পরে যাদবচন্দ্র একবার তীর্থপর্যটনে গমন করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের মন্দিরে রাধাবল্লভের মূর্তি বিরাজিত। প্রতি বৎসর মহাসমারোহে রাধাবল্লভের রথোৎসব হইত, এবং সেই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের যে-সকল বেশ প্রদর্শিত হইত তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। রাধাবল্লভের উপাসক যাদবচন্দ্রের [কাছে] জয়পুর ও বৃন্দাবন বড়ই আদরের তীর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি গোবিন্দজীর মূর্তি দর্শনান্তে এক অভিনব দৃশ্য অবলোকন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, রাধাবল্লভ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, 'আমি কি এখানেই আছি—সেখানে নাই ?' এ ঘটনায় তিনি বড় বিচলিত হয়েন এবং তীর্থ

দর্শনাভিলাষে জলাঞ্জলি দিয়া কাঁটালপাড়ায় প্রত্যাগমন করিয়া রাধাবল্লভের প্রাঙ্গণে শিশুর ন্যায় গড়াগড়ি দিয়া রোদন করেন।"[৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মজীবনে পিতার প্রভাব প্রসঙ্গে ললিতচন্দ্র বলেছেন :

"বঙ্কিমচন্দ্র পিতার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার পবিত্র ধর্মজীবনের প্রভাবে এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পরবর্তী রচনাসকলে সেই ধর্মভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।…দেবীচৌধুরাণীর বঙ্কিমচন্দ্র পিতার সেই ধর্মজীবনের আভাসে বলিয়াছিলেন—'তাঁহার কাছেই প্রথম নিষ্কাম ধর্ম শুনিয়াছি। তিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্মই ব্রত করিয়াছিলেন'।"[৬]

পিতার প্রভাবে, পারিবারিক পরিবেশ-প্রভাবে, কিংবা নিজ সংস্কারে, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার হয়েছিল। সেই ভক্তির আরও একটি ছবি দেওয়া যায়। চন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিমচন্দ্রের আমন্ত্রণে তাঁদের কাঁটালপাড়ার বাড়িতে এক দুর্গানবমী পূজার প্রভাতে গিয়েছেন :

"সঞ্জীববাবু, বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি পূজার দালানে বসিয়া আছেন। দেবীকে প্রণাম করিয়া বসিতে যাইতেছি, বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'তা হবে না, রাধানাথকে প্রণাম করিয়া আসিয়া বসো।' দেবীর প্রতিমার দক্ষিণ পার্শ্বে সুন্দর বিগ্রহ দেখিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিগ্রহের কথা কহিতে বড় ভালবাসিতেন। বলিতেন, 'উনি আমাদের বংশের সর্বপ্রকার মঙ্গলবিধান করেন, সমস্ত দুর্গতি নাশ করেন। আমাদের সকল কথা শোনেন, সব আবদার রক্ষা করেন—রোগে শোকে বিপদে আমরা উঁহারই মুখ চাহিয়া থাকি, উঁহাকেই ধরি—উনি আমাদিগকে বড় ভালবাসেন।' এমন সরলভাবে, এমন ভক্তিভরে রাধানাথের কথা কহিতেন যে, শুনিতে-শুনিতে আমার চক্ষে জল আসিত।"[৭]

বোঝা গেল, বঙ্কিমচন্দ্র রাধানাথের ব্যাকুল ভক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনে যদি বৌদ্ধিক নাস্তিকতার কোনো প্রকোপ ঘটে থাকে তবে তা বহিরঙ্গ প্রলেপমাত্র। একথা স্বীকার্য, ভক্তির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে কোথায় যেন একটা দ্বিধা ছিল—রাধানাথের ভক্ত তিনি—কিন্তু তাঁর জীবনে বা রচনায় 'রাধানাথ' শ্রীকৃষ্ণের একটি নামমাত্রে পর্যবসিত—রাধানাথের রাধাকে তিনি বড়ো আকারে গ্রহণ করেছেন এমন প্রমাণ নেই। এর জন্য তাঁর পরিচিতদের মধ্যে ক্ষোভের মনোভাব ছিলই। তাঁর এই দ্বিধা কি বুদ্ধিগত, নাকি ভাবগত, তার স্পষ্ট উত্তর পাওয়া কঠিন।

৩

১৮৮২-র শেষের দিকে হেস্টি-বিতর্ককে যদি বঙ্কিমের ধর্ম-মানসের 'জলবিভাজিকা' ধরা যায়, তাহলে তার পূর্বকালে দেশ ও ধর্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের প্রকৃতি অবশ্যই দেখে নেওয়া উচিত। ওই কালের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলায় কেবল উপন্যাস সাহিত্যের প্রবর্তক নন, কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস রচনা ক'রে প্রধান ঔপন্যাসিকের গৌরব পর্যন্ত অর্জন করেছেন, যে পরিচিতিকে হেস্টি সাহেব ঈষৎ বিদ্রূপের সঙ্গে বিতর্ক-

পত্রে উল্লেখ করেছিলেন—ওহো! ওই 'রামচন্দ্র'-নামা পত্রলেখক (বঙ্কিম ওই ছদ্মনামে বিতর্ক-পত্রগুলি লিখেছিলেন) তাহলে বাংলার ওয়াল্টার স্কট ছাড়া কেউ নন।

উপন্যাসের মধ্যে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল বেরিয়ে গিয়েছিল—এমনকি আনন্দমঠের শুরুও হয়ে গিয়েছিল সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে। কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ত্বে যেসব চিন্তা রয়েছে তার সূত্রপাত এই উপন্যাসগুলির মধ্যেও দেখতে পাই। 'পরোপকারতত্ত্ব' বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়—তা রয়েছে কপালকুণ্ডলায়। সেখানে অধ্যায়শীর্ষে উদ্ধৃত আছে বিদ্যাপতির বিখ্যাত পদ। মৃণালিনীতে গিরিজার মুখে অনেকগুলি ভক্তিব্যাকুল বৈষ্ণব গান। এইসঙ্গে শত্রুহস্ত থেকে রাজ্য উদ্ধারের উদ্দীপনাও। বিষবৃক্ষে হরদেব ঘোষালের পত্রে আত্মোৎসর্গময় বিশুদ্ধ প্রেমের গুণগান, যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, আমরা জেনেছি—শ্রীমদ্ভাগবতকার। এই উপন্যাসে সূর্যমুখীর বাসগৃহে ভিত্তিচিত্রের অন্তর্গত সত্যভামার তুলাব্রতের সযত্ন বর্ণনা। ইন্দিরা-র মধ্যে ছড়ানো আছে বৈষ্ণব পরকীয়ারসের আমেজ। সেখানে পৌরাণিক কাহিনীর ভাবকে লেখক অনেকটা একালের আদল দিয়েছেন। তবে লক্ষ্য করার বিষয়, ব্যাপারটাকে বঙ্কিম পুরো পরকীয়া করেননি। ইন্দিরা উপেন্দ্রর বিবাহিত পত্নী। বঙ্কিমের নীতিজ্ঞান সেই ভিত্তির সুযোগ নিয়ে পরকীয়া রসের স্বাদ-দান এবং সমাজনীতির স্বাস্থ্যরক্ষা, একই সঙ্গে করেছেন। রাধা কৃষ্ণের বিবাহিত পত্নী ছিলেন—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এই অংশটি বঙ্কিমের মনঃপূত ছিল, আমরা তাও লক্ষ্য করি। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে পাপ-পুণ্যতত্ত্ব প্রবলাকারে উপস্থিত। সেইসঙ্গে রমানন্দ-স্বামীর মুখে গীতার নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব এবং পরহিততত্ত্ব। রজনীতে মুক্ত প্রেমের সঙ্গে সামাজিক সতীত্বের দ্বন্দ্বে প্রেমের অঙ্গে জ্বলন্ত অঙ্গারের দগ্ধলেখ। কৃষ্ণকান্তের উইলেও বিশুদ্ধ প্রণয়ের সঙ্গে সংঘর্ষকালে রূপমোহকে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢলে পড়তে হয়েছে। (এসব মন্তব্য আমি সাহিত্য-বিচার স্থগিত রেখেই করছি—বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী নীতি ও ধর্মপ্রচারের পূর্বপ্রস্তুতির দিকে দৃষ্টি রেখে)।

সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে স্বতঃই মহাকাব্যিক, পৌরাণিক দেবদেবীর প্রসঙ্গ এসেছে। উত্তরচরিত (১২৭৯ জ্যৈষ্ঠ থেকে বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক) প্রবন্ধে ভবভূতির কাব্যের আলোচনাসূত্রে সাহিত্যের আদর্শ-রূপের প্রসঙ্গে বলেছেন, 'চিত্তরঞ্জন' কাব্যের উদ্দেশ্য। এই 'চিত্তরঞ্জন' ব্যাপারটি ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্রের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই চিত্তরঞ্জনকে নিছক আমোদ-ব্যাপার বলে তিনি মনে করেননি—নীতিশিক্ষা—তারও ঊর্ধ্বে চিত্তশুদ্ধির কথা বলেছেন। যে-সকল কবির কাব্য ওই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, তাঁদের উদ্দেশ্যে বঙ্কিমের প্রশস্তি : "কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা এবং উদ্ধারকর্তা, এবং সর্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন।" বঙ্কিমচন্দ্র "সত্যের প্রতিকৃতি-মাত্র"-কে "সৃষ্টি" বলতে গররাজি। "যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।" এইরূপ গুণাধিকারী কবিদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে তিনি স্থাপন করেছেন—রামায়ণকার ও মহাভারতকারকে। আর মহাভারতই কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান উৎস-গ্রন্থ।

'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে তিনি ('মানস বিকাশ' নামে বঙ্গদর্শনে ১২৮০ পৌষ প্রকাশিত) বৈষ্ণব গীতিকবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের বিশেষ উল্লেখ করেছেন। রচনাটির শ্রেষ্ঠ অংশ ভারতীয় ইতিহাসের বিবর্তনের রূপাঙ্কন। আর্যরা যখন শেষ পর্বে আর্দ্র উত্তপ্ত ও উর্বর পূর্বভারতে বসতি করলেন তখন তাঁদের বীর্যশক্তি অবলুপ্ত, তাঁরা ইন্দ্রিয়ভোগ ও ইন্দ্রিয়রসের গানে মেতে রইলেন। এই বিলাসযুগের কবি জয়দেব, যাঁর রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কাব্যে চূড়ান্ত মদনোৎসব। (বঙ্কিমচন্দ্র সুযোগ পেলেই জয়দেবকে কাব্যের ইন্দ্রিয়বাহুল্যের জন্য আক্রমণ করেছেন)। সকল বৈষ্ণব কবি অবশ্য জয়দেবের মতো বহিঃপ্রকৃতির রূপরঙ্গে মেতে রইলেন না—অন্তঃপ্রকৃতির রহস্যসন্ধানী বৈষ্ণব কবিও ছিলেন—অন্তঃপ্রকৃতির ক্ষেত্রে চণ্ডীদাস, যাঁর কবিতা "বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত"। জয়দেব ও বিদ্যাপতির তুলনামুখে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত রচনার কয়েক ছত্র: "জয়দেবের গীত রাধা-কৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা।.... জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান—মুরজবীণা-সঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান—সায়াহ্ন-সমীরণের নিঃশ্বাস।" এখানে এইটুকু বলে নিতে চাই, বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত বিদ্যাপতির সম্পূর্ণ রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। থাকলে দেখতেন, জয়দেব সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বিদ্যাপতির কাব্যের অনেকখানি অংশ সম্বন্ধেও সত্য।

'প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত' ('দানব দলন কাব্য' নামে বঙ্গদর্শনে ১২৮১ জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত) রচনার মধ্যে বঙ্কিমের পরবর্তী চিন্তার বহু বীজ রয়েছে। বঙ্কিমের বক্তব্য: কাব্যে প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত থাকে—বিশেষত মহাকাব্যাদিতে। কিন্তু যদি দেবচরিত্রকে মানবিক করা না হয় তাহলে পাঠকের সঙ্গে সহৃদয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। সেজন্য "শ্রীকৃষ্ণ জগদীশ্বরের আংশিক বা সম্পূর্ণ অবতারস্বরূপ কল্পিত হইলেও মনুষ্যের ন্যায় মানব-ধর্মাবলম্বী।" এই সূত্রে প্যারাডাইজ লস্ট-এর সঙ্গে কুমারসম্ভব কাব্যের তুলনা করেছেন। প্যারাডাইজ লস্ট কাব্যে মিল্টন অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিলেও যেহেতু ঈশ্বর এবং শয়তান উভয়েই অমানবিক থেকে গেছেন তাই সে-কাব্য জনসংবর্ধনা পায়নি, অথচ কুমার-সম্ভব তা পেয়েছে, কারণ এই কাব্যের উমা এবং মেনকায় আদ্যোপান্ত মানুষভাব। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে মনুষ্যভাবের বিকাশ দেখাতে সবিশেষ যত্ন করবেন, তা লক্ষ্য করা যায়। (বর্তমান প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ পূর্ণাবতার না অংশাবতার এই প্রশ্নে দ্বিধান্বিত ছিলেন বলেই মনে হয়, যা পরে থাকেননি)। আরও একটি চিন্তার সূত্রপাত করেছেন—যার বিকাশ পরে ঘটবে। বঙ্কিম, সম্পূর্ণ শারীরিক সুখসন্ধানী এবং সম্পূর্ণ শরীরসুখের বিষয়ে বিদ্বেষী—উভয় পক্ষকেই ভ্রান্ত বলেছেন। এখানে তাঁর সামঞ্জস্যতত্ত্ব। বঙ্কিম সন্ন্যাস-পথকে কখনই চরমাদর্শ বলে গ্রহণ করেন নি।

কৃষ্ণচরিত্রে বিশেষভাবে আলোচিত দ্রৌপদী চরিত্র সম্বন্ধে সাহিত্যগত আলোচনা ১২৮২ ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শনেই করেছেন। দ্রৌপদীর প্রবল প্রাণশক্তির প্রশংসা করে

বলেছেন, ভারতীয় আর্যধারায় এ চরিত্র অভিনব। দ্রৌপদী, সীতা নন। এই প্রবন্ধে কিন্তু দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর প্রসঙ্গ আনেন নি, যা কৃষ্ণচরিত্র-যুগে লিখিত দ্বিতীয় প্রবন্ধে আনবেন।

'ভালবাসার অত্যাচার' (বঙ্গদর্শন, ১২৮১ অগ্রহায়ণ) প্রবন্ধে নিঃস্বার্থ পরার্থপর স্নেহের গুণগান করেছেন। এই তত্ত্ব বঙ্কিমের শেষযুগের রচনাবলীর অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য। এর মধ্যে প্রেম ও ধর্মকে এক পদার্থ পর্যন্ত বলেছেন। নিত্যসত্য এবং আপেক্ষিক সত্য ইত্যাদি প্রসঙ্গে তিনি এই প্রবন্ধে একটি গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন—"সত্য কি সর্বত্র পালনীয়?" মুখের সত্য যে সর্বত্র পালনীয় নয়, একাধিক অকাট্য যুক্তি ও দৃষ্টান্তযোগে তা প্রতিপন্ন করেছেন। তার একাংশ:

"সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য সত্য পালনীয়। কিন্তু যখন এমন ঘটে যে, সত্যপালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্যভঙ্গে তত দূর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে। দশরথের সত্যপালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট; সত্যভঙ্গে কৈকেয়ীর তাদৃশ কোনো অনিষ্ট নাই। দৃষ্টান্তজনিত জনসমাজের যে অনিষ্ট, তাহা রামের স্বাধিকারচ্যুতিতেই গুরুতর। উহা দস্যুতার রূপান্তর। অতএব এমত স্থলে দশরথ সত্যপালন করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন। এখানে দশরথ স্বার্থপরতাশূন্য নহেন। সত্যভঙ্গে জগতে তাঁহার কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকারচ্যুত এবং বহিষ্কৃত করিলেন।...সত্য বটে, তিনি আপনার প্রাণহানিও স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কাছে প্রাণাপেক্ষা যশ প্রিয়, অতএব আপনার ইষ্টই খুঁজিয়াছিলেন। এজন্য তিনি স্বার্থপর। স্বার্থপরতা-দোষযুক্ত যে অনিষ্ট, তাহা ঘোরতর পাপ।"

এই কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র যখন লেখেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ১৩ বছরের মতো। এই সময়ে তিনি কোনো প্রতিবাদ না করলেও ১০ বছর পরে একই প্রসঙ্গে তুমুল তর্ক বাধাবেন সাময়িক পত্রের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বঙ্কিমের কৃষ্ণোক্তি স্মরণকেও ব্যঙ্গশরবিদ্ধ করবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম পর্বের ইংরাজি প্রবন্ধ Origin of the Hindu Festivals (1869)-এর মধ্যে যেসব হিন্দু-উৎসবের উদ্ভব ও বিকাশের সমাজবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন (প্রবন্ধটি বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের ২০ জানুয়ারি ১৮৬৯ তারিখের সভায় পঠিত হয়) তাদের মধ্যে কৃষ্ণকেন্দ্রিক দোলযাত্রা, রথযাত্রা, রাসযাত্রা, ফুলদোল, ঝুলন ইত্যাদি গুরুত্ব পেয়েছিল। জাতীয় ইতিহাস, নিসর্গপ্রকৃতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্গে উৎসবাদির সম্পর্ক নির্ণয়ে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এখানে যেটুকু কৃষ্ণচর্চা আছে, তার সঙ্গে তাঁর পরবর্তী কৃষ্ণতত্ত্বের সমূহ পার্থক্য, এবং ভক্ত বৈষ্ণবদের আচরিত উৎসবগুলির চরিত্র তাঁর কটাক্ষের লক্ষ্য। তিনি বলতে চেয়েছেন, গোড়ায় নববসন্তের পটভূমিকায় যা ছিল আনন্দময় বসন্তোৎসব, তা অধঃপতিত হল মদনোৎসবে। মানব-স্বভাবের এই বিকৃতি তাঁর কাছে অত্যন্ত অরুচিকর। বসন্ত কেন যে সংস্কৃত কাব্যে অনিবার্যভাবে কামোদ্দীপক বলে প্রতীয়মান হয়, তা তিনি বুঝতে অসমর্থ। এই বসন্তের পাল্লায় পড়ে কৃষ্ণের দুর্গতি বিষয়ে তাঁর তীব্র মন্তব্য:

"When Madana came to give place to Krishna, and the Madanotsaba came to be transformed into the Dol Jatra in Bengal, I am unable to say; but it was naturally to be expected that the God whose worship came to be most popular in the country and the memory of whose amorous achievements better fitted him to represent love and loose morals than Madana himself should supplant the latter in popular festivals."

পরবর্তীকালে 'কৃষ্ণচরিত্রে' রাসলীলা বর্ণনার কালে বঙ্কিমচন্দ্র এই দৃষ্টিভঙ্গিতে চালিত হয়ে গোটা ব্যাপারটিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে হাজির করেছেন। যা আছে তাকে মেনে নিয়ে তার ভিন্নতর ব্যাখ্যাসন্ধানে অগ্রসর হননি।

হিন্দুদর্শন উপযুক্ত বিচার ও প্রচারের অভাবে বিশ্বসভ্যতার ধারাপথে যে ঐতিহাসিক গুরুত্বের স্বীকৃতি পেতে পারত তা পায়নি—এ ক্ষোভ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'প্রচার'-পর্বের অনেক আগেই তীব্রভাবে অনুভব করেছেন; তা দেখা যায় The Study of Hindu Philosophy রচনার মধ্যে। তিনি দুঃখের সঙ্গে দেখেছেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে হিন্দু মিথলজি যতখানি আকর্ষক বোধ হয়েছে (বলাবাহুল্য নানা মজাদার ব্যাপারের জন্য, যার উপর ওঁরা কুড়ুল চালাতে পারবেন) হিন্দুদর্শন ততখানি হয়নি, অথচ গভীরচিত্ত হিন্দুর কাছে পুরাণ অপেক্ষা দর্শনের গুরুত্বই বেশি। ইউরোপে হিন্দু দর্শনচর্চা নিষ্ফল হয়েছে এই কথা বলার পরে তিনি ইতিহাস ও সমাজের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতার দিক দিয়েই হিন্দুদর্শনের মূল্যনির্ণয়ে ব্রতী। বিচারের মধ্যে এনেছেন হিন্দুদর্শনের সঙ্গে হিন্দুপুরাণের সম্পর্ক, হিন্দুদর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক, হিন্দুদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে হিন্দুদর্শনের প্রভাব। এই বিচারের কালে বঙ্কিম সাধারণভাবে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ-কথিত একটি সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছেন—হিন্দুদর্শনই হিন্দুমনুষ্যকে নিষ্ক্রিয় অলস করেছে। বিশ্ববিধানের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষের পরাজয় ও নৈরাশ্য, তার থেকে পাপবোধ, তার থেকে আত্মনিগ্রহ এবং তপশ্চর্যায় আসক্তি, তার থেকে নিয়তিবাদ, রাজনীতিতে অনাগ্রহ, অপরপক্ষে অলস জীবনের সুখাশ্রয় ইন্দ্রিয়ালুতা—বঙ্কিম এমন একটা ক্রম নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। এই প্রবন্ধে তপশ্চর্যা ও সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে বিরূপতা দেখা যায়, তা পরে কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ত্বেও মিলবে।

হেস্টি-পর্বের অনেক আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাংখ্যদর্শন' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ বেরিয়ে গেছে। (বঙ্গদর্শনে ১২৭৯ পৌষ থেকে ধারাবাহিক)। বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্য কিংবা প্রবন্ধসাহিত্যের সর্বত্র শেষপর্যন্ত সাংখ্যদর্শনের প্রত্যক্ষ কিংবা সংশোধিত প্রভাব দেখা যায়। প্রকৃতি ও পুরুষ, নারী ও পুরুষ—এই নিয়েই বঙ্কিম-সাহিত্যের পনেরো আনা। আর এই পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের আধার সাংখ্যদর্শন। 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধে গোড়াতেই তিনি বলে নিয়েছেন, হিন্দুসমাজের পুরাবৃত্ত সাংখ্যদর্শন ছাড়া বোঝা যাবে না, এবং বর্তমানেও

তার প্রভাব অব্যাহত (অন্তত বঙ্কিমের উপরে)। তিনি দেখিয়েছেন, এই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব থেকে তন্ত্রের জন্ম—বাংলায় সকল পূজাপার্বণে তার প্রভাব। সাংখ্যের কাছে তিনি এই কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন : যখন বেদের কর্মকাণ্ডের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ পশুবৎ, তখন সে মুক্তি পেয়েছিল সাংখ্যের জ্ঞান-সত্যে। বৌদ্ধদর্শনের আদিতেও সাংখ্য—এবং বৌদ্ধসূত্রে এই সাংখ্য মনুষ্যসমাজের দর্শনে ও ধর্মে সর্বাধিক ফলোৎপাদক। সাংখ্য কি নিরীশ্বর ? এই প্রশ্নে বঙ্কিমের মত, যদিও দেখা যায় সাংখ্যকার বেদ মানেন, কিন্তু ঈশ্বরকে প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ করেছেন, সেজন্য অজ্ঞেয়বাদী হিসাবেও সাংখ্য নাস্তিকাবাদী। বঙ্কিমচন্দ্র যে, জীবনের এক পর্বে নিজেকে নাস্তিক বলে মনে করেছিলেন তা এই সাংখ্য অজ্ঞেয়বাদের অনুসরণকারী হিসাবে বলেই মনে হয়।

সাম্রাজ্যগর্বী, তদনুযায়ী জ্ঞানগর্বী পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের অভদ্র অবজ্ঞা এবং অপ-পাণ্ডিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘদিন ধরেই পীড়িত। 'রামায়ণের সমালোচনা' (বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ পৌষ) এবং 'কোনো স্পেশিয়ালের পত্র' (ঐ, ১২৮২ কার্ত্তিক) রচনা দুটিতে তার প্রচুর নিদর্শন। মনে রাখা ভালো, বিখ্যাত বিদেশী পণ্ডিতদের তুলনায় অখ্যাত অনেক বিদেশী ব্যক্তি পত্র-পত্রিকায় ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি ও শাস্ত্রাদির পিণ্ডদান করতেন। সেইসব লোকগুলি ক্ষুদ্র কিন্তু বলা বাহুল্য 'কণ্টক ক্ষুদ্র হইলেও তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা অপরিসীম' ইত্যাদি—বিশেষত পরাধীন ও পদাহত মানুষদের ক্ষেত্রে। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুকাব্য, হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে ওই সকল অপমানকর রচনার দ্বারা সারাক্ষণ জ্বলেছেন—তাদের কিছু রূপ তিনি উল্লিখিত রচনা দুটিতে খুলে ধরেছেন, আর কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ত্বে নামী পণ্ডিতদের বিচিত্র বচনের পর্যালোচনা করেছেন। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের শেষ পর্বে 'প্রচার'শীল হবার পরেই ওই ধরনের কাজ শুরু করেছিলেন, একথা সত্য নয়।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত 'জ্ঞান' প্রবন্ধটি বঙ্কিম-মনের রূপান্তর যুগের রচনা। এর মধ্যে তিনি ইউরোপীয় 'ফিলজফি' এবং ভারতীয় 'দর্শন'-এর পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। ভারতীয় দর্শনের দুই ধারার একটি হল চার্বাক-পন্থা। বঙ্কিম বললেন, হিউম, মিল, বেন—সকলেই চার্বাকপন্থার অনুসারী। আবার এঁদের প্রতিবাদী কাণ্ট বেদান্তানুসারী। কাণ্টের প্রতিবাদী মিল। স্পেনসারও এক বিশেষ রকমের প্রত্যক্ষবাদী। (বঙ্কিম কোম্‌তের Positive Philosophy-কে প্রত্যক্ষবাদ বলতে গররাজি। প্রত্যক্ষবাদ আছে হিউম, মিল ও বেনের দর্শনে)। বঙ্কিমের বক্তব্য : "আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন ফিরিয়া-ফিরিয়া সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে। যেমন চার্বাকের প্রত্যক্ষবাদে মিল ও বেনের প্রত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য দেখা গিয়েছে, তেমনি বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে কান্তের এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। আধ্যাত্মিক তত্ত্বে, প্রাচীন আর্যগণ কর্তৃক সূচিত হয় নাই, এমন তত্ত্ব অল্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে।"

পূর্বাবধি পাশ্চাত্ত্য দর্শনে অভিভূত বঙ্কিমের মনের আচ্ছন্নতানাশ ও নবপথ সন্ধানের ইঙ্গিত এই রচনায় যেমন দেখা যায়, তেমনি পূর্বপথের চিহ্নও রয়েছে। তিনি এখানেই বলেছেন, "অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল—সকল প্রমাণের মূল।" পরবর্তীকালে

প্রবন্ধটিকে গ্রন্থভুক্ত করার সময়ে ওই অংশের সূত্রে পাদটীকায় বলেছেন, "এইসকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি।"

বঙ্কিম-মানসের ক্রম-রূপান্তরের এই পর্যায়ে কৃষ্ণচর্চার বিষয়ে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'কৃষ্ণচরিত্র'—বঙ্গদর্শনে ১২৮১ চৈত্র প্রকাশিত হয়। লেখাটি অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ'-এর সমালোচনারূপে লিখিত। প্রাচীন বাংলা কাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের ধারাবাহিক বিকাশের রূপরেখাঙ্কন তিনি এই রচনায় করার চেষ্টা করেছেন। যুগ-ভেদে একই বিষয়বস্তুর রূপভেদ হয়—বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধারণার কথা আগেই বলে এসেছি। কৃষ্ণচরিত্রের রূপায়ণ সম্বন্ধে এখানে যেসব প্রশ্ন বা আপত্তি তুলেছেন, তাদের মীমাংসার ব্যাপক প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন এক দশক পরবর্তী 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে। হিন্দুসমাজের শেষ পতনযুগের সময়কার কবি জয়দেব সম্বন্ধে এই প্রবন্ধেও তিনি যথোচিত বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছেন। জয়দেবের সেই কাল—যখন আর্যজাতির জীবন দুর্বল, ধর্মে বার্ধক্য; উগ্রতেজস্বী রাজনীতিবিশারদ আর্যবীরেরা বিলাসপ্রিয় ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ; তীক্ষ্ণবুদ্ধি মার্জিতচিত্ত দার্শনিকদের স্থানাধিকারী হয়েছে অপরিণামদর্শী স্মার্ত ও গৃহসুখবিমুগ্ধ কবি; ফলে ভারত শক্তিহীন, নিশ্চেষ্ট, নিদ্রায় উন্মুখ ও ভোগপরায়ণ। "অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার স্থানে রাজপুরীসকলে নূপুর-নিক্বণ বাজিতেছে, বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক জগতের নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনার পরিবর্তে কামিনীগণের ভাবভঙ্গির নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। জয়দেব গোস্বামী এই সময়ের সামাজিক অবতার; গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি। অতএব গীতগোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ বিলাসরসে রসিক কিশোর নায়ক।" পরবর্তীকালে চৈতন্য অভ্যুদয়ের পরে ধর্ম ও দর্শনের কিছুটা উন্নতি হয়েছিল, এবং বৈষ্ণব কবিতাতে তার প্রতিফলন ঘটেছিল—একথাও বঙ্কিম বলেছেন। তবে বঙ্কিমের মূল বক্তব্য এই নয়। তিনি আরও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রশ্ন তুলেছেন—

"[অনেক আধুনিক বাঙালার কাছে] সামান্য নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় হইলে যেমন অপবিত্র, অরুচিকর এবং পাপে পঙ্কিল হয়, কৃষ্ণলীলাও তাঁহাদের বিবেচনায় তদ্রূপ—অতি কদর্য পাপের আধার। বিশেষ, এ সকল কবিতা অনেক সময় অশ্লীল, এবং ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিকর—অতএব ইহা সর্বথা পরিহার্য।"

বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিকদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে নিতান্ত "অসারগ্রাহী" বলে চিহ্নিত করেছেন। "যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি কখনও এতকাল স্থায়ী হইত না। কেন না অপবিত্র কাব্য কখনও স্থায়ী হয় না।"

সুতরাং কৃষ্ণলীলার ভিন্নতর ব্যাখ্যা আছে। সেই ব্যাখ্যার সন্ধান করে বঙ্কিমচন্দ্র দুই কৃষ্ণের কথা বলেছেন, এক মহাভারতের কৃষ্ণ, দুই বৃন্দাবনের কৃষ্ণ। তাঁর সমস্ত মনপ্রাণের জয়ধ্বনি মহাভারতের কৃষ্ণের বিষয়ে। কিন্তু বৃন্দাবনের কৃষ্ণের প্রসঙ্গও এনেছেন—এবং সেখানে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যেমন বিচিত্র তেমনি অসম্পূর্ণ বা অসন্তোষজনক। সেই ব্যাখ্যা তাঁকে দিতে হয়েছে কারণ কৃষ্ণের সঙ্গে 'লীলা' শব্দ যুক্ত করলে গীতা-উদ্গাতার কথা মনে আসে না, বৃন্দাবনের গোপীরমণ কৃষ্ণের কথাই মনে

আসে। অথচ শেষোক্ত ব্যাপারটি সম্বন্ধে বঙ্কিম কখনো মনের সংকোচ দূর করতে পারেননি। তাই, সাংখ্য-প্রভাবিত তিনি—ঐ দর্শনের আশ্রয়ে একটা ব্যাখ্যা দিয়ে ব্যাপারটার সমাধান করতে চেয়েছেন। "সাংখ্যকার, মানস রসায়নে জগৎকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, [বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন] আত্মা এবং জড় জগতে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। জগৎ দ্বৈপ্রকৃতিক—তাহাতে পুরুষ এবং প্রকৃতি বিদ্যমান।...এই প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্য মতানুসারে পরস্পরে আসক্ত, স্ফটিকপাত্রে জবাপুষ্পের প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রকৃতিতে পুরুষ সংলগ্ন। ইহাদিগের মধ্যে সম্বন্ধ বিচ্ছেদেই জীবের মুক্তি।" বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, এই দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বকে জনসাধারণের বোধগম্য মনোহর আকারে উপস্থিত করেছেন শ্রীমদ্‌ভাগবতকার।—"মহাভারতে যে-বীর ঈশ্বরাবতার বলিয়া লোকমণ্ডলে গৃহীত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকেই পুরুষ স্বরূপে স্বীয় কাব্যমধ্যে অবতরণ করাইলেন এবং স্বকপোল হইতে গোপকন্যা রাধিকাকে সৃষ্ট করিয়া, প্রকৃতিস্থানীয় করিলেন। প্রকৃতি পুরুষের যে পরস্পরাসক্তি—বাল্যলীলায় তাহা দেখাইলেন। এবং তদুভয়ে যে সম্বন্ধে বিচ্ছেদ জীবের মুক্তির জন্য কামনীয়, তাহাও দেখাইলেন। সাংখ্যের মতে ইহাদিগের মিলনই জীবের দুঃখের মূল—তাই কবি এই মিলনকে অস্বাভাবিক এবং অপবিত্র করিয়া সাজাইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় তাৎপর্য—আত্মার ইতিহাসে প্রথমে প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ, পরে বিয়োগ, পরে মুক্তি।"

চমকপ্রদ ব্যাখ্যা, সাংখ্যবুদ্ধির ঝলক আছে কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কাছে অন্তত রাধাকৃষ্ণের মিলনকে অপবিত্র বলার চেয়ে অপবিত্র ধর্মশূন্য বস্তু আর কিছু হতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র এই কৃষ্ণচরিত্র প্রবন্ধের অনেক অংশের বক্তব্য পরে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে পরিহার করেছেন, কিন্তু বৃন্দাবনলীলার বিষয়ে উপরের ব্যাখ্যা তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত ঈষৎ সংশোধিত আকারে বজায় রেখেছিলেন।

বর্তমান 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধের আসল লক্ষ্য মহাভারতের কৃষ্ণকে তার আদি উজ্জ্বলরূপে উদ্ধার করা। আধুনিক মনের অধিকারী তিনি, কালাতীত কালে কবিদের বিচরণের অধিকার হরণ করে লিখেছেন, "যিনি কবিতা লেখেন তিনি জাতীয় চরিত্রের অধীন; সামাজিক বলের অধীন; এবং আত্মস্বভাবের অধীন। তিনটিই তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত হইবে।" এই তিন ব্যাপারকে তিনটি শব্দে চিহ্নিত করেছেন; "জাতীয়তা, সাময়িকতা, এবং স্বাতন্ত্র্য।" খ্রীস্টাব্দের অনেক পূর্বে রচিত আদি মহাভারতের যুগবর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন; "এক্ষণে দস্যুজাতি বিজিত, পদানত, দেশপ্রান্তবাসী শূদ্র; ভারতবর্ষ আর্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য এবং মহাসমৃদ্ধিশালী। তখন আর্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত অনন্তরত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে তাহা কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে।" এই ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণকে বঙ্কিমচন্দ্র রাজনৈতিক চরিত্র দাঁড় করিয়েছেন। "এরূপ সমাজে দুই প্রকার মহস্ত সংসারচিত্রের অগ্রগামী হইয়া দাঁড়ান—এক, সমরবিজয়ী বীর, দ্বিতীয় রাজনীতি-

বিশারদ মন্ত্রী। এক, মন্টকে, দ্বিতীয় বিস্মার্ক; এক গারিবলদি, দ্বিতীয় কাবুর। মহাভারতেও এই দুই চিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—এক অর্জুন দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ।" শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করেননি, সবকিছুই করেছেন অসাধারণ মানসিক বলের দ্বারা, কিন্তু তাঁকে এই রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সরাসরি ঈশ্বরাবতার বলেননি—"ঈশ্বরাবতার রূপে কল্পিত," এই পর্যন্ত এগিয়েছেন। ব্রজলীলার সঙ্গে এই কৃষ্ণের সম্পর্ক নেই। এই কৃষ্ণের তিনি যে-বর্ণনা করেছেন তার বড়ো অংশকে পরে তাঁকে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে ফিরে গিলতে হবে—এবং সেইকালে নিজের পূর্ব বক্তব্যের কঠোর নিন্দাও তাঁকে করতে হবে—যদিও ওই সকল বক্তব্য কৃষ্ণনিন্দুক বিদেশী পণ্ডিত বা সংস্কারপন্থীদের বলেই তিনি ওখানে প্রায়শ উল্লেখ করেছেন। এই পর্বে বঙ্কিমের কৃষ্ণের আকার;

"শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ্—সাম্রাজ্যের গঠন বিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য কৃতকার্য—সেইজন্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্পিত।...যে অবধি ইনি মহাভারতে দেখা দিলেন, সেই অবধি এই মহেতিহাসের মূল গ্রন্থিরজ্জু ইঁহার হাতে—প্রকাশ্যে কেবল পরামর্শদাতা—কৌশলে সর্বকর্তা। ইঁহার মর্ম কেহ বুঝিতে পারে না, কেহ অন্ত পায় না, সে অনন্ত চক্রে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না।...কেবল পাণ্ডবগণকে একেশ্বর করাও তাঁহার অভীষ্ট নহে। ভারতবর্ষের ঐক্য তাঁহার উদ্দেশ্য।...[ভারতবর্ষ খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত, পরস্পর ঈর্ষাবশে সংঘাতরত, এদের ধ্বংস করেই কৃষ্ণ ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন]। এইরূপ মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্র যতই আলোচনা করা যাইবে ততই তাহাতে এই ক্রূরকর্মা দূরদর্শী রাজনীতিবিশারদের লক্ষণ সকল দেখা যাইবে।"

শ্রীকৃষ্ণকে মহাভারতীয় বিসমার্ক করার বিরুদ্ধে নানা মহল থেকে কঠিন সমালোচনা আসবে।

'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে আবৃতভাবে এবং 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে দেশপ্রীতির কথা আছে। আদর্শ মনুষ্যত্বের স্থাপনকর্তা হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ দেশপ্রীতির শ্রেয়রূপের প্রবর্তক, একথা বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বীকার করতে হয়েছিল। হেস্টি-বিতর্কের আগেই এই দেশপ্রেমের পরম কবিরূপে বঙ্কিমচন্দ্রকে পাই—কমলাকান্তের দপ্তরে। 'আমার দুর্গোৎসবে'র মধ্যে মাতৃভূমির প্রতি ব্যাকুল ভালবাসা—আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, আশা, স্বপ্ন, বাসনা এবং যন্ত্রণা নিয়ে আর্ত ভাষায় প্রকাশিত। 'একা' রচনার শেষে প্রকাশ পেয়েছে প্রীতিতত্ত্ব। বলা হয়েছে, ঈশ্বরই প্রীতি। 'আমার মন' রচনায় প্রীতিতত্ত্ব ও পরহিততত্ত্বের বিস্তৃততর প্রকাশ। 'একটি গীত' রচনায় চণ্ডীদাসের 'এসো এসো, বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো' পদটির অভিনব ব্যাখ্যা করে এই প্রীতিতত্ত্বকেই উপস্থিত করেছেন। এসকলই কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ত্বের বিষয়বস্তুর পূর্বপ্রকাশ। লক্ষ্য করার বিষয়, ঈশ্বরের জন্য যে-ব্যক্তিগত ভক্তিবিহ্বলতাকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ্যে জানাতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, তেমন ভক্তিকে মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসার পাত্রে ঢেলে দিয়েছেন; এবং 'বুড়া বয়সের কথা' রচনায় যেন নিজের অজান্তে অধ্যাত্মভক্তিকেই উন্মোচন করেছেন—আত্মসংবরণ করা সম্ভব হয়নি। এই রচনায় তিনি সর্বত্যাগী

ঈশ্বরপ্রেমিকের নীতিতে বলেছেন, "শৈশব হইতেই জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে-কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন কালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন?" রচনার শেষে নিরুপায় কান্নায় ভেঙে পড়ে যা বলেছেন, তার সঙ্গে বৈষ্ণব ভক্তদের ভক্তি-ভাষার প্রভেদ কোথায়?—

"তোমার দর্শন বিজ্ঞান, সকলই অসার—সকলই অন্ধের মৃগয়া। আজিকার বর্ষার দুর্দিনে—আজি এ কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে—এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে—আমায় আর কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখরবাহিনী বৈতরণীর আবর্ত-ভীষণ উপকূলে, এ দুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে? অতি বেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার, প্রভো! চারিদিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভরে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?"

৪

উপরে যেসব রচনার কথা বললাম, সে সবই হেস্টি-বিতর্কের পূর্বকালের।

বঙ্কিম-হেস্টি বিতর্ক সম্বন্ধে আমি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করছি, এই সন্দেহ জাগতে পারে। এমন করতে বাধ্য হচ্ছি এইজন্য যে, সেই গুরুত্ব ইতিমধ্যেই সবিশেষে আরোপিত হয়েছে, যা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মভাবনার কালানুক্রমিক বিচারও যথেষ্ট করা হয়নি। একটা অসম্পূর্ণ খসড়া তৈরি করেই দেখছি, হেস্টি-বিতর্ক একটা ঘটনা মাত্র, হয়তো বেশরকম ধাক্কা লাগাবার ঘটনা—কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্মভাবনার যে পর্যায়ে ও পরিণতিতে উপনীত হয়েছেন সেখানে যেতেনই—হেস্টি বা না-হেস্টি।

হেস্টি-বিতর্কের সূত্রপাত হয়—১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮২ তারিখে শোভাবাজারের মহারাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পিতামহীর দানসাগর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সূত্রে। সে এক এলাহি কাণ্ড, সেখানে চার হাজার অধ্যাপক-ব্রাহ্মণ এসেছেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার নানা স্থান থেকে; অন্যধরনের আরও হাজার-হাজার লোক উপস্থিত; তাঁদের মধ্যে মহা ইংরাজিশিক্ষিত বাঙালি মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল, ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ছিলেন। আর এসেছিলেন দেব পরিবারের গৃহদেবতা গোপীনাথজী। সুতরাং সংবাদপত্র চুপ করে থাকতে পারে না, যেহেতু শ্রাদ্ধের ভোজ্য অপেক্ষা সংবাদ-ভোজ্য কম উপাদেয় নয়। স্টেটসম্যান ২০ সেপ্টেম্বর ফলাও করে ঘটনার বিবরণ ছাপল। আর তাতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেন রেভারেণ্ড হেস্টি—কারণ রেভারেণ্ড হিসাবে তিনি হিন্দুধর্মের, বিশেষত 'পৌত্তলিক' হিন্দুধর্মের মৃত্যুচিতায় আগুন ধরাবার শুষ্ক কাষ্ঠ হয়েই ছিলেন। তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা হায় হায় করে উঠেছিল যখন দেখলেন তাঁদের এত বছরের সাধনা একেবারে বৃথায় গেছে। একে তো উপযুক্ত সংখ্যায় খ্রীস্টান করতে পারেননি, তার দুঃখ আছে, তাই বলে ইংরাজি শিক্ষা দেবার পরেও শিক্ষিত

হিন্দুদের পুতুলপুজোর আসরে যাওয়া বন্ধ করতে পারলেন না! হেস্টি অবিলম্বে ২২ সেপ্টেম্বর স্টেটসম্যানে এক চিঠি ছাপালেন ধিক্কার দিয়ে। ছি ছি! মহারাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের মতো উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এখনও পারিবারিক পুতুল-গড্‌কে খাতির জানালেন! ছি ছি! ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতো মানুষ ওহেন সভায় উপস্থিত থেকে ব্রহ্মণ্য আনুষ্ঠানিকতাকে হাস্যবিকাশসহ সমর্থন জানালেন !!—হেস্টি লিখেছিলেন। পরে তিনি গাম্ভীর্য অবলম্বন করে সাহেবগণ-প্রদত্ত ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে ঐতিহ্যবাদী পৌত্তলিকতার সম্পর্ক, এবং এ-ব্যাপারে শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত হিন্দুগণের দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে যথোচিত উপদেশ ও শিক্ষাদান করলেন। হেস্টি তারপর ক্রমান্বয়ে আরও ৬টি দীর্ঘ পত্র স্টেটসম্যানে প্রকাশ করলেন, কিছু যুক্তি, অধিক রোষ, তীব্র তিরস্কার, মৃদু অভিমান, নিবিড় মর্মবেদনা, বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস—এবং উদ্ধারের জন্য খ্রীস্টধর্ম অবলম্বনের পথাপ্রদান—এ সমস্তই ওইসব চিঠিতে ছিল। আর ছিল হিন্দু দেবদেবীর কেচ্ছা। শতাধিক বৎসর ধরে মিশনারিরা ইংরাজি এবং দেশীয় ভাষায় কেচ্ছা-সাহিত্য সমৃদ্ধ করে গেছেন, একথা তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রে জানেন। হিন্দুদের মধ্য থেকে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল—তার মধ্যে ব্রাহ্ম আন্দোলন তখন সবচেয়ে শক্তিশালী। রক্ষণশীলরাও নড়াচড়া করছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনা ও সত্যবোধ নিয়ে অল্পদিন আগে আবির্ভূত হয়েছেন। হেস্টি এ সকল বিষয়ে সচেতন ছিলেন। খুবই বিস্ময়ের কথা, এই একই হেস্টি এই বিতর্কের এক বছর আগে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইন্সটিটিউশনের ছাত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের কাছে দক্ষিণেশ্বরের কালীপূজক রামকৃষ্ণের কথা বলেছিলেন—যাঁর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো সমাধি হয়। এবং এই কাজ করেছিলেন বলে এক মিশনারি সম্মেলনের সভাপতি তাঁর 'আহাম্মকি'র নিন্দা করেছিলেন, কেননা নরেন্দ্র দত্ত বিবেকানন্দ হয়ে ওইকালে মিশনারি প্রচারের বারটা বাজিয়েছিলেন। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষ্যে আরও পাই, তাঁর এই প্রিয় "উষ্ণমস্তিষ্ক, বৃদ্ধ স্কটলণ্ডবাসী শিক্ষক, যাঁর গৃহ ছাত্রদেরই গৃহ ছিল"—তিনি আরও কয়েক বৎসর পরে খ্রীস্টান মতে নিন্দিত সর্বেশ্বরবাদকে মেনে নিয়েছিলেন।[৮]

হেস্টি স্বয়ং বিরাট পণ্ডিতও ছিলেন—দিকপাল পণ্ডিত বলা যায়। সেই মানুষ কিভাবে পরধর্মের কদর্য নিন্দায় নেমে পড়েছিলেন তা বিস্ময়কর মনে হয়। তার কারণ হয়তো এই—ধর্মের মতো উদারতাবর্ধক ও অন্ধতাবর্ধক দ্বিতীয় পদার্থ নেই। তদনুযায়ী হেস্টি "রক্তপিপাসু বিকট কালী", "হস্তীমুণ্ড গণেশ" প্রভৃতির প্রতি খ্রীস্টানোচিত ঘৃণাবর্ষণ করেন; "পাপের প্রতিমূর্তি দেবদেবীকে আশ্রয় দিয়েছে হিন্দুধর্ম, তা দানবিক ধর্ম—যা নীতিহীনতার গহ্বরে পতিত ভারতবর্ষের সকল দুর্গতির মূলে"—একথা না বলে পারেন নি; "একদা আলোককন্যা ভারতবর্ষ বর্তমানে বেশ্যাজননী হয়ে কালাতিপাত করছে"—এই হৃদয়ব্যথাও তাঁর ছিল; এবং "খ্রীস্টধর্মের বিশুদ্ধ পুণ্যজীবনে" পাপী হিন্দুদের স্থাপন করার ধর্মব্রত গ্রহণ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর কাছে হিন্দুধর্মের মোট চেহারাটা এই :

"এই ঊনবিংশ শতাব্দী যতদূর দেখতে পেয়েছে তা হল—হিন্দুধর্মে আছে কেবল বাজে খোসা, ভিতরে শাঁসের চিহ্নমাত্র নেই। তা একেবারে শূন্যে পূর্ণ—কপিল এবং তাঁর মতো অন্যান্যরা সেকথা বলছেন—কেবল বলছেন না 'রামচন্দ্র' (বঙ্কিমচন্দ্র)। হিন্দুধর্মের অস্থিহীন অস্থিকোটরে প্রাণ, আলোক বা প্রেম সঞ্চারিত করার চেষ্টা বৃথা—বৃথা তার ঠকঠকে নড়বড়ে হাড়ে নতুন রক্ত-মাংস পুরে দেওয়ার প্রয়াস। তার কম্পমান উন্মুক্ত কঙ্কালদেহের মধ্যে যতই উঁকি-ঝুঁকি দিই না কেন, কোথাও যথার্থ আধ্যাত্মিক জীবনের শ্বাস প্রবাহিত হতে দেখব না।"

আমাদের বিশেষ আলোচ্য যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচর্চা, তাই কৃষ্ণ বিষয়ে হেস্টির মন্তব্য লক্ষ্য করে নিতে চাই। বহুদিন ধরে কৃষ্ণ মিশনারিদের চাঁদমারি। তাঁরা তাঁর উপর গুলি ছুঁড়ে ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদী একাগ্রতা অভ্যাস করেছেন। একটি দুটি পূর্ব নমুনা এই :

"হে প্রিয় পাঠকেরা, বিবেচনা করিয়া দেখ, যিনি এই প্রকার পরদার, বধ, চৌর্য, মত্ততা ও মিথ্যাবাক্যাদি অশেষ কুকর্ম করেন, তিনি কিরূপে ঈশ্বর হইতে পারেন? ও তাঁহার আরাধনা করিলে মানুষদিগের পরিত্রাণ বা কি প্রকারে হয়?....শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিলে মানুষদিগের অন্তঃকরণ কখন পবিত্র হইবে না। কেননা যেমন গুরু তেমনি শিষ্য, অতএব শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরদার, বধ, চৌর্যাদি করিয়াছেন, তাহারাও তেমনি কেন না করিবে?" ['ধর্ম অবতার' ১৮৩৮][৯]

হেস্টি-বিতর্কের পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশার দান উল্টে দিয়েছেন, তখন রোম্বাই রেভারেণ্ড জন মার্ডক (ইনি ৫০ বৎসর ধরে হিন্দু-কুৎসা করে গেছেন) 'স্বামী বিবেকানন্দ অন হিন্দুইজম' গ্রন্থে লিখেছিলেন—যা পূর্বের বহু বৎসরের রচনার পুনরাবৃত্তি :

"The supposed Avatara of Krishna is fully described in Bhagavata and Vishnu Puranas. Love was certainly not a feature of his character. He murdered Kansa's washerman because he complained of the injury done to his master's clothes; a great part of his life was spent in fighting; he burnt up the city of Beneras and destroyed its inhabitants; and one of the last acts of his life was to kill the survivors of his reputed 180,000 sons.

"In the Bhagavad Gita, Arjuna, his eyes full of tears, expresses his unwillingness to kill his own relations and teachers in battle, his preceptors and friends. Krishna's reply was, 'Cast off this base weakness of heart, and arise, O terror of foes.'

"With 8 queens and 16,000 wives, Krishna was rather an incarnation of lust than of God."[১০]

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কৃষ্ণচরিত্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই সকল অভিযোগের উত্তরই বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে দিয়েছেন।

হিন্দুসমাজের উপর যে কদর্য নিন্দার পাহাড় মিশনারিরা চাপিয়েছিলেন, তার নমুনা আর দিতে চাই না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সাত সাগরের জল দিয়ে ধুলেও সে কাদা সরানো যাবে না।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড হেস্টির বক্তব্য :

"...And to take the special example in point of the Krishna cult, what is it at the best, with all its merry music and mincing movements but the apotheosis of sexual desire and the idolatry of merely finite life."

পুনশ্চ !

"...What is Krishna, after all, but an imaginary embodiment of the sensuas feeling of the 'East' by an exaggeration of a mythological fancy to the supposed dimensions of the Divine ?"

সরাসরি কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই পাদরী-বচন। কৃষ্ণ অধিকন্তু অন্যান্যদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহুতর আপ্যায়ন লাভ করেছিলেন। পরাধীনতার অনেক গ্লানি। কিভাবে বিজয়ী জাতির লাথি খেতে হয় তার সামান্য নমুনা হেস্টির লেখা থেকে এই :

"Notwithstanding all that has been written about the myriotheistic idolatry of India, no pen has yet adequately depicted all the hideousness and grossness of the monstrous system. It has been well described by one who knew it as 'Satan's masterpiece of ingenuity for the entanglement of souls', and as 'the most stupendous fortress and cittadel of ancient error and idolatry now in the world.'...This debasing idolatry produced, according to the painful testimony of native writers themselves, a mass of shrinking cowards, of unscrupulous deceivers, of bestial idlers, of filthy songsters, of degraded women and lustful men....Every Hindu home is still polluted with idols and the opening senses meet their abominations at every turn. The children drink in the hideous spirit of demons with their mother's milk and cannot learn to speak without the foulest words. Rational men wear the sign of beastly gods unabashed upon their foreheads and have lost the modesty of manhood."

ইংরেজি ভাষাকে বস্ত্র এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে অভিনন্দনযোগ্য করেছে কটুগন্ধী

শব্দের অসামান্য ভাণ্ডার এই রচনাটি—বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন। হেস্টির রচনার যৎসামান্য অংশই আমি উদ্ধৃত করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের চোখের ও মনের সামনে দগ্‌দগে হয়ে কথাগুলো রসনিঃসরণ করছিল। তিনি উত্তর না দিয়ে পারেন? 'রামচন্দ্র' এই ছদ্মনাম নিয়ে উত্তর দেন—যদিও একেবারে শেষে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন। বঙ্কিম বললেন, হেস্টি-সাহেবের মাথা গরম হয়েছে। তাঁর বীরমূর্তির যোগ্য রূপাঙ্কন করতে ভারতীয় সেরভাস্তেসের প্রয়োজন হবে (বঙ্কিম স্বয়ং সে ভূমিকা কিছুটা গ্রহণ করেছিলেন)। হেস্টিকে তিনি এক জায়গায় বেকায়দায় ফেললেন। বিদ্রূপ করে বললেন, মূল সংস্কৃত আগে পড়ুন, তারপর তর্ক করবেন। হেস্টি আত্মরক্ষার জন্য সাফাই গেয়ে বললেন, পাশ্চাত্ত্যে বড় বড় সংস্কৃত পণ্ডিত আছেন (যাঁদের অনুবাদ থেকে হেস্টি বস্তু সংগ্রহ করেছেন), ভারতে তেমনটি মিলবে না। আরও বললেন, রামচন্দ্রের চিঠিগুলি তাঁর অন্তরঙ্গমহলে রীতিমতো আমোদের সৃষ্টি করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাতে সায় দিয়ে হেস্টির আমোদ বাড়াবার মতো বহু বস্তু সরবরাহ করলেন, তার মধ্যে এক ক্ষুধার্ত গোরার নারকেল খেতে গিয়ে ছোবড়া চিবানোর নিষ্ঠুর কাহিনীটি ছিল। হেস্টিগণের সংস্কৃত-আস্বাদন এইপ্রকার ঝুনা নারিকেলের ছোবড়া চিবানোর মতোই। বঙ্কিম যেসব যুক্তিতে হিন্দু ধর্মতত্ত্ব ও হিন্দু ধর্মাচার সমর্থন করেছিলেন, তাদের উপস্থাপনার প্রয়োজন এখানে নেই, কিন্তু তিনি একটি মারাত্মক উক্তি করে ফেলেছিলেন, যা তাঁর পূর্ব ধারণার প্রতি আনুগত্যযুক্ত: "ভারতীয় ছাত্রদের কাছে বেদ মৃত; তারা মৃত পূর্বপুরুষদের প্রতি যে ধরনের শ্রদ্ধা জানায়, বেদকেও তাই জানায়, কিন্তু বেদ সম্বন্ধে ব্যস্ত হবার কোনো কারণ আছে বলে তারা মনে করে না।" সেইরকম আরও একটি অসতর্ক মন্তব্য করলেন মূর্তি-পূজা সম্বন্ধে। বললেন: মানুষ স্বভাবে কবি ও শিল্পী; সৌন্দর্যের মধ্যে, শক্তির মধ্যে, পবিত্রতার মধ্যে তার ব্যাকুল আদর্শসন্ধান বাস্তব পৃথিবীতে মূর্তিকামনা করে। এইজন্যই ঈশ্বরের মূর্তি কল্পনা করে মানুষ, হ্যামলেটের ট্রাজেডি বা প্রোমিথিউসের কাহিনীর মতোই মূর্তির ঔচিত্য আছে; মূর্তির ধর্মীয় অর্চনা হ্যামলেট বা প্রোমিথিউসের বৌদ্ধিক অর্চনার মতোই যুক্তিসঙ্গত ইত্যাদি। বঙ্কিম এইখানেই থামলেন না। এমন কথাও বললেন যার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ স্বয়ং তাঁকে পরে করতে হবে—

"ওরা বলেন, আমাদের মূর্তিগুলি বিকট। সেকথা ঠিক। আমরা উপযুক্ত ভাস্করের অপেক্ষায় আছি। এটা কেবল শিল্পগত ব্যাপার। হিন্দু দেবদেবীর মন্দির কদাপি যথাযোগ্যভাবে প্রস্তর অথবা মৃত্তিকায় রূপায়িত হয়নি কারণ ভারতবর্ষ কোনো ভাস্করের জন্ম দেয়নি। বাংলায় আমরা যে-সকল মূর্তি পূজা করি, সেগুলি শিল্পরূপে জাতীয় লজ্জার বস্তু। ইউরোপ থেকে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি তৈরি করিয়ে আনাই ধনী হিন্দুদের পক্ষে সঠিক কাজ হবে।"

এক কথায় ভ্রান্ত এবং শোচনীয়—বঙ্কিমের কথাগুলি। যে গৃহদেবতার তিনি ভক্ত, বাল্যাবধি যাঁর দর্শন তিনি করছেন, তাঁর আকারের শিল্পসৌন্দর্য কি তাঁর চোখে ধরা পড়েনি—যা শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্কিম জীবন-চরিতে মুদ্রিত চিত্র থেকে অন্তত

আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রতীয়মান। বস্তুতপক্ষে এই পর্ব পর্যন্ত বঙ্কিমের শিল্পবোধ অপরিণত। তিনি কি ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের *Antiquities of Orissa* পড়েননি, কিংবা ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত ফার্গুসনের *History of India and Eastern Architecture*-এর পৃষ্ঠা ওল্টান নি? হেস্টি-বিতর্কের আগেই তিনি ১৮৮২ আগস্ট থেকে ৬ মাসের জন্য উড়িষ্যার জাজপুরে কর্মরত ছিলেন। তখনও নিশ্চয় তিনি উড়িষ্যার অতুলনীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দেখেননি, অথবা দেখলেও সাহেবি চশমা পরে দেখেছিলেন, কিংবা তিনি কি সেসব সরাসরি দেখেন ১৮৮৫ জুলাই মাসের পরে কয়েকমাস কটকে কর্মরত থাকার সময়ে? প্রথম পর্যায়ে দেখেছিলেন সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত, কারণ সীতারামের মধ্যে এই লাইনগুলি আছে (প্রচারে সীতারামের শুরু ১২৯১ শ্রাবণ, ১৮৮৪ থেকে):

"(উড়িষ্যার ললিতগিরির ভাস্কর্য প্রসঙ্গে)…এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে… মনোমুগ্ধকর মূর্তিরাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের মধ্যে থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। হায়! এখন কিনা হিন্দুকে ইনডাসট্রিয়াল স্কুলে পুতুলগড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া স্থইনবর্ন পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি!"

কঠিন আত্মসমালোচনা—অন্তত তাই দাঁড়াল। হিন্দু মূর্তির সৌন্দর্য বর্ণনার পরে বঙ্কিম অসামান্য ভাষায় লিখলেন: "চারিদিকে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মতো হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মতো হিন্দু? আর এই প্রস্তর মূর্তিসকল যে খোদিয়াছিল…তাহারা কি হিন্দু?" এর পরে বঙ্কিমের মনের চরম পরিণতির রূপ: "তখন মনে পড়িল, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক—এ সকলই হিন্দুর কীর্তি—এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

দেখা গেল, হেস্টির সঙ্গে তর্ককালে বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পবোধের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্যমুগ্ধতার প্রকোপে যেমন কাঁচা কথা বলছেন, তেমনি তিনি সাংখ্যদর্শনের প্রভাবে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে পুরুষ প্রকৃতি ও তাদের অবৈধ মিলনের বোধ কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। পূর্বের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে যে-কথা বলেছিলেন, এখানেও তাই বললেন—পুরুষ ও প্রকৃতির বিচ্ছেদেই মুক্তি; কৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি, তাঁদের মিলন তাই অবৈধ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র থেমে থাকেননি। সাংখ্যদর্শনের নৈরাশ্যবাদকে কিভাবে হিন্দু ভক্তরা অতিক্রম করেছেন, তাও দেখিয়েছেন। বলেছেন, হাঁ, সাংখ্য অনুযায়ী রাধা ও কৃষ্ণের মিলন ঘটনাগতভাবে অবৈধ, কিন্তু আত্মা ও প্রকৃতির মিলনে আছে অনন্ত সৌন্দর্য ও আনন্দ—রাধাকৃষ্ণের লীলা আস্বাদনে সেই সর্বব্যাপক আনন্দরূপের অর্চনার দ্বারা হিন্দুরা সাংখ্যের নৈরাশ্য-বাদের প্রতিরোধ করেছে:

"It [the Sankhya] had pronounced their [of Nature and Soul] connection illegitimate; and the legend of Radha and Krishna retains the illegitimate connection. Nevertheless, the Hindu worships this illicit union. He worships it because, with a truer insight than is given to the morose philosopher [Kapila], he has perceived that in this union of the Soul with Nature lies the source of all beauty, all truth and all love. And this magnificent legend, the basis of Hindu religion, of *love for all that exists*, is treated by its European critics as the grossest and most revolting story of crime ever invented by the brain of man. So much for the intellectual superiority of Europe." [স্টেটসম্যানে ২৮ অক্টোবর ১৮৮২ তারিখে লিখিত বঙ্কিমের তৃতীয় পত্র]।

এই ধারণা বঙ্কিম জীবনের শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন। জীবনের শেষ পর্বে লিখিত *Letters on Hinduism*-এর চতুর্থ পত্রে রাধা কৃষ্ণ, ও কুমারসম্ভবের শিব উমার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এই তত্ত্ব কিভাবে প্রতিপাদিত তা দেখিয়েছেন। ওইসব প্রেম সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, তাঁর মতে, সাংখ্যের নৈরাশ্যবাদের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের শেষ প্রচণ্ড প্রতিবাদ। আর পঞ্চম পত্রে তিনি, যেহেতু ইতিমধ্যে কৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্বে বিশ্বাস ঘোষণা করেছেন, তাই রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বলেছেন তা ঐতিহাসিক চরিত্রের উপর রূপকারোপ—রূপকের মানব চরিত্রায়ন বলেননি।

হেস্টি হিন্দু সংস্কৃতিকে বাইরে থেকে জেনেছেন, কিন্তু রেভারেণ্ড কে এম ব্যানার্জি তাকে জানতেন ঘরের মানুষ হিসাবেই। বঙ্কিমচন্দ্র তর্ক-যুদ্ধের টানে হিন্দু সংস্কৃতিকে কোথায় আঘাত করে হিন্দু-অনুভূতিকে পীড়িত করেছেন, তার সঠিক নির্ধারণ রেভাঃ ব্যানার্জি করেছিলেন। তিনি ১৪ নভেম্বর ১৮৮২ তারিখে স্টেটসম্যানে এক চিঠিতে বঙ্কিমকে চেপে ধরলেন তাঁর কয়েকটি দুর্বল ক্ষেত্রে, যথা, বঙ্কিম বলেছেন, বেদ মৃত, কিংবা রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবৈধ। বঙ্কিম যেভাবে ন্যায়, বেদান্ত, ও সাংখ্যকে ব্যাখ্যা করেছেন, তা ওইসব মতের বিশেষজ্ঞরা গ্রহণ করবেন, এমনও নয়। তন্ত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমের মন্তব্যে উনি আপত্তি জানালেন। বঙ্কিম সম্ভবত এই ক্ষেত্রগুলিতে নিজের দুর্বল ভিত্তির কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ২২ নভেম্বরের পত্রে রেভারেণ্ড ব্যানার্জির উত্থাপিত অন্য প্রসঙ্গগুলি এড়িয়ে কেবল তন্ত্র সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

৫

সরাসরি এবার 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের আলোচনায় চলে আসা যায়। এই সঙ্গে 'ধর্মতত্ত্ব'কে যুক্ত করতে হবে। বঙ্কিম বলেছেন, কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশের আগে ধর্মতত্ত্ব বের

করা উচিত ছিল, কারণ ধর্মতত্ত্বের মানববিগ্রহ হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রচার' পত্রিকার ১২৯১ শ্রাবণ (১৮৮৪) সংখ্যায় বেরোল 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম'। তাঁর বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায় ১২৯১ শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ধর্মতত্ত্ব ধারাবাহিক বেরিয়েছে। আর প্রচার পত্রিকায় ১২৯১ আশ্বিন থেকে ধারাবাহিক বেরিয়েছে কৃষ্ণচরিত্র।

দুটি কথা গোড়াতে মেনে নেওয়া ভাল। প্রথম, বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র এবং গীতা-ব্যাখ্যা বাঙালী মনীষার চূড়ান্ত প্রকাশ। এদের মধ্যে ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা এবং অসাধারণ এক গদ্য-লেখকের পরিচয় মেলে। অভাব ও অসঙ্গতির ক্ষেত্রও আছে। কিন্তু এই গ্রন্থগুলির বিরাট মনীষার সমুচ্চ আকার স্তম্ভিত করে দেয়ই। দ্বিতীয়ত, ঐ তিন কৃষ্ণচর্চা গ্রন্থের উপযুক্ত বিষয়-পরিচয় দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। আমি কয়েকটি দিকেই মাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থের সেই অসাধারণ রচনাংশকে স্মরণ করব, যা চকিত আলোকরেখায় ঐ বিরাট মনীষীর মথিত হৃদয়-রাজ্যের কিছুটা যেন দৃষ্টিগোচর করিয়েছে ; যা দেখিয়ে দিয়েছে—বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনের ধর্মীয় ও দার্শনিক পরিণতি তাঁর ক্রমসন্ধানের ফলেই ঘটেছে—তা কোনো হঠাৎ আবেগের সৃষ্টি নয় :

"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কী করিব ? লইয়া কী করিতে হয় ?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোকপ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি, এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি।"

প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে গ্রন্থ পাঠ-সহ নানা পরিশ্রমের কথা বঙ্কিম বললেন—কিন্তু 'সাধনা' শব্দটি উচ্চারিত হল না কোথাও। সর্বস্বত্যাগ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়াও নয়। ধর্মতত্ত্বের গুরু-মুখে বসানো এই কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের ধরে নিয়ে বলতে পারি, মনীষা-শক্তিতে একটা পদ্ধতি নির্মাণের ক্ষেত্রে এর ফলে বঙ্কিম যেমন সাফল্য পেয়েছেন, তেমন কোনো সাফল্য কিন্তু পাননি ধর্মাচার্য হিসাবে। ধর্ম ব্যাপারটা সব সামলানো সামঞ্জস্য নয়—তা একেবারে আগুনে ঝাঁপ। বঙ্কিম বহু সন্ধানে কী পেলেন, এরপরে তা লিখেছেন :

"এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। জীবন লইয়া কী করিব—এই প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি।"

'ভক্তি'র কথা বললেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্যকে বঙ্কিম গ্রহণ করতে পারলেন না। ধর্মতত্ত্বে বলেছেন, ভগবদ্গীতা সকল ভক্তিতত্ত্বের মূল : "এইরূপ অন্যান্য

গ্রন্থেও যাহা আছে সেও গীতামূলক। কেবল চৈতন্যের ভক্তিবাদ ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু অনুশীলন ধর্মের সহিত সে ভক্তিবাদের সম্বন্ধ তাদৃশ ঘনিষ্ঠ নহে, বরং একটু বিরোধ আছে।"

এ প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে 'কৃষ্ণ-চরিত্র' গ্রন্থ-রচনার পিছনকার প্রেরণা বা প্ররোচনার বিষয়ে কিছু বলা উচিত। যুদ্ধকালে যোদ্ধার উদ্দেশ্য যেমন একদিকে সংহার অন্যদিকে সংরক্ষণ, এবং সংরক্ষণের জনাই সংহার—বঙ্কিমও তেমনি কৃষ্ণ বিষয়ে আলোচনায় একই নীতি নিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমত, কৃষ্ণ চরিত্রের বিরুদ্ধে মিশনারি ও তাঁদের অনুবর্তীদের আক্রমণের প্রতিরোধ, এবং সেই সূত্রে কৃষ্ণচরিত্রের উপর আরোপিত গ্লানির অপনোদন; দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক কৃষ্ণের আবিষ্কার; তৃতীয়ত, আদর্শ মনুষ্যত্ব এবং আদর্শ ধর্মের রূপ নির্ণয়।

কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দূর করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম চেষ্টা—আদি ও অকৃত্রিম কৃষ্ণের আবিষ্কার। তিনি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলে বিশ্বাস করতেন, এবং সেই কারণেই তাঁকে ঐতিহাসিক চরিত্র বলে মেনে নেন, যেহেতু ঈশ্বর মানবদেহেই ধরা-ধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বঙ্কিমের মোট সিদ্ধান্ত, স্বয়ং ঈশ্বর মানবদেহ গ্রহণ করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে তাঁর জীবন ও আচরণের মধ্যে কোনো ত্রুটি ছিল না, তিনি পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিগ্রহ। এখন প্রয়োজন, নানা প্রক্ষিপ্তযোগে আতস্থূলতাপ্রাপ্ত মহাভারত থেকে খাঁটি কৃষ্ণের উদ্ধার—সেই সঙ্গে বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে যতটুকু আসল কৃষ্ণ পাওয়া যায়, তার সন্ধান। তিনি বলতে চেয়েছেন, মহাভারতের মধ্যে তিন স্তরের কবির হাত আছে। প্রথম স্তরের কবির রচনাতেই ইতিহাসের কৃষ্ণ নিজ আকারে বর্তমান ছিলেন; প্রথম স্তরের এই কবি অতিশয় প্রতিভাবান, শক্তিশালী এবং ঋজু রচনাশক্তি-সম্পন্ন। দ্বিতীয় স্তরের কবিও প্রতিভাবান, তবে আলঙ্কারিক কবিত্বের অনুরাগী, তদনুযায়ী কল্পনাবিলাসের অধীন। তৃতীয় স্তরের কবি বা কবিরা নিতান্তই তৃতীয় স্তরের, অজস্র গাল-গল্পের জোগানদার, প্রয়োজন অপ্রয়োজন, সঙ্গতি অসঙ্গতির বালাই না রেখে। এই ত্রিস্তর রচনার মধ্য থেকে মূল আবিষ্কারের মতো দুরূহ কাজ অল্পই আছে—সেই কাজে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রতী হয়ে প্রতিভার শাণিত প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং যুদ্ধকালে যে-ধরনের নিষ্ঠুরতা দেখানো হয় সেই প্রকার বা ততোধিক নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন। তাঁর বিচারের মাপকাঠি 'অসঙ্গতি' (সেই সঙ্গে উত্তম কবিত্ব)। কৃষ্ণচরিত্রের উচিত রূপ নির্ধারণ করে, তিনি তার সঙ্গে সঙ্গতিহীন যা-কিছু পেয়েছেন তাকেই প্রক্ষিপ্ত বলে বর্জন করতে চেয়েছেন। এই যুদ্ধকর্মে তিনি প্রধান প্রতিপক্ষ ধরেছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের। সঠিক অর্থগ্রহণে ওঁদের ইচ্ছাপূর্বক বা অনিচ্ছাপূর্বক ভ্রান্তি, ব্যাখ্যাকালেও তাই, যে-কোনো ভারতীয় ব্যাপারকে অর্বাচীন বা অশ্রদ্ধেয় মনে করার প্রবণতা—বঙ্কিমচন্দ্রের কঠোর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিল। তিনি কটু ভাষায় বিখ্যাত বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সমালোচনা করেছেন ('পাশ্চাত্য মূর্খ'); ও তা করার একটা কারণ বোধহয় এই, তিনি

মনে করেছিলেন—টিকি ধরে টান দিলে ঐসব সাহেব-টিকির নিয়গত বাধ্য দেশী ভৃত্যরা সমঝে যাবে। তর্ককালে শোভন ব্যবহার অবশ্যই প্রার্থিত, এবং মার্জিত ভাষাও, কিন্তু তার সরবরাহ থাকবে কেবল নীচস্থ ব্যক্তিদের ভিতর থেকে, আর উপরিস্থরা কেবল উঁচু থেকে অবজ্ঞার থুতু ফেলে যাবে—এতটা সহ্য করা বঙ্কিমের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কী ধরনের ভারত-নিন্দা করা হত, তার কিছু নমুনা আগেই দিয়ে এসেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু অপরদিকে অনেক জায়গায় কুণ্ঠিতও ছিলেন। যেহেতু তাঁর আদর্শ মানুষ কৃষ্ণ কদাপি অবৈধ প্রেমলীলায় মগ্ন থাকতে পারেন না, তাই রাধাকৃষ্ণলীলা বা রাসলীলা, তাঁর মতে, আদিতে ছিল সুন্দর প্রকৃতির আশ্রয়ে বালক বালিকা বা যুবক যুবতীর নির্মল খেলাধুলা। শব্দের চাতুরীতে তিনি রাসকে নিতান্ত নিরামিষ প্রতিপন্ন করেছেন, এবং গোপীলীলার যেসব জায়গায় অতীব ইন্দ্রিয়ঘটিত ব্যাপার আছে, সেগুলিকে পরবর্তী সংযোজন বলে বাতিল করেছেন। এসব অবশ্যই তিনি মিশনারি সমালোচনার মুখ বন্ধের জন্য করেছিলেন। তেমনি শ্রীকৃষ্ণের বহুবিবাহ ব্যাপারটিকেও একবিবাহ করতে গিয়ে সত্যভামার উপর 'প্রক্ষিপ্ত' অস্ত্র চালিয়ে তাঁকে প্রায় অদৃশ্য করে দিয়েছেন। অবশ্য যদি শেষ পর্যন্ত সত্যই কৃষ্ণের বহুবিবাহকে স্বীকার করতে হয়, সেই আশঙ্কায় সর্বাবস্থায় পুরুষের বহুবিবাহ অবিধেয় নয়, এমন একটা তর্ক জিইয়ে রেখেছেন। কৃষ্ণকে চক্রী ও যুদ্ধপ্রিয় বা যুদ্ধোন্মাদ প্রমাণ করার পাশ্চাত্ত্য প্রযত্ন খণ্ডন করার জন্য (হায়, কৃষ্ণ একদা বঙ্কিমেরই হাতে বিসমার্ক হয়ে উঠেছিলেন) তিনি নানা যুক্তি-তথ্য দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কৃষ্ণ কদাপি স্বেচ্ছায় যুদ্ধ চাননি, যথাসাধ্য যুদ্ধ এড়াবার চেষ্টা করেছেন এবং যখন যুদ্ধে সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছেন তখন নিজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত থেকেছেন।

এসকলই কৃষ্ণ-দূষণের বিরুদ্ধে বঙ্কিমের প্রতিবাদ-কার্য। কৃষ্ণমহিমা এবং ধর্মাদর্শ স্থাপনই তাঁর মূল ইতিবাচক কার্য। বঙ্কিম একাধিকবার বলেছেন, নির্গুণ ঈশ্বর নিয়ে ধর্ম হয় না, গুণময় ঈশ্বরকে চাই ধর্মের জন্য এবং তিনি অশরীরী থাকলে সেই ধর্মসত্য মানবগোচর হবেও না, তাই ঈশ্বরের অবতার। ঈশ্বর অবতীর্ণ হন পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপনের জন্য, আর পূর্ণ মনুষ্যত্বই হল ধর্ম। ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র কিভাবে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটবে তার পথনির্দেশ করেছেন। মানুষের বিভিন্ন বৃত্তিকে তিনি চারভাগে বিভক্ত করেছেন—শারীরিকা, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী। মানবজীবনে এই বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশেই পূর্ণ মনুষ্যত্ব। বঙ্কিম বিচার করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, একমাত্র কৃষ্ণের মধ্যেই বৃত্তিগুলির সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্যময় বিকাশ ঘটেছিল, বুদ্ধের মধ্যে নয়, খ্রীস্টের মধ্যে নয়, শ্রীচৈতন্যের মধ্যে নয়—কারণ ওঁরা সন্ন্যাসী, সুতরাং অসম্পূর্ণ মানুষ। সন্ন্যাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বাবধি বাধাগ্রস্ত মনোভাবের রূপ আমরা দেখে এসেছি। এক্ষেত্রে তাঁর মনোভাব প্রোটেস্টান্ট-মত বা ব্রাহ্মমতের অনুরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য-বিধানের পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'অনুশীলন ধর্ম'। সে-ব্যাপারটি যে বহুলাংশে ইউরোপীয় নানা মতের সারাংশ গ্রহণকারী (কোঁত, মিল, বেস্থাম স্পেনসার, সীলী এবং আরও অনেকের) তাও দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেছেন, তবে

পাশ্চাত্য মতগুলি অসম্পূর্ণ কারণ তারা নিরীশ্বরবাদী, আর বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্ম গীতানির্ভর সেশ্বর। বঙ্কিম বারে-বারে, অনেক সময়ে চড়াভাবে, অন্য ধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্মের এবং অন্য ধর্মাচার্যের তুলনায় কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন—

"মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব। যাঁহাতে সে সকলের চরম স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মনুষ্য। খ্রীস্টে তাহা নাই—শ্রীকৃষ্ণে তাহা আছে। যীশুকে যদি রোমক সম্রাট য়িহুদার শাসন-কর্তৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি সুশাসন করিতে পারিতেন? তাহা পারিতেন না। যদি ইহুদীরা রোমকের অত্যাচারপীড়িত হইয়া, স্বাধীনতার জন্য উত্থিত হইয়া, যীশুকে সেনাপতিত্বে বরণ করিত, যীশু কী করিতেন? যুদ্ধে তাঁহার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না।… কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশূন্য, কিন্তু ধর্মার্থ যুদ্ধ হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন। যীশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রবিৎ। আদর্শ মনুষ্য সকল শ্রেণীরই আদর্শ হওয়া উচিত। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের, শাক্যসিংহ যীশু বা চৈতন্যের ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণ-পূর্বক ধর্মপ্রচার ব্যবসায় স্বরূপ অবলম্বন করা অসম্ভব। কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী, ধর্মপ্রচারক, সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বী-দিগের, ধর্মবেত্তাদিগের এবং একাধারে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ।"

৬

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচর্চার, এবং ভারতবর্ষে একালের কৃষ্ণচর্চার ক্ষেত্রে, শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হতে পারত তাঁর গীতা-ব্যাখ্যা যা মাত্র চারটি অধ্যায়ের ব্যাখ্যার পরে অসমাপ্ত থেকে যায়, অসমাপ্ত বিরাটের স্মারক রূপে। এর মধ্যে তিনি একালের মানুষের প্রয়োজনে একালের ভাষায় একালের চিন্তাপ্রণালী অনুসরণ করে গীতা ব্যাখ্যা করেছেন। এতে তিনি গীতার নানা ধরনের দেশী বিদেশী ভাষ্যের উল্লেখ করেছেন। বিদেশী ভাষ্যগুলির অসার চেহারা খুলেও ধরেছেন ক্রমান্বয়ে। এই অসমাপ্ত গ্রন্থটির ভূমিকা অংশে বঙ্কিমের প্রখর মনীষার প্রকৃষ্ট নিদর্শন আছে। লক্ষণীয়, তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—এই চার বর্ণের কর্মচরিত্র আলোচনাকালে বহুলাংশে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। গীতাকে তিনি সরাসরি ঈশ্বর-প্রণীত বলতে রাজি নন, আবার গীতা যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত সত্যকে প্রকাশ করেছে, তাও জানাতে অকুণ্ঠিত। একথা স্পষ্টভাবেই বলেছেন, যুদ্ধের সমর্থন গীতার উদ্দেশ্য নয়, (যেকথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা প্রায়শই বলে থাকেন)—গীতার উদ্দেশ্য যুদ্ধ উপলক্ষ করে মনুষ্যধর্মের পরিচয় দান।

৭

বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাসকে—আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম—তাঁর বৃহত্তর কৃষ্ণচর্চার পরিধির মধ্যে ফেলা যায়। ধর্মতত্ত্বের বিগ্রহ হলেন কৃষ্ণ, এবং তার পুরাণ হল উপন্যাসগুলি। এই 'পুরাণগুলি' উপন্যাস হিসাবে কতখানি সার্থক সে প্রসঙ্গ এখানে

আলোচ্য নয় (আনন্দমঠ ও সীতারামকে আমি শক্তিশালী উপন্যাস বিবেচনা করি এবং দেবী চৌধুরাণীর মতো সমাজচিত্রে ও কাহিনীতে অসামান্য সমৃদ্ধ একটি উপন্যাসের বনগমনে দুঃখই পেয়েছি), এখানে আমাদের লক্ষ্যবস্তু—এদের মধ্যে কতখানি কৃষ্ণ আছেন ?

আনন্দমঠে সরাসরি কৃষ্ণ নেই, তবে সুদর্শনধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণু আছেন, 'হরে মুরারে' গান আছে—অধিকন্তু আছেন নানা শক্তিমূর্তি, এবং বিষ্ণুকোলে স্থাপিতা দেশমাতৃকা, বন্দেমাতরম্ যাঁর বন্দনাগান। আর আছেন গোটা উপন্যাস জুড়ে সন্ন্যাসীরা, লোকহিত যাঁদের ব্রত, যাঁরা কৃষ্ণের অস্পষ্ট ছায়াবাহী সত্যানন্দের প্রেরণায় নব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধিয়েছেন—এবং সত্যানন্দ খাঁটি কৃষ্ণ নন বলে পরাভূত হয়েছেন। বিচিত্র এই সন্ন্যাসীদল, তাঁদের দেশপ্রেম কিছুটা ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র থেকে গৃহীত, কিছুটা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদত্ত। সন্ন্যাসের অভিনব ব্যাখ্যায় ভবানন্দ বলেছিলেন, "তাঁদের সন্ন্যাস অভ্যাসের জন্য।" "কার্য উদ্ধার হইলে, অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে—আমরা আবার গৃহী হইব।" কার্য উদ্ধারের জন্য অপেক্ষা করতে তাঁদের তর সয়নি। তার পূর্বেই সন্ন্যাসের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিহান বঙ্কিমচন্দ্র ওঁদের সন্ন্যাসের বহির্বাস খুলে নিয়ে শান্তি পেয়েছেন। হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত এই সন্ন্যাসীরা যে, কৃষ্ণপূজক চৈতন্যপন্থী নন, তাও উপন্যাসটিতে বলা হয়েছে। "সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন ? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম"—মহেন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে সত্যানন্দ বলেছিলেন :

"সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্মের লক্ষ্য দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার, কেন না বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্তা। দশ বার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। তিনিই জেতা-জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা, আর সন্তানদের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহে—উহা অর্ধেক ধর্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্ধেক বৈষ্ণব।"

অনুশীলন ধর্মের উপযুক্ত উপলব্ধির ব্যর্থতা কিভাবে ব্যক্তি ও সমাজের ধ্বংসের কারণ হয়—সীতারাম উপন্যাসের তাই প্রতিপাদ্য। জয়ন্তীর সন্ন্যাস, ঈশ্বরে সর্বসমর্পণ, সংসার-জীবনে সেই নীতি প্রয়োগের পক্ষে ভারসাম্যহীন বক্তব্য, তার ফলে শ্রী-র ভ্রান্ত ধর্মশিক্ষা এবং তারই ঘূর্ণিচক্রে সীতারামের ঘুরপাক ও ধ্বংস—উপন্যাসে তারই ছবি। উপন্যাসের মুখবন্ধ হিসাবে গীতাবাক্য উদ্ধৃত—যা মানব-স্বভাবের ক্রমপতনের মোহগাঢ় রূপকে জলদ গম্ভীর ভাষায় ধ্বনিত করেছে।

দেবী চৌধুরাণীতে আরও স্পষ্টভাবে অনুশীলন ধর্মসাধনা। বেচারা স্বামীহারা প্রফুল্লকে—ঘড়া-ঘড়া ধন পাইয়ে, পাঁচ বছর ধরে অনুশীলন করিয়ে (তার মধ্যে শাস্ত্রপাঠ থেকে মল্লযুদ্ধ সবই আছে), যথেষ্ট গীতা শুনিয়ে, নিশি ঠাকুরাণীর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব-

সমর্পণের আদর্শ জানিয়ে—দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত করা হয়েছিল। ঘরের মেয়ে প্রফুল্লকে দেবীরাণী করা বঙ্কিমের অভিপ্রায় ছিল না, তাই সে কৃষ্ণের মুখে স্বামী-মুখই দেখেছে সারাক্ষণ—এবং দেবী-গিরি ছেড়ে পুকুরঘাটে সপত্নীদের নিয়ে (বা একলা) কাঁড়ি কাঁড়ি বাসনও মেজেছে শেষ পর্যন্ত। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্যই মনে করেছিলেন—প্রফুল্লর মধ্যে বৃত্তিনিচয়ের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি ঘটেছে—নারীর ক্ষেত্রে সে বস্তুর চেহারা যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে—এবং প্রফুল্ল নারী-কৃষ্ণ ছাড়া কেউ নয়। তাই লেখকের কাছ থেকে সে 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' ইত্যাদি প্রশস্তিও পেয়েছে।

সব জড়িয়ে বলতে হয়—কৃষ্ণ-পুরাণ হিসাবে ত্রয়ী উপন্যাস স্বকার্য-সাধন করতে পারে নি।

৮

বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, মনীষী, দার্শনিক—এই পর্যন্ত অনেকের কাছেই স্বীকার্য, কিন্তু তিনি ধর্মবেত্তা? রীতিমতো সংসারী তিনি, আলো-ছায়া মেশানো জীবন তাঁর, এবং সরকারী চাকুরে—তাঁকে ধর্মবেত্তা গুরু বলে গ্রহণ করা সেকালে সম্ভব ছিল না। তাঁর তৈরী-করা কৃষ্ণ সম্বন্ধেও নানা সমালোচনার ঢেউ উঠল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তৎপর সাংবাদিক, বুদ্ধিমান ও মনস্বী লেখক, চটপটে রসিকতায় পটু, বঙ্কিমের আত্মীয়ও বটেন—বঙ্কিমের বাড়িতে গিয়ে কৃষ্ণচরিত্রের কৃষ্ণ কেমন তা আড়ালে হেসে বঙ্কিমকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন: "পায়োনীয়ারে দেখেছেন তো কান্দাহারে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি আছে, সে কৃষ্ণ পোশাকে-পরিচ্ছদে খাঁটি পাঠান, পাঠানের আব্বা-জাব্বা পরা, পাঠানী পাগড়ির উপর ময়ূরপাখা আঁটা; যেমন জন্ম, যেমন কর্ম, যেমন সংসার, কৃষ্ণও তেমনি ফুটিয়াছে।"[১১] হাসির আড়ালে কঠিন কথা। পাঁচকড়ি অন্যত্র বলেছেন, এদেশে সন্ন্যাসী ছাড়া ধর্মপ্রচারক হয় না। তাই বাংলায় বেশ কয়েকটি ধর্ম-আন্দোলন তলিয়ে গেল কিন্তু "পরমহংস রামকৃষ্ণ যে অভিনব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন বিশাল ন্যগ্রোধের ন্যায় বাংলার শিক্ষিত সমাজকে যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে।[১২] তিনি সন্ন্যাসী দয়ানন্দ এবং সন্ন্যাসী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সম্প্রদায়ের বিস্তৃতির কথাও বলেছিলেন।

কৃষ্ণ-চরিত্র নিয়ে গুরুতর আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল বঙ্কিমের সঙ্গে নবীনচন্দ্র সেনের। নবীনচন্দ্র উৎসাহী কবি, নূতন চিন্তা ও কল্পনায় আন্দোলিত, জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সন্ধানী—তিনি সাহেবী ইতিহাসে পড়া কৃষ্ণ সম্বন্ধে মোহ-ঘোর কাটিয়ে ওঠেন রাজগৃহে গিয়ে; কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা, ভারতবর্ষে মহাধর্ম-সাম্রাজ্য স্থাপনে কৃষ্ণের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা জন্মায়। এই নববোধের কালে তিনি দেখেন, বঙ্কিমচন্দ্র হেস্টি নামক এক পরধর্মদ্বেষী পাদরীর সঙ্গে বৃথা তর্কে শক্তিক্ষয় করছেন। তার বদলে সকল হিন্দুর গ্রাহ্য নব-ধর্মশাস্ত্র যদি তিনি রচনা করেন তাহলে হিন্দুর চিন্তারাজ্যে বিশৃঙ্খলা দূর হয়। এই মর্মে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুরোধও জানালেন। বঙ্কিম ঐ গুরুতর কর্মগ্রহণে নিজ অসামর্থ্য জানালে নবীনচন্দ্র সেই দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করে 'রৈবতক' কাব্য লিখে ফেললেন,

এবং পাঠিয়ে দিলেন বঙ্কিমের কাছে। এই নবোৎসাহের সৃষ্টিতে চমৎকৃত বঙ্কিম নবীনের উচ্চাশাকে অভিনন্দিত করলেন—কিন্তু ব্যাপারটা 'ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিকল্পিত মহাভারত' যদি সত্যই দাঁড়ায় তাহলে দারুণ হবে, এই সমঝানো মন্তব্য করে, ঐ কাব্যের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন। কৃষ্ণকে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, কিংবা ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের দমাতে অনার্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী—নবীনের এই সিদ্ধান্ত মানতে রাজি হলেন না। (কৃষ্ণ-চরিত্র গ্রন্থে কৃষ্ণের ব্রাহ্মণভক্তি বঙ্কিম দেখিয়েছেন; স্মৃতিকথাগুলিতে তাঁর নিজের ব্রাহ্মণাভিমানের কথা আছে, যদিও আলোচাল-বাঁধা বামুনদের নিয়ে অনেক তামাশা তিনি লেখায় করেছেন)। উত্তরে নবীন সেন কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সংঘর্ষের নানা তথ্য দিলেন; এবং বঙ্কিম যে, মানুষই গড়তে পারেন, দেবতা গড়তে জানেন না—এই কথা বন্ধু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রে পড়ে স্বস্তিবোধ করলেন। নবীনচন্দ্র সবচেয়ে আহত হলেন যখন নব্যভারত পত্রিকায় তাঁর 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের আলোচনায় বলা হল, তিনি ভাব ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমের কাছে ঋণী। হীরেন্দ্রনাথ দত্তেরও গোড়ার দিকে তেমন ধারণা ছিল। নবীনচন্দ্র, তাঁকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রাদি দেখিয়ে বোঝাতে পারলেন—এক্ষেত্রে চিন্তায় পূর্বগামী তিনিই। এবং তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অসন্তোষ বোধ করলেন ব্রজলীলা সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যায়—যে ব্রজলীলাকে বঙ্কিম গোড়ায় অস্বীকার করে পরে সংকুচিত আকারে মেনেছিলেন। নবীন সেন প্রশ্ন তুলেছেন, "সমস্ত ভারতেই ভাগবতের কৃষ্ণের পূজা। ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, সমস্ত ভারতবর্ষ…একটি অনৈতিহাসিক মিথ্যার এত কাল পূজা করিতেছে?" প্রেরিত পত্রে নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে এই কঠিন কথাগুলি লিখে পাঠিয়েছিলেন, "কৃষ্ণপ্রেম ও গোপীপ্রেম বা রাধাপ্রেম কথাটি মাত্র আপনি ইংরাজি-নবিশদের ভয়ে মুখে আনেন নাই। কিন্তু চৈতন্যদেব যে, কৃষ্ণপ্রেম, গোপ-গোপীপ্রেম ও রাধাপ্রেম লইয়া হাসিতেন, কাঁদিতেন, নাচিতেন ও মূর্ছিত হইতেন, তাহা কি একটি মিথ্যা কথা লইয়া? আমার বোধহয়, আপনি এখনো ব্রজলীলা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, আপনি চৈতন্যদেবের বিদ্বেষী। আপনি বলিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব অর্ধেক বৈষ্ণবধর্ম মাত্র বুঝিয়াছেন। বোধহয় চৈতন্যদেবের লীলা সম্বন্ধে কোনো বই আপনি এই বিদ্বেষমত পড়েন নাই।[১৩]

বিবেকানন্দ সংসারী নন সন্ন্যাসী, ভারতবর্ষে একালে সুসংগঠিত সন্ন্যাসী-সংঘের প্রতিষ্ঠাতা, আবার তিনি পরাধীন দেশের সামনে শক্তিবাণী উচ্চারণ করেছেন, জাতীয়তা সৃষ্টিতে প্রবল প্রেরণাদাতা—শ্রীকৃষ্ণ ও গীতা সম্বন্ধে তিনি অনেক কথাই বলেছেন এবং তার বেশ-কিছু অংশের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের ঐক্য আছে। কৃষ্ণকে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো করেই সকল মনুষ্য-মধ্যে 'সর্বাঙ্গ সুন্দর' মনে করেছেন—যাঁর মধ্যে "মস্তিষ্কের উৎকর্ষ, হৃদয়বত্তা, ও কর্মনৈপুণ্য সমভাবে বিকশিত।"[১৪] বিবেকানন্দ একথাও বলেছেন, বুদ্ধ প্রমুখ ধর্মাচার্যরা সন্ন্যাসী ছিলেন বলে গৃহীদের সুখ-দুঃখে তাঁদের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল না—কিন্তু কৃষ্ণ কি পুত্ররূপে, কি পিতারূপে, কি রাজারূপে—সর্বাবস্থাতেই আদর্শ

চরিত্র। গীতাকারের মতো আশ্চর্য মস্তিষ্ক কোথাও দেখা যায় নি, এবং "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই বেদের একমাত্র টীকা—একমাত্র প্রামাণিক টীকা—গীতা চিরকালের জন্ম রচিত হইয়াছে।"[১৫] বৈষ্ণবীয় ভাবালুতাকে কঠোরভাবে আক্রমণ করে বিবেকানন্দ কিভাবে মহাভারতের কৃষ্ণের আদর্শ অনুসরণ করার জন্য ভারতীয় তরুণদের আহ্বান করতেন, তাও অনেকের জানা আছে। সেই বিবেকানন্দই রাধাকৃষ্ণলীলাকে বিশুদ্ধ ধর্মাদর্শ হিসাবে সর্বোচ্চ স্তরের বলে অকুণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—মাদ্রাজে এক প্রকাশ্য জনসভায়; এবং যখন তিনি সে-কাজ করেছিলেন তখন সভায় উপস্থিত কোনো-কোনো ইউরোপীয়, এবং সংস্কার-পন্থীদের কেউ-কেউ, বিতৃষ্ণায় সভা ছেড়ে চলে যান। বিবেকানন্দ, 'আদর্শ প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ' অপেক্ষা 'গীতা প্রচারক শ্রীকৃষ্ণের আদর্শকে' একটু নিম্নস্তরের পর্যন্ত বলেছিলেন। তিনি ঐ বক্তৃতায় দীর্ঘসময় নিয়ে গোপীপ্রেমের তত্ত্ব আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করেন—"গোপীপ্রেম দ্বারাই সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বরের সম্বন্ধে বিরোধের একমাত্র মীমাংসা হইয়াছে।" "কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া। এমন কি দর্শনশাস্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারেন না।" তীব্র ভাষায় বলেছিলেন: "আমাদেরই স্বজাতি এমন অনেক অশুদ্ধচিত্ত নির্বোধ আছে যাহারা গোপীপ্রেমের নাম শুনিলে উহা অতি অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া ভয়ে দশ হাত পিছাইয়া যায়।...আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা—কৃষ্ণ গোপীদের সহিত প্রেম করিয়াছেন, এটা সাহেবরা বড় পছন্দ করে না। অমুক পণ্ডিত এই গোপীপ্রেমটা বড় সুবিধার মনে করেন না। তবে আর কি, গোপীদের যমুনার জলে ভাসাইয়া দাও। মহাভারতে দু'এক স্থল ছাড়া—সেগুলিও বড় উল্লেখযোগ্য স্থল নহে—গোপীদের প্রসঙ্গই নাই! দ্রৌপদীর স্তবের মধ্যে এবং শিশুপালের বক্তৃতায় বৃন্দাবনের কথা আছে মাত্র। সুতরাং এগুলি সব প্রক্ষিপ্ত! সাহেবরা যা না চায় সব উড়াইয়া দিতে হইবে। গোপীদের কথা, এমন কি কৃষ্ণের কথা পর্যন্ত প্রক্ষিপ্ত!!"[১৬]

বিবেকানন্দ অবশ্যই ইতিহাস পছন্দ করতেন, এবং পুরাণের সত্যাসত্য ঐতিহাসিকভাবে পর্যালোচনার ঔচিত্যের কথা বলে গেছেন। 'হিস্টরিক্যাল ক্রিটিসিজম'-এর বিষয়েও তাঁর সমর্থন ছিল। তাতে কৃষ্ণ বা খ্রীস্টের ঐতিহাসিকতা যদি ক্ষুণ্ণ হয় তো হোক। তাঁর আপত্তি, অন্যের মুখ চেয়ে সত্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আপস-প্রবণতায়। বঙ্কিমচন্দ্র যখন পাশ্চাত্ত্য মানবতাবাদকে গীতার মার্জনে পরিস্কৃত করে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁকে অনেক গভীরভাবের হিন্দু ধর্মসত্যকে পরিহার করতে হয়েছিল। সেইজন্য ব্যক্তি-জীবনে ধর্মপথ গ্রহণকারী কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কি রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ—কারো কাছেই বঙ্কিমের কৃষ্ণ গ্রাহ্য ছিলেন না। 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-এ দেখি, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর অসুস্থাবস্থাতেও পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, "ছাখো, বঙ্কিম যে-রকম করে কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করছে, তার একটা প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।[১৭] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্র-নাথ বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র দেশের প্রধান লেখক এবং শ্রদ্ধার পাত্র। তা সত্ত্বেও তিনি 'নব-জীবনে' বঙ্কিম-ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্মের নব-ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন—"কর্তব্যের

অনুরোধে।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রশস্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র যেকথা বলেছিলেন তা স্বীকার করার পরেও, দ্বিজেন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি যে, আত্মা, পরকাল, পরমাত্মা ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে ধর্ম গঠিত হতে পারে—বঙ্কিমের ব্যাখ্যায় যা করা হয়েছে বলে তাঁর মনে হচ্ছিল।[১৮] পরবর্তীকালে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বঙ্কিম-কর্তৃক দুটো কৃষ্ণকে দাঁড় করিয়ে তার মধ্যে একটি কৃষ্ণকে আদর্শ করার চেষ্টার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন : বৃন্দাবনের ও মহাভারতের কৃষ্ণকে একই কৃষ্ণ কিভাবে ভাবা সম্ভব, সে বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ অনেক তথ্যযুক্তি দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন : "বঙ্কিমচন্দ্র শেষাশেষি যতই গীতাভক্ত হউন না কেন, তিনি অনেকদিন ধরিয়া পাকা পজিটিভিস্ট ছিলেন। পজিটিভ ফিলজফি যাহাই হউক না কেন, শুধু মানুষকে লইয়া একটা পজিটিভ রিলিজন দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলে চলিবে কেন? রিলিজন কি অমনি গড়িয়া তুলিলেই হয়? পজিটিভিস্ট চাহিল একজন গ্রাণ্ড ম্যান মহাপুরুষ। বঙ্কিমবাবু ভাবিলেন, এই তো আমার হাতের কাছে একজন গ্রাণ্ড ম্যান রহিয়াছেন, যেমন বিষয়বুদ্ধি, তেমনি পরমার্থজ্ঞান, এইরকম চৌকস মানুষ দরকার। অতএব আমাদের দেশে পজিটিভিস্ট রিলিজন দাঁড় করাইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাণ্ড ম্যান করিলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে। তবে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে আর মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে এক করিলে চলিবে না। ফলে দাঁড়াইল বঙ্কিমের কৃষ্ণ চরিত্র।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মনোভাবের দ্বারা কতখানি চালিত ছিলেন জানি না। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে প্রবন্ধ লেখেন ('বঙ্কিমচন্দ্র', বৈশাখ ১৩০১) তার মধ্যে কৃষ্ণচরিত্রের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র "বর্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত" করেছেন, লোকাচার ও দেশাচারের বিরুদ্ধে যে নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণ তাতে আছে, হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগের যে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সেখানে মেলে—সবকিছুরই অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। দুই শত্রুর মধ্য দিয়ে বঙ্কিমকে পথ কেটে অগ্রসর হতে হয়েছিল, এক, যাঁরা অবতারবাদের বিরোধী তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের উপর দেবত্বারোপ অপছন্দ করেন (বঙ্কিম সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণাবতার ঘোষণা করেছেন), আর দুই, যাঁরা শাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষর এবং লোকাচারকে অভ্রান্ত জ্ঞান করেন। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম যে কোথাও উদ্দাম ভাবের আবেগে কল্পনাকে উচ্ছৃঙ্খল গতিতে ছুটতে দেননি, অপরপক্ষে পদে পদে আত্মসংবরণ করে যুক্তির সুনির্দিষ্ট পথ ধরে চলেছিলেন—তার তারিফও রবীন্দ্রনাথ করেছেন।[২০] এই লেখার মাত্র ৯-১০ মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধ লিখলেন (মাঘ-ফাল্গুন ১৩০১), তার মধ্যে প্রশংসার ক্ষেত্রে মুষ্টিভিক্ষা এবং সমালোচনার ক্ষেত্রে বদান্যতা। অবশ্যই তিনি কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে "প্রতিভার প্রবল স্বাধীন বল" আছে, স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু বঙ্কিম যে এই গ্রন্থে "ভাঙিবার কাজ অনেকটা পরিমাণে শেষ করিয়াছেন, গড়িবার কাজে ভাল করিয়া হস্তক্ষেপ করিবার অবসর পান নাই"—সেকথাও বলতে দ্বিধা করেননি। আর যিনি "গড়িবার কাজ" করতে পারেননি, তিনি ধর্মস্থাপক শাস্ত্রকারও হতে পারেন না। ভাবান্তরে

রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথের কথাই সমর্থন করেছেন যখন বলেছেন, "আমাদের মতে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান অধিনায়ক স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি।" পুনশ্চ, "যে মানুষকে বঙ্কিম খুঁজিতেছিলেন তাহার কোথাও কোনো অসম্পূর্ণতা নাই, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত। অর্থাৎ সে একটি মূর্তিমান থিওরি। কিন্তু সম্ভবত মহাভারতকারের কৃষ্ণ দেবতা নহেন, অনুশীলনপ্রাপ্ত চিত্তবৃত্তি নহেন, তিনি কৃষ্ণ।" বঙ্কিমচন্দ্র যেসব ঐতিহাসিক যুক্তির দ্বারা কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ বিপরীত যুক্তিতে তাদের খণ্ড খণ্ড করেছেন (এবং এ ধরনের তর্কের পদ্ধতি অনুসারে রবীন্দ্রনাথের যুক্তির বিরোধী যুক্তি দেওয়াও সম্ভব), সব জড়িয়ে তিনি এইটেই প্রতীয়মান করে তুলেছেন—দেবকীর গর্ভে নয়, বঙ্কিমের বুদ্ধিতে যাঁর জন্ম তিনি ভারতীয় হিন্দুদের আরাধ্য দেবতা নহেন।[২১] (সত্য ও মিথ্যা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত তর্কের কথা এখানে আর আনলাম না)।

আপত্তি এসেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তমহল থেকেও। কালীনাথ দত্তের অভিযোগ, বঙ্কিম কৃষ্ণচরিত্রের উপর আরোপিত দোষগুলি দূর করতে পারলেও কৃষ্ণকে আদর্শ উপাসনার চরিত্র করে তুলতে পারেননি। কৃষ্ণচরিত্রে বৈরাগ্যের বা ভক্তির চিত্র নেই। তা অনুভব করেই পরবর্তী বৈষ্ণবরা শ্রীচৈতন্যের ভক্তি ও বৈরাগ্যময় চরিত্রকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। এসব কথা কালীনাথ বঙ্কিমের সাক্ষাতেই বলেছিলেন।

৯

শেষ প্রশ্ন—কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ত্বের লেখক, গীতার ভাষ্য রচনাকারী, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে ধর্ম ও ভক্তির অনুপ্রবেশ কতখানি ঘটেছিল? তিনি যদি বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গী হতেন তাহলে ভক্তির অবস্থিতির প্রশ্ন না তুললেও পারতাম; কিন্তু তিনি যে সামঞ্জস্যবাদী! আবার রামকৃষ্ণ-পন্থায় সমন্বয়বাদী নন। রামকৃষ্ণপন্থী হলে সমন্বয়বাদী রূপে প্রতিটি পথের প্রান্তে সমসত্য আছে স্বীকার করে নিয়ে, বিশেষ বিশেষ পথের চূড়ান্ত প্রকাশের শক্তি ও ঐশ্বর্যকে বরণ করতেন—বিভিন্ন বৃত্তির ডোজ-মাফিক সরবরাহের যান্ত্রিক চিকিৎসাপ্রণালীকে নয়। এইখানেই বঙ্কিমের বিপুল মনীষা এবং জ্ঞানগত সৃষ্টির অনিবার্য ব্যর্থতা। তাঁর ব্যক্তি-জীবন এবং সাহিত্যজীবনের সর্বত্রই এই দ্বিধার চিহ্ন। উপন্যাসে তিনি প্রচুর সন্ন্যাসী এনেছেন, তাঁরা অনেকেই প্রায় বা পুরো সিদ্ধপুরুষ রূপে আবির্ভূত। তাঁদের সাধন-জীবনের কোনো পরিচয় নেই—রয়েছে অলৌকিক কাণ্ড ঘটাবার প্রচুর ক্ষমতা। কিভাবে সেই শক্তি তাঁরা আয়ত্ত করলেন, সে বিষয়ে বঙ্কিম নীরব। এ-ব্যাপারটা তাঁর ব্যক্তি-জীবনে সন্ন্যাসীঘটিত কিছু অলৌকিক অভিজ্ঞতার ফলে ঘটেছিল। কালীনাথ দত্ত, বা শ্রীশ মজুমদারের স্মৃতিকথা থেকে পাই, মন্ত্রশক্তিতে বঙ্কিমের খুবই বিশ্বাস ছিল, ইচ্ছাশক্তিতে আরোগ্য করাতেও বিশ্বাস করতেন, ঐ ধরনের শক্তি নাকি তাঁর নিজেরও কিছুটা ছিল, জলপড়া, ঝোপ-ঝাড়া, তারকেশ্বরে দেবতার কাছে মানতেও অবিশ্বাসী

ছিলেন না, ম্যাগ্‌নেটিজম সম্বন্ধেও একই কথা। উৎসুক হয়ে কালীনাথকে বঙ্কিম প্রশ্ন করেছিলেন—কোনো সিদ্ধযোগী পাওয়া যায় কি? বঙ্কিমের পিতার জীবনে সাধু-সন্ন্যাসীর ভূমিকার কথা আগেই বলেছি। শচীশচন্দ্র তাঁর বঙ্কিম-জীবনীতে বঙ্কিমের জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর কাছে এক অবাঙালী সাধুর আগমন, উভয়ের গোপন আলাপ, এবং বঙ্কিমের মৃত্যু সম্বন্ধে সাধুর ভবিষ্যৎবাণী—খুব সরলভাবে এইসকল তথ্য জানিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে অতি যুক্তিবাদী বঙ্কিম তাঁর যুক্তির অস্ত্রকে খাপে পুরে রেখেছিলেন।

কিন্তু অলৌকিকতাতে কি শান্তি মেলে? এ জীবন লইয়া কী করিব—সেই যন্ত্রণার উপশম ওতে ঘটবে? বঙ্কিমের সমস্ত প্রশ্নের শেষ উত্তরে আছে—ঈশ্বরভক্তি—কৃষ্ণভক্তি। এক্ষেত্রে বঙ্কিম একটা সঙ্গতি কিন্তু রক্ষা করেছেন। শেষ জীবনের কৃষ্ণভক্তির ক্ষেত্রে—বৃন্দাবনের কৃষ্ণ নন, দ্বারকার কৃষ্ণই তাঁর অর্চনীয়। গীতাই তাঁর সর্বশেষ শাস্ত্র।

বঙ্কিমের গৃহদেবতা রাধাবল্লভের প্রতি একান্ত ভক্তি-ভালবাসার কথা প্রবন্ধের গোড়ায় বলেছি। কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা মতো তিনি বাল্যে-কৈশোরে-যৌবনে জয়দেবের 'ধীর সমীরে' গান গাইতে ভালবাসতেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে 'হরে মুরারে মধুকৈটভভারে', এই স্তোত্রই বেশি উচ্চারণ করেছেন। ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জনৈক পাঠক-মহারাজের কণ্ঠে একদিন গীতার 'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষ পুরাণ' ইত্যাদি অংশের আবৃত্তি শোনার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের অবস্থার বর্ণনা করেছেন:

"এমন সময়ে আমি বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিলাম। ঢুকিয়াই দেখি, আর কেহ নাই, কেবল কাকা একখানি কৌচে শুইয়া আছেন। তাঁহার উভয় চক্ষু মুদিত। মুখসংলগ্ন গড়্গড়ার নল নিঃশব্দ। তিনি যুক্তকর বক্ষের উপর ন্যস্ত করিয়া অনন্যচিত্তে সেই ব্রাহ্মণোচ্চারিত স্তব শুনিতেছেন। মুখে অদ্ভুত ভাব—কি সুন্দর, কি পবিত্র! আমি সভয়ে সসম্ভ্রমে পিছাইয়া আসিলাম।"[২২]

শচীশচন্দ্র লিখেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকালের জন্য মাছ-মাংস ত্যাগ করিয়া হবিষ্যাশী হইয়াছিলেন। গায়ে নামাবলী দিতেন, শুদ্ধাচারে থাকিতেন, সতত গীতা আবৃত্তি করিতেন।" অবশ্য যিনি পঞ্চাশ বৎসর ধরে মাছ-মাংস সেবা করেছেন, তাঁকে কিছুদিন পরে স্বাস্থ্যের কারণে পূর্ব আহারে ফিরতে হয়েছিল, এ কথাও জেনেছি।

বঙ্কিমের শেষ বয়সের অসুখের সময়কার কথা, শচীশচন্দ্রের রচনায়:

"[ডাক্তার] চন্দ্রা-সাহেব আসিয়া শুনিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যহ দীর্ঘকাল ধরিয়া গীতা-পাঠ করেন। সকল কথা শুনিয়া ডাক্তার-সাহেব আদেশ করিলেন, 'গীতাপাঠ বন্ধ রাখিতে হইবে, কথাবার্তাও কমাইতে হইবে।' বঙ্কিমচন্দ্র শুধু একটু হাসিলেন। তেমন হাসি তাঁহার ওষ্ঠে আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই। এ প্রতিভার হাসি নয়, বিদ্রূপের হাসি নয়, অহঙ্কারের হাসি নয়—এ নির্মল আনন্দের হাসি, স্থির বিশ্বাসের বিদ্যুৎস্ফুরণ।...

"যথাসময়ে ঔষধ আসিল।...বঙ্কিম ছিপি খুলিয়া সমস্ত ঔষধটুকু পিকদানিতে ঢালিয়া ফেলিলেন এবং সহাস্যমুখে উচ্চৈঃস্বরে গীতাপাঠ আরম্ভ করিলেন।...অনেক প্রতিবাদ হইয়াছিল...কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও গীতাপাঠ বন্ধ করেন নাই। অবশেষে তিনি

শয্যাগত হইলেন।...মলমূত্র হইতে রক্ত অবিরাম নির্গত হইতে লাগিল। একদিন স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অনেক বুঝাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তর্ক না করিয়া শুধু হাসিয়াছিলেন। অধরে আবার সেই হাসি। সুন্দরবর ছাড়িলেন না। বলিলেন, 'তুমি আত্মহত্যা করিতেছ।' বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিসে'? ডাক্তার সরকার—'যে ঔষধ না খায় সে আত্মঘাতক।' বঙ্কিম—'কে বলিল আমি ঔষধ খাই না?' ডাক্তার—'খাও? কই তোমার ঔষধ?' বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্গুলি হেলাইয়া গীতা দেখাইয়া দিলেন। ডাক্তার সরকার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা।' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।"[২৩]

বঙ্কিম গীতাপাঠ থামাননি। তবে মরণপ্রান্তে উপনীত হয়েও সেবার ফিরে এসেছিলেন—গীতা-ঔষধে অথবা জীবনীশক্তিতে, জানি না। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের কৃষ্ণকে এবং তাঁর বাণীকে জীবনান্ত পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই দৃঢ়তা তাঁর আত্মীয়গণের কাছে পর্যন্ত (যথা জ্যোতিশ্চন্দ্র) আত্মরোধ বলেই মনে হয়েছিল —যে বাধাকে অপসারিত করলে বা করতে পারলে "প্রেমধর্ম-প্লাবিত সমগ্র বঙ্গভূমিতে আজি আবার ভগবদ্‌ভক্তির বান ডাকিত।"

আর যাঁরা বঙ্কিমের গৃহজীবনের চিত্রের উপর নয়, লেখক-জীবনের সৃষ্টি কৃষ্ণচরিত্রের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেন তাঁদের কাছে মনে হবে—বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণ এক নববিশ্বামিত্রের রচিত স্বর্গে স্থাপিত নরবিগ্রহ—বিস্ময়ের মহাসৃষ্টি। বিস্ময়ের নমস্কারই তাঁর প্রাপ্য—বিশ্বাসের প্রণাম নয়। (দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৫)

পাদটীকা

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার কালনির্ণয়ের ব্যাপারে আমি ডঃ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের 'বঙ্কিম সাহিত্য' (১৩৭৮) গ্রন্থের 'সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাপঞ্জী' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জী' অধ্যায় দুটির সাহায্য নিয়েছি। সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'বঙ্কিম রচনাবলী' প্রথম দুই খণ্ড থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা রচনা এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের English Writings থেকে ইংরাজি রচনা গ্রহণ করেছি। ডঃ স্বপন বসু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাংশ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত অনেক দরকারী বই সরবরাহ করেছেন। বই পেয়েছি ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে।

১। বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত (নবপত্র প্রকাশন সংস্করণ, ১৯৮২) পৃ. ১১৯।

২। ঐ, পৃ. ১৩৩-৩৪।

৩। ঐ, পৃ. ২৪-২৫।

৪। 'স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত', শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত (১৩১৮), 'বঙ্কিমকাহিনী' অধ্যায়, পৃ. ১৪৪।

৫। বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ. ১৭৪-৭৫।

৬। ঐ, পৃ. ১৭৬।

৭। ঐ, পৃ. ৬৯।
৮। লেখককৃত 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১০-১২।
৯। ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫।
১০। ঐ, প্রথম খণ্ড পৃ. ৩৭৬।
১১। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত (সাহিত্য পরিষদ), ২য় খণ্ড, পৃ. ১১।
১২। ঐ, পৃ. ১৩৩-৩৪।
১৩। নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, 'আমার জীবন', সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত (সাহিত্য পরিষদ), পৃ. ৪৫৯-৭১ এবং ৩য় খণ্ড পৃ. ৭৬-৯৭।
১৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪২৮।
১৫। ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭।
১৬। ঐ ৫ম খণ্ড পৃ. ১৫০-৫৪।
১৭। পুরাতন প্রসঙ্গ, বিপিনবিহারী গুপ্ত (বিদ্যাভারতী সংস্করণ), সম্পাদক বিশু মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২৮৯-৯০।
১৮। তত্ত্ববোধিনী, ভাদ্র, ১৮০৬ শক।
১৯। পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ. ২৯০-৯২।
২০। রবীন্দ্র-রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সং) ত্রয়োদশ খণ্ড, 'আধুনিক সাহিত্য', পৃ. ৮৯১-৯৬।
২১। ঐ, পৃ. ৯২৫-৩৮।
২২। পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ. ১৫৬।
২৩। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', 'বঙ্কিম কাহিনী' অধ্যায়, পৃ. ২৭-৩১।

শয্যাগত হইলেন।...রক্তমূল হইতে রক্ত অবিরাম নির্গত হইতে লাগিল। একদিন স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অনেক বুঝাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তর্ক না করিয়া শুধু হাসিয়াছিলেন। অধরে আবার সেই হাসি। সুহৃদবর ছাড়িলেন না। বলিলেন, 'তুমি আত্মহত্যা করিতেছ।' বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিসে'? ডাক্তার সরকার—'যে ঔষধ না খায় সে আত্মঘাতক।' বঙ্কিম—'কে বলিল আমি ঔষধ খাই না?' ডাক্তার—'খাও? কই তোমার ঔষধ?' বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্গুলি হেলাইয়া গীতা দেখাইয়া দিলেন। ডাক্তার সরকার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা।' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।"[২৩]

বঙ্কিম গীতাপাঠ থামাননি। তবে মরণপ্রান্তে উপনীত হয়েও সেবার ফিরে এসেছিলেন—গীতা-ঔষধে অথবা জীবনীশক্তিতে, জানি না। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের কৃষ্ণকে এবং তাঁর বাণীকে জীবনান্ত পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই দৃঢ়তা তাঁর আত্মীয়গণের কাছে পর্যন্ত (যথা জ্যোতিশ্চন্দ্র) আত্মরোধ বলেই মনে হয়েছিল —যে বাধাকে অপসারিত করলে বা করতে পারলে "প্রেমধর্ম-প্লাবিত সমগ্র বঙ্গভূমিতে আজি আবার ভগবদ্ভক্তির বান ডাকিত।"

আর যাঁরা বঙ্কিমের গৃহজীবনের চিত্রের উপর নয়, লেখক-জীবনের সৃষ্টি কৃষ্ণচরিত্রের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেন তাঁদের কাছে মনে হবে—বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণ এক নববিশ্বামিত্রের রচিত স্বর্গে স্থাপিত নববিগ্রহ—বিস্ময়ের মহাসৃষ্টি। বিস্ময়ের নমস্কারই তার প্রাপ্য—বিশ্বাসের প্রণাম নয়। (দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৫)

পাদটীকা

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার কালনির্ণয়ের ব্যাপারে আমি ডঃ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের 'বঙ্কিম সাহিত্য' (১৯৭৮) গ্রন্থের 'সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাপঞ্জী' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জী' অধ্যায় দুটির সাহায্য নিয়েছি। সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'বঙ্কিম রচনাবলী' প্রথম দুই খণ্ড থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা রচনা এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের English Writings থেকে ইংরাজি রচনা গ্রহণ করেছি। ডঃ স্বপন বসু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাংশ সংগ্রহ করে দিয়েছেন। ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত অনেক দরকারী বই সরবরাহ করেছেন। বই পেয়েছি ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে।

১। বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত (নবপত্র প্রকাশন সংস্করণ, ১৯৮২) পৃ. ১১৯।

২। ঐ, পৃ. ১৩৩-৩৪।

৩। ঐ, পৃ. ২৪-২৫।

৪। 'স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত', শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত (১৩১৮), 'বঙ্কিমকাহিনী' অধ্যায়, পৃ. ১৪৪।

৫। বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ. ১৭৪-৭৫।

৬। ঐ, পৃ. ১৭৩।

৭। ঐ, পৃ. ৬৯।
৮। লেখককৃত 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১০-১২।
৯। ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫।
১০। ঐ, প্রথম খণ্ড পৃ. ৩৭৬।
১১। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত (সাহিত্য পরিষদ), ২য় খণ্ড, পৃ. ১১।
১২। ঐ, পৃ. ১৩৩-৩৪।
১৩। নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, 'আমার জীবন', সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত (সাহিত্য পরিষদ), পৃ. ৪৫৯-৭১ এবং ৩য় খণ্ড পৃ. ৭৬-৯৭।
১৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪২৮।
১৫। ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭।
১৬। ঐ ৫ম খণ্ড পৃ. ১৫০-৫৪।
১৭। পুরাতন প্রসঙ্গ, বিপিনবিহারী গুপ্ত (বিশ্বভারতী সংস্করণ), সম্পাদক বিশু মুখোপাধ্যায়, পৃ. ২৮৯-৯০।
১৮। তত্ত্ববোধিনী, ভাদ্র, ১৮০৬ শক।
১৯। পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ. ২৯০-৯২।
২০। রবীন্দ্র-রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সং) ত্রয়োদশ খণ্ড, 'আধুনিক সাহিত্য', পৃ. ৮৯১-৯৬।
২১। ঐ, পৃ. ৯২৫-৩৮।
২২। পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ. ১৫৬।
২৩। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', 'বঙ্কিম কাহিনী' অধ্যায়, পৃ. ২৭-৩১।

স্বদেশী আন্দোলন : রবীন্দ্র-অরবিন্দ মতদ্বন্দ্ব

১

স্বদেশী আন্দোলন থেকে সরে আসার পরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন খেয়ার কবিতাগুলি (১৯০৬ জুলাই)। 'নিরুদ্যম', 'সীমা', 'বিদায়', 'সমাপ্তি' ইত্যাদি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের পথান্তরের কবিকথা পেয়ে যাই। আন্দোলন থেকে বিদায় নিয়ে তিনি যখন 'আনন্দময় অগাধ অগৌরবে' মগ্ন হলেন, যখন 'পাখির গানে, বাঁশির তানে, কম্পিত পল্লবে' ফিরে পেলেন নিজের স্বরাজকে—তখন 'দলের সবাই' যদিও তাঁর দিকে হেসে এগিয়ে গিয়েছিলেন, এবং কবি সেইসব 'দুঃখের যাত্রীদের' উদ্দেশ্যে ধন্যধ্বনিও দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি অনুতপ্ত পুনর্বিবেচনায় পূর্বপথ ধরেননি—আর আমরা তাতে আনন্দিত, কেননা তার ফলে পেয়ে গেছি খেয়ার অসামান্য কবিতাগুলিকে, মথিত চেতনার সৃষ্টি যেগুলি, যাদের মধ্যে একদিকে উন্মাদনার পথত্যাগের কিছু যন্ত্রণার ছিটে, অন্যদিকে ঘরে ফেরার নিবিড় সুখ। নিজের সীমাকে লঙ্ঘন করার অনুতাপে কবি বলেছেন, "লোকের কথা নিস্ নে কানে, ফিরিস্ নে আর হাজার টানে, যেন রে তোর হৃদয় জানে—হৃদয়ে তোর আছেন রাজা—একতারাতে একটি যে তার, আপন মনে সেইটি বাজা।" "বিদায় দেহো, ক্ষম আমায় ভাই, কাজের পথে আমি তো আর নাই।...তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে, সেসব মিছে হয়েছে মোর কাছে। রত্নখোঁজা, রাজ্য ভাঙা গড়া, মতের লাগি দেশ-বিদেশে লড়া।" রবীন্দ্রনাথ পৌঁছে গিয়েছিলেন 'সবপেয়েছির দেশে'—সেখানে বয়কটের স্থান ছিল না।

ব্যাপারটার যদি এখানেই শেষ হতো, তাহলে বিশেষ কারো কিছু বলার থাকতো না, কারণ এদেশে 'স্বধর্ম' বড়ো জিনিস, তার সাধনে নিধন পর্যন্ত শ্রেয়—এবং 'পরধর্ম' ভয়াবহ। চরমপন্থীদের, তৎসহ বিপ্লবীদের, নেতা অরবিন্দ পথত্যাগ করে যখন শ্রীঅরবিন্দ হয়ে উঠেছিলেন তখন ইতস্তত প্রকাশিত ক্ষোভ ভিন্ন (যে-ক্ষোভ তরুণ সুভাষচন্দ্র প্রকাশ করে ফেলে প্রচুর গালিগালাজ শুনেছেন) বড় আকারে প্রতিবাদ শোনা যায়নি। তাই কবিতায় কবির ফেরা অবিরোধে গৃহীত হতো, এমন কি হয়তো বন্দিতও, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেখানেই থামতে পারেননি, তিনি যে 'মহান দিগ্-প্রদর্শক', এ-বোধ তাঁর ছিলই, তাই পথত্যাগের কৈফিয়ত দিয়েছিলেন, শুধু তাই নয়, ভিন্নপথিকদের ভ্রান্তযাত্রার চেহারা খুলে ধরতেও চেয়েছিলেন—গোপনে নয়, প্রকাশিত প্রবন্ধে, যাদের কোনো-কোনোটিকে জনাকীর্ণ সভায় পাঠ করেছিলেন পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের সেই রচনাগুলি ইদানীং বিশেষ আদর পাচ্ছে, সেগুলি কবির অভ্রান্ত দৃষ্টির পরিচায়ক ইত্যাদি—বিশেষত এখন যখন স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো সর্বগ্রাসী দাবি হাজির নেই। কিন্তু সমকালের সংগ্রামীরা কবির পথান্তর নিয়ে নয়—পূর্বপথ সম্বন্ধে তাঁর বিস্তারিত সমালোচনার ঔচিত্য নিয়ে, প্রশ্ন তুলেছিলেন, বিতর্ক শুরু হয়েছিল, তাতে অংশ নিয়েছিলেন অরবিন্দ এবং তাঁর পন্থী

বন্দেমাতরম্ পত্রিকা। স্বদেশী আন্দোলনের মত-পথ নিয়ে সেই বিতর্কের ইতিহাস-মূল্য আছে।

তবে স্মরণ করিয়ে দেবো, এই তর্ক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চরমপন্থীদের যতখানি, তার থেকে বহুগুণ বেশি তীব্র মডারেটদের সঙ্গে। সে প্রসঙ্গ নয়, রবীন্দ্র-অরবিন্দ বিতর্কই আমাদের আলোচ্য।

২

আলিপুর বোমার মামলায় ধরা পড়ে অরবিন্দ যখন সবে হাজতবাস শুরু করেছেন, তখন তাঁর দলীয় পত্রিকা বন্দেমাতরম্-এ অনেকগুলি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের নব মতের সমালোচনা করা হয়। এই লেখাগুলির সন্ধান পেয়েছি বরোদার সরকারী দপ্তরে সন্ধান করার সময়ে। লেখাগুলির নাম,

Mediaeval Abstraction and Modern Problem in India (27 May 1908); *Patriotic Reform and National Ideals* (29 May); *Babu Rabindranath Tagore on the Present Situation* (30 May); *Rabindranath on the present Situation*—II (1 June).

বোমার মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার হন ২রা মে ১৯০৮। তার মাসখানেকের মধ্যে এই প্রবন্ধগুলি রচনার মূলে—মতগত আত্মরক্ষার চেষ্টা। অরবিন্দ কারান্তরালে—তাঁর প্রচণ্ড শক্তিশালী কলমের সাহায্য পাবার উপায় নেই; নেতার অনুপস্থিতিতে ভীতি ও অবসাদের প্রসার ঘটেছে; সেখানে রবীন্দ্রনাথের গতিশীল কলম যদি ভিন্ন-দর্শন প্রচার করতে থাকে তাহলে চরমপন্থার পক্ষে ভূমিক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং প্রতিবাদ করতে হয়েছিলই। এই প্রবন্ধগুলির বক্তব্যের কথা পরে আসবে—এখানে কেবল রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে ক্রমিক মতভেদের যে-বিবরণ বন্দেমাতরম্ পত্রিকার উপরি-উক্ত ২৭ মে-র প্রবন্ধ-সূচনায় পাই, তাই উদ্ধৃত করব। (বলে রাখা ভাল, অরবিন্দর রচনা বা বন্দেমাতরম্-এর অন্যান্য সকল রচনাই ইংরাজিতে—আমি মোটামুটি অনুবাদ করে তাদের বক্তব্য হাজির করব)।

"গত সোমবার মিনার্ভা থিয়েটারে বর্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পুরাতন কয়েকটি মতের পুনরাবৃত্তি করে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলি কিছু সতর্ক বিবেচনার যোগ্য। প্রথমত তিনি নূতন ন্যাশন্যালিস্ট দলের নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের অনুগামীদের বিরুদ্ধে তাঁর পুরাতন মত তুলে বলেছেন—ওঁরা জনগণের দেশপ্রীতির ভাবাবেগ বৃদ্ধিতেই সমধিক মনোযোগী, কিন্তু যে-সকল মত ও পদ্ধতি সর্বদেশেই জাতীয়-স্বাধীনতার যথার্থ ভিত্তি রচনা করে—জনগণের জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে তাদের অনু-শীলনের দিকে ওঁরা উপযুক্ত মনোযোগ দেননি।…অর্থাৎ জাতিকে আদর্শ সম্বন্ধে বেশি

কথা শোনানো হয়েছে—কিন্তু কীভাবে ধৈর্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে জাতি বাস্তব লক্ষ্যলাভের দিকে অগ্রসর হবে সেকথা যথেষ্ট বলা হয়নি। আন্দোলনের দিকে যত নজর, সংগঠনে তত নয়, ইত্যাদি।

"কিছুদিন থেকেই বাবু রবীন্দ্রনাথ এই সকল অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন, বিশেষত ন্যাশনালিস্ট দলের সেই অংশের বিরুদ্ধে যার সঙ্গে গত দুই বৎসর তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেননি। যতদূর স্মরণ হয়, এই অভিযোগ তিনি প্রথম তোলেন চট্টগ্রামে; তার পুনরুচ্চারণ করেন পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে; গত সোমবার মিনার্ভা থিয়েটারের সভায় তৃতীয়বার তাকে হাজির করলেন প্রবলতর আকারে।" ['পথ ও পাথেয়' রচনা সম্বন্ধেই শেষোক্ত কথাগুলি]

রবীন্দ্রনাথের মতের সমালোচনা করলেও এই পত্রিকা উল্লিখিত চারটি রচনার মধ্যে একাধিকবার উচ্ছ্বসিত ভাষায় স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের স্বল্পকালীন কিন্তু অতীব উদ্দীপক ভূমিকার কথা অকুণ্ঠে বলেছিল:

"দেশের বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়ে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধারণা এবং সেই পরিস্থিতির উপযুক্ত মোকাবিলা করা সম্বন্ধে তাঁর প্রদত্ত নিরাময়-পন্থা সম্পর্কে মতগত ঐক্য বা অনৈক্য বোধ করা যায়, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলায় তিনি এখনো বিরাট মনন-শক্তি, এবং তাঁর উক্তিসমূহ অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে বিবেচ্য। একথা সত্য, পৃথিবীর সর্বত্র বৈপ্লবিকতার কালে আদর্শের সংঘাত ও ভাবের বিভ্রান্তি ঘটে, অদ্ভুত সেই বৈশিষ্ট্য—এবং তাদের উৎপাতজনক প্রভাব থেকে এমনকি অতি শক্তিশালী মনও নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে না। বাবু রবীন্দ্রনাথ সর্বোপরি কবি; অন্য কবিদের মতোই সমুচ্চ প্রেরণার ক্ষণে ঋষি-স্তরে আরোহণ করেন। কবিরা বিশেষ ভাবাবেগের অধীন—আর ঋষিরা চেতনায় তরঙ্গাধীন। এঁরা মানবসমাজকে উচ্চ আদর্শ দান করেন, জনগণকে চালিত করেন দিব্য আবেগের পথে। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা থেকে বাংলা বহু উচ্চ আদর্শ লাভ করেছে। দেশের নবচেতনা সৃষ্টিতে, বিশেষত তার আধ্যাত্মিক দিকটিতে, তাঁর দান অপরিমেয়। নব জাতীয়তাকে সমৃদ্ধ ও গভীর করতে তাঁর ঋষিসুলভ উক্তি অন্য যে-কোনো জিনিস অপেক্ষা অধিক কাজ করেছে।" (৩০ মে, ১৯০৮, প্রবন্ধ)

এর পরেই এসেছে কবি ও ঋষির সীমাবদ্ধতার কথা। সে প্রসঙ্গ পরে।

১ জুন তারিখের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বন্ধে একই ধরনের প্রশস্তি আছে। তা পরে প্রসঙ্গসহ উপস্থিত করবো।

৩

রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দকে যেখানে দ্বন্দ্বমুখে দেখাতে চাইছি সেখানে ঐ দ্বন্দ্ব চলাকালে

অরবিন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অত্যুচ্চ প্রশস্তিমূলক 'নমস্কার' কবিতাটি কিছু বিস্ময়ের সৃষ্টি করবে। বন্দেমাতরম্ পত্রিকা-সূত্রে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হন ১৬ আগস্ট ১৯০৭, সেইদিনই জামিনে মুক্তি পান। রবীন্দ্রনাথ 'নমস্কার' কবিতাটি লেখেন ২২ আগস্ট—এবং সেটি বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ৭ সেপ্টেম্বর। তার মধ্যে অরবিন্দকে 'দেশবন্ধু', 'স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি' বলে সম্বোধন করা হয়, যিনি ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেননি, বরণ করেছেন কঠিন ত্যাগকে। অরবিন্দকে নিত্যকালের দুঃখব্রতী মানবযাত্রীদের যাত্রাপথে দর্শন করা হয়েছিল ঐ কবিতায়। "বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়—সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়—অখণ্ড বিশ্বাসে"—রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। অরবিন্দ তখন কবির দৃষ্টিতে দেবতার দীপ হস্তে অবতীর্ণ 'রুদ্রদূত'। এঁকে কোনো রাজা শাস্তি দিতে পারেন না, বন্ধনশৃঙ্খল এঁর চরণবন্দনা করে, কারাগার অভ্যর্থনা করে। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অধিকন্তু অরবিন্দ-সূত্রে প্রলয়ঙ্কর দেবতার বন্দনাগানও করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন, ঝঞ্ঝাসাথে সিন্ধুর গর্জন, পাষাণপিঞ্জরভেদী অন্ধবেগ নির্ঝরের উন্মত্ত নর্তন, দেখেছিলেন ভেরিমন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব। তিনি নমস্কার করেছিলেন সেই দেবতাকে "যিনি ক্রীড়াচ্ছলে গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে, মৃত্যু হতে দেন প্রাণ।"

এ কি শুধুই কবিতা? অরবিন্দর বিপজ্জনক চরমপন্থা সম্বন্ধে কিছু না জেনেই রবীন্দ্রনাথ এই বন্দনা রচনা করেছেন? চক্র ও চক্রীদের খুব কাছাকাছি অবস্থান করেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আভাসে-ইঙ্গিতে অরবিন্দর ভূমিকা সম্বন্ধে একেবারে কিছু না-জানা সম্ভব ছিল কি? এবং সেই না-জানার শূন্যতার ভিতর থেকে ঐ প্রলয়-শঙ্খ-ধ্বনিত কবিতা বের হয়ে আসাও কি সম্ভব ছিল?

এহেন প্রশ্নের স্বাভাবিকতা আছে।

এই কবিতাটি রচনার আগে স্বদেশী আন্দোলনের চরমপন্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

৪

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি মতে পূর্বাপর অটুট ছিলেন—'স্বদেশী' মানে কেবল স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন নয়—তা হল স্বদেশী সমাজ গঠন। সে বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ এবং সংশ্লিষ্ট আলোচনাসকল প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল ১৯০৪-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে। একই সময়ে সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' বইয়ের আলোচনাকালে তিনি ন্যাশনালিজম্-প্যাট্রিয়টিজম্-এর বিপদ সম্বন্ধে মোটামুটি কড়া ভাষাতেই সমালোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ সাহেবী স্বাদেশিকতারই নিন্দা করেছিলেন—এবং সাহেবদের স্বাদেশিকতার ধাক্কাতেই যে এদেশী স্বাদেশিকতা চড়া চেহারা ধরছে, তাও বলেছিলেন। "স্বাদেশিকতার ভাবখানা এই যে, স্বদেশের ঊর্ধ্বে আর কিছুকেই স্বীকার না করা। স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বাধে না সেইখানেই ধর্ম বলো, দয়া

বলো, আপনার দাবি উত্থাপন করিতে পারে—কিন্তু যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল, সমস্ত নীচে তলাইয়া যায়। স্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে ধর্মের স্থান দিলে যে-ব্যাপারটা হয় তাহাই প্যাট্রিয়টিজম্ শব্দের বাচ্য হইয়াছে।" এই কথার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যোগ করেছেন, "স্বার্থপরতা কখনই ধর্মের জন্য আপনাকে সংযত করে না, স্বার্থের জন্যই করে।" ইউরোপীয় ইতিহাস থেকে একাধিক দৃষ্টান্তসহ রবীন্দ্রনাথ এই স্বাদেশিক স্বার্থবোধের চেহারা খুলে ধরেছেন। তার পরেই সতর্ক করেছেন, আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় ইউরোপের মতো "পোলিটিকাল অর্থাৎ স্বার্থবদ্ধ জনসম্প্রদায়ের" উদ্ভব না হলেও সে বিষয়ে মোহমুক্ত থাকা দরকার। কারণ, "আমরা আজকাল অনেকেই মনে করি, ন্যাশন্যালিটির স্পর্শে সমস্ত অন্যায় সোনার চাঁদ হইয়া ওঠে।" এই অনেকের মধ্যে কারা পড়েন তার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেননি। কিন্তু তাঁর স্থায়ী বিশ্বাসের ঘোষণাতে এই ১৯০৪ সালেও তিনি পরাঙ্মুখ নন: মনুষ্যত্বকে ন্যাশনালত্বের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে। ন্যাশনালত্বের সুবিধার খাতিরে মনুষ্যত্বকে পদে-পদে বিকাইতে দেওয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দয়তাকে আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা। সেইরূপ ঠকিতে-ঠকিতে অবশেষে একদিন দেখা যাইবে, ন্যাশনালত্ব-সুদ্ধ দেউলে হইবার উপক্রম হইয়াছে।" রবীন্দ্রনাথের বিধান—"আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে—কিন্তু বিলাতের নকলে নহে।"

এর পরেই যখন বঙ্গভঙ্গ-সূত্রে বিরাট স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেল—তখন তার সঙ্গে কয়েক মাস রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকলেন, গান লিখলেন, সভা-সমিতিতে উপস্থিত হলেন, বক্তৃতাদি করলেন, নানাপ্রকার পরিকল্পনার প্রণয়নে অংশ নিলেন। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষ মাত্রাভেদ ঘটে গেল। সবদিক দেখে এবং রেখে প্রবন্ধ লেখার পুরাতন রীতি তিনি বজায় রেখেছিলেন, যার থেকে প্রমাণ করা সম্ভব তাঁর মৌল দৃষ্টি অটুট ছিলই—কিন্তু তিনি এমন তীব্র ভাষায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করেছিলেন, এবং তার বিরুদ্ধে আত্মশক্তির নামে যে-ধরনের প্রতিরোধে প্ররোচনা দিয়েছিলেন যে, তাকে উন্মুক্ত বিদ্রোহে প্ররোচনা বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক—অন্তত চরমপন্থীরা তাই মনে করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' [১৩১২ (১৯০৫) আশ্বিন] প্রবন্ধটির বিশেষ উল্লেখ করেছেন পরবর্তী বিতর্কের সময়ে।

'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তিতত্ত্ব উপস্থিত করেন। বিদেশীর কাছে প্রার্থনায় ফল ফলবে, এমন বিশ্বাস দেশবাসীর নষ্ট হয়ে গেছে। ঐ প্রকার ভ্রান্ত প্রত্যাশার মূলে ছিল এই বিশ্বাস—"মানুষমাত্রেরই অধিকার সমান—এই সাম্যনীতিকে" ইংরেজ স্বীকার করে। রবীন্দ্রনাথ এই কঠিন কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলেন, "সাম্যনীতি সেখানেই খাটে যেখানে সাম্য আছে।" বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির মধ্যে শক্তিসাম্য আছে তাই সেখানে পরস্পরের ব্যবহার-সাম্য। ভারতের সঙ্গে তা রক্ষা করার প্রয়োজন ইংরেজ বোধ করে না। রাজশাসনের ক্ষেত্রে ইংরেজের নির্মম অনুদারনীতি, তার

তুলনায় পূর্বের স্বাধীন ভারতবর্ষে রাজগণের উদারনীতির দৃষ্টান্ত দেখার পরে, রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতকায়গণের নগ্ন নির্লজ্জ জাতিবৈষম্যের বিবরণ দিলেন তিক্ত ভাষায়। "ইহা স্পষ্ট দেখা যায় যে, এশিয়াকে ইউরোপ কেবলমাত্র পৃথক বলিয়া জ্ঞান করে না, তাহাকে হেয় বলিয়া জানে।"

কঠিন থেকে কঠিনতর হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিন্দার ভাষা: "য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতা নিজেকে জাহির করা এবং বজায় রাখাকেই চরম কর্তব্য বলিয়া জানে।" "একটা জাতিকে [ভারতবর্ষকে], যে-কোনো দিকেই হউক, একেবারে অক্ষম পঙ্গু করিয়া দিতে এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-বাদী [বৃটিশ] কোনো সংকোচ অনুভব করে নাই।" "ইংরেজ আজ সমস্ত ভারতবর্ষকে বলপূর্বক নিরস্ত্র করিয়া দিয়াছে, অথচ ইহার নিদারুণতা তাহার অন্তরের মধ্যে একবার অনুভব করে নাই।...এখানে ধর্মের দোহাই একেবারেই নিষ্ফল—কারণ জগতে অ্যাংলো-স্যাকসন্ জাতির মাহাত্ম্যকে বিস্তৃত ও সুরক্ষিত করাই ইহারা চরম ধর্ম জানে, সেজন্য ভারতবাসীকে যদি অস্ত্রত্যাগ করিয়া এই পৃথিবীতলে চিরদিনের মতো নির্জীব নিঃসহায় পৌরুষবিহীন হইতে হয়, তবে সে পক্ষে তাহাদের কোনো দয়ামায়া নাই।"

এদেশীয় ভিক্ষানীতির বিরুদ্ধে পূর্ববৎ যে-সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ করলেন তার ভাষাও এখন তীক্ষ্ণতর : "আমাদের শক্তি নাই, আমরা পারি না, এই মোহই সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর মোহ। যে-ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রয়োগের অধিকার পায় নাই সে আপনার শক্তির স্বাদ জানে না; সে নিজেই নিজের পরম শত্রু। সে জানে আমি অক্ষম, এবং এইরূপ জানাই তাহার দারুণ দুর্বলতার কারণ।" (একেবারে বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর যেন এখানে !)।

খুবই বিপজ্জনক কিছু কথা বললেন এই সঙ্গে। সে কথাগুলি চরমপন্থার প্রাণের কথা। যথা ইংরাজ ভারতবাসীকে অবিশ্বাস করে, অথচ ভারতবাসীর মধ্যে ইংরাজকে সেইপ্রকারে অবিশ্বাস করার ক্ষমতা নেই। (রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় এখানে কিছু আত্ম-সমালোচনাও করেছিলেন)।

প্রয়োজনীয় কথাগুলি এই :

> "অবিশ্বাস করিবার একটা শক্তি মানুষের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইহা কেবল একটা নেতিভাবক গুণ নহে, ইহা কর্তৃভাবক। মনুষ্যত্বকে রক্ষা করিতে হইলে এই অবিশ্বাসের ক্ষমতাকে নিজের শক্তির দ্বারা খাড়া রাখিতে হয়।...
>
> "আশ্চর্যের বিষয়, ভারতবর্ষের পলিটিক্সে অবিশ্বাসনীতি রাজার তরফে অত্যন্ত সুদৃঢ়, অথচ আমাদের তরফে তাহা একান্ত শিথিল। আমরা একই কালে অবিশ্বাস প্রকাশ করি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করি না। ইহাকেই বলে ওরিয়েন্টাল —এখানেই পাশ্চাত্ত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। য়ুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাস করিতে জানে—আর ষোল-আনা অবিশ্বাসকে জাগাইয়া রাখিবার যে-কঠিন শক্তি তাহা আমাদের নাই, আমরা ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই, আমরা কোনোক্রমে বিশ্বাস করিতে পারিলে বাঁচি।...এখন বিরোধপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাস-

পরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুশকিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধাই করে না।"

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার বয়কটকে সমর্থন করেছেন। সমর্থন করার কারণ অবশ্য অন্যান্যদের থেকে ভিন্ন। ইংরাজদের ব্যবসায়িক ক্ষতি হবে, বা দেশীয় ব্যবসায়ীদের লাভ হবে—এইসব কারণের জন্য বয়কটের সমর্থন করেননি ; বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ফলে কৃচ্ছ্রসাধনা করতে হবে, অপরের উপহাস-পরিহাস সহ্য করতে হবে, তা সত্ত্বেও স্বদেশী ব্যবহারের দ্বারা আত্মশক্তির বোধ জাগবে—তারই বিবেচনায় তিনি বয়কট সমর্থন করেছেন। "আমাদের আরাম বিলাস আত্মতৃপ্তি আমাদিগকে প্রত্যহ স্বদেশ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতেছিল, প্রত্যহ আমাদিগকে পরবশ করিয়া লোকহিতব্রতের জন্য অক্ষম করিতেছিল—আজ আমরা সকলে মিলিয়া যদি নিজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দেশের দিকে তাকাইয়া ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ও আরামের অভ্যাস কিছু পরিমাণও পরিত্যাগ করিতে পারি, তবে সেই ত্যাগের ঐক্য দ্বারা আমরা পরস্পরের নিকটবর্তী হইয়া দেশকে বলিষ্ঠ করিতে পারিব।" অত্যন্ত উচ্চ আদর্শের বশবর্তী হয়ে রবীন্দ্রনাথ এসকল কথা বলেছিলেন ; তিনি "অন্তরের লাভের দিকটাতেই" নজর দিয়েছিলেন ; কিন্তু একই রচনার মধ্যে অবিশ্বাসনীতির উপর জোর এবং পাশ্চাত্যদেশীয় কিছু ক্ষুদ্র পরাধীন দেশের বয়কটনীতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা, ব্যাপারটাকে ঠিক 'অন্তরে' আবদ্ধ রাখেনি। তিনি লিখেছেন, "বাল্টীক প্রদেশে জর্জীয় আর্মানিগণ" ন্যাশন্যালিস্ট সম্প্রদায় গঠন করে প্রত্যেক গ্রাম্য-জিলায় স্বদেশী আদালত স্থাপনের দ্বারা রাজকীয় আদালতকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছিলেন, কেবল তাই নয়, তাঁরা বস্তুতপক্ষে মফঃস্বলে সমান্তরাল শাসন প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ধৃত স্টেটসম্যানের বিবরণের অংশ এই ;

"The Drozhakisti or Armenian Nationalist Party, had previously established a similar system of jusftice in rural districts of the province of Erwan and more than that, they had practically supplanted the whole of the Government system of rural administration and were employing agricultural experts, teachers, and physicians of their own choosing."

বলা বাহুল্য এর মধ্যে আত্মশক্তির উপর নির্ভরতা যেমন ছিল, পরশক্তির ক্ষতিসাধনের চেষ্টা কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ, কীভাবে দেশীয় পঞ্চায়েত পদ্ধতি প্রবর্তন করে গ্রামের সর্ববিধ সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে, এই রচনায় তার আলোচনা করেন ; কীভাবে বিভিন্ন গ্রাম-সভাগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে 'বিশ্ববঙ্গপ্রতিনিধিসভা' প্রতিষ্ঠিত করা যাবে, তার প্রসঙ্গও তোলেন। হিন্দু মুসলমান ঐক্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও এনেছিলেন। এবং কিছুটা ধিক্কারের সঙ্গে বলেছিলেন, "জর্জীয়গণ, আর্মানিগণ প্রবল জাতি নহে—ইহারা যে-সকল কাজ প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজে করিতেছে আমরা কি সেই

সকল কাজেরই জন্য দরবার করিতে দৌড়াই না ?" নিতান্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে সরকারী চাকরির ঘৃণ্য রূপের কথা খুলে বলেন :

"আমরা মনিবকে খুশি করিবার জন্য গুপ্তচরের কাজ করিতেছি, মাতৃভূমির বিরুদ্ধে হাত তুলিতেছি, এবং যে-মনিব আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা করে তাহার পৌরুষক্ষয়কর অপমানজনক আদেশও প্রফুল্লমুখে পালন করিতেছি—এই চাকরির আরও বিস্তার করিতে হইবে ?"

১৯০৫ সালে লেখা 'অবস্থা ও ব্যবস্থা প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যতখানি এগিয়েছিলেন তা যে চরমপন্থার খুবই নিকটবর্তী—সানন্দে তা লক্ষ্য করেছিলেন চরমপন্থীরা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা মনে করলেন, রবীন্দ্রনাথ পশ্চাদ্‌অপসরণ করছেন। ১৯০৬ এপ্রিলের শেষের দিকে, যখন মত ও পথ নিয়ে নেতৃবৃন্দের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল, তখন তাতে বিরক্তি ও ক্লান্তি বোধ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে একজন জাতীয় নেতাকে অধিনায়কের পদ দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। ঐক্য-আকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃতকল্প জাতির জন্য সক্রিয় কর্মই গুরুতর প্রয়োজনের বিষয় বলে মনে হয়েছিল। "যাঁহারা পিটিশন বা প্রোটেস্ট, প্রণয় বা কলহ করিবার জন্য রাজবাড়ির বাঁধা রাস্তাটাতেই ঘনঘন দৌড়াদৌড়ি করাটাকেই দেশের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করেন [রবীন্দ্রনাথ বললেন] আমি সে দলের লোক নহি, সে কথা পুনশ্চ বলা বাহুল্য।" নিজেদের মধ্যে বিবাদও তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হল : "ক্ষণে-ক্ষণে এক-একটা রাগারাগির ছুতা লইয়া ছুটা-ছুটি করিয়া বৃথা যাত্রাভঙ্গ করিতে প্রবৃত্তি হয় না।" উদ্‌বোধিত জাতীয় চৈতন্যের বিষয়ে শ্রদ্ধা জানাবার পরে বললেন, "কিন্তু আমরা যদি কেবল পিটিশন ও প্রোটেস্ট, বয়কট ও বাচালতা লইয়া থাকিতাম, তবে এই পার্টিশনই বৃহৎ হইয়া উঠিত—আমরা ক্ষুদ্র হইতাম, পরাভূত হইতাম।" লক্ষ্য করার বিষয়, এই রচনার মধ্যে দেশের দুর্দশায় রবীন্দ্রনাথের একান্ত দুঃখ, এবং পারস্পরিক কলহ দর্শনে অত্যন্ত ক্ষোভ যেমন প্রকাশ পেয়েছে, সেই আকারে কিন্তু আন্দোলন-দ্বারা জনচিত্ত কীভাবে সচেতন হয়ে ওঠে তার উল্লেখ নেই, এবং বঙ্গভঙ্গ রদ প্রশ্নেই যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ নেই, তা বৃহত্তর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় প্রসারিত হয়েছে তাও কথিত হয়নি। বয়কট-ব্যাপারটিকে গুরুতর বিবেচনার বিষয় করার দিকেও তাঁর লক্ষ্য আর নেই।

বৎসরখানেক পরে (আগস্ট ১৯০৭) প্রবাসীতে বেরুল রবীন্দ্রনাথের 'ব্যাধি ও প্রতিকার'। এর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বললেন, ইংরাজ যে ভারতের দাবিকে অগ্রাহ্য করতে সাহস করে তার মূলে আছে আমাদের অনৈক্য। এই অনৈক্য প্রসঙ্গ এবার তিনি রাজনৈতিক মত ও পথের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে আনেননি—এনেছিলেন হিন্দু ও মুসলমানের দ্বন্দ্ব সূত্রে। যে-দ্বন্দ্ব অনেকদিন ধরেই ছিল, বঙ্গভঙ্গের পূর্বেও ছিল, রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক বিদেশী বর্জন আন্দোলন সমর্থনের কালেও ছিল—তার বিষয়ে সমধিক গুরুত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে আলোচনা করলেন। "হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে ; এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।"

"হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।"

এই রচনায় আরও কিছু নতুন সুর দেখা গেল। 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যশাসনের নীতিহীনতা সম্বন্ধে যে-চূড়ান্ত নৈরাশ্য প্রকাশ করা হয়েছিল, এখানে তার পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ আইন সম্বন্ধে ইংরাজের সলজ্জ মমতার প্রসঙ্গ আনলেন। ব্যঙ্গের সঙ্গে এমনও বললেন, ইংরাজের উপর বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন জাতীয়তাবাদীরা। অভিযোগ করে বললেন, অপ্রস্তুত অবস্থায় বয়কট শুরু করা হয়েছিল :

"সশস্ত্র ও নিরস্ত্র উভয়প্রকার যুদ্ধেই নিজের শক্তি ও দলবল বিচার করিয়া চলিতে হয়। আস্ফালন করাকেই যুদ্ধ করা বলে না।...আমরা যখন দেশের পোলিটিকাল বক্তৃতাসভায় তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, 'এবার আমাদের লড়াই শুরু হইল', তখন আমরা নিজের অস্ত্রশস্ত্র দলবলের কোনো হিসাব লই নাই। তাহার প্রধান কারণ, আমরা দেশকে যে যতই ভালবাসিনা কেন, দেশকে ঠিকমতো কোনোদিন জানি না।"

"যেদিন হইতে আমাদের মনে রাগ হইল সেইদিন হইতেই আমরা আকাশ কাঁপাইয়া বড়াই করিতে আরম্ভ করিয়াছি, আমরা এ করিব, আমরা সে করিব, আমরা ম্যাঞ্চেস্টারের রুটি বন্ধ করিব, লিভারপুলের দুই চক্ষু জলে ভাসাইয়া দিব। অথচ মনে-মনে আমাদের ভরসাস্থল কী। ইংরেজেরই আইন, ইংরেজেরই সহিষ্ণুতা।"

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বারবার বলেছেন, বয়কট-যুদ্ধের সময়ে আন্দোলনকারীদের প্রধান সম্বল ইংরাজের ন্যায়বোধে বিশ্বাস ; বাঙালীরা বয়কট করলেও ইংরেজ আইন মোতাবেক চলবে ইত্যাদি। চরমপন্থীদের মধ্যে এই ধরনের বিশ্বাস ছিল কিনা প্রশ্নের বিষয়। কিন্তু ইংরেজচরিত্র সম্বন্ধে ওই প্রকার নিজস্ব একটা বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ ছেড়েও ছাড়তে পারেননি : "কিন্তু ইংরেজ আমাদিগকে যতই পর মনে করুক-না কেন, প্রজাদের প্রতি হঠাৎ উৎপাত করিতে ইংরেজ নিজের কাছে লজ্জিত হয়। এ-প্রকার বেআইনি ভূতের কাণ্ড তাহাদের রাষ্ট্রনীতিপ্রথাবিরুদ্ধ।" "রাশিয়ান কায়দাকে লজ্জা করিবার সংস্কার এখনও তাহাদের আছে।" [কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু অরবিন্দ এবং নিবেদিতা ভারতে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে রাশিয়ার জার-শাসনের তুলনা করবেন]। রবীন্দ্রনাথের এহেন কথাবার্তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ উঠেছিল। তা স্মরণ করে প্রবন্ধশেষে রবীন্দ্রনাথ বললেন,

"আচ্ছা, মানিলাম স্বরাজই আমাদের শেষ লক্ষ্য, কিন্তু কোথাও তো তাহার একটা শুরু আছে, সেটা এক সময়ে তো ধরাইয়া দিতে হইবে। স্বরাজ তো আকাশ-কুসুম নয়, একটা কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়া তো তাহাকে লাভ করিতে হইবে

—নূতন বা পুরাতন বা যে-দলই হউন তাঁহাদের সেই কাজের তালিকা কোথায়, তাঁহাদের প্ল্যান কী, তাঁহাদের আয়োজন কী।"

রবীন্দ্রনাথের এইসব প্রশ্ন—প্রশ্ন জাগিয়েছিল; তাঁর বিস্ময়—বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। এই প্রবন্ধের সাক্ষ্যে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি বদলেছিলেন। সে পরিবর্তন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো রবীন্দ্রানুরাগীকেও বিস্মিত ও বিচলিত করেছে।[১]

৫

রবীন্দ্রনাথের ওই প্রবন্ধ বেরুবার বেশ কয়েক মাস আগে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' সম্বন্ধে অরবিন্দর সাতটি প্রবন্ধ বন্দেমাতরম্-এ বেরিয়ে গেছে। দীপ্ত প্রখর সেই লেখাগুলি ১৯০৭ সালের ১১ এপ্রিল থেকে ২৩ এপ্রিলের মধ্যে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলির সাধারণ নাম ছিল, "নিউ থট্।" ক্রমান্বয়ে প্রবন্ধগুলির নাম :

1. Introduction. 2. Its Object. 3. Its Necessity. 4. Its Methods. 5. Its Obligations. 6. Limits. 7. Conclusions.

চরমপন্থীদের লক্ষ্য এবং উপায় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-স্পষ্ট নির্দেশ চাইছিলেন, তা কিন্তু 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' বিষয়ক এই সকল প্রবন্ধে যথেষ্টই পরিষ্কার ভাষায় লেখা হয়েছিল। প্রবন্ধগুলির বক্তব্যের বিশেষ উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়, কেবল পঞ্চম প্রবন্ধ থেকে বয়কট-বিরোধীদের বিষয়ে অরবিন্দের কঠোর মনোভাবের রূপ দেখে নেওয়া যায়। অরবিন্দ লেখেন :

> "সমগ্র বঙ্গদেশ নিজের ভবিষ্যৎকে পণ রেখে যখন বয়কটকে গ্রহণ করল, লবণ চিনি ও কাপড় এই তিনটি বিদেশী জিনিসকে পরিহার করার ব্রত গ্রহণ করল—তখন ঐ জিনিসগুলি যে-কেউ কিনবে, জাতির কাছে সে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী—এবং সে সামাজিক বয়কট-শাস্তির যোগ্য। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে যেখানে গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে সামাজিক বয়কট অবশ্য-পালনীয় কৃত্য। 'বিদেশী দ্রব্য বয়কট করো, আর যারা বিদেশী দ্রব্য কেনে তাদের বয়কট করো'—মাদ্রাজের স্বদেশবাসীদের কাছে মিঃ সুব্রহ্মণ্য আয়ারের এই হল পরামর্শ। এক্ষেত্রে যাঁরাই আন্তরিক তাঁদেরই এই পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। কারণ ব্যক্তিকে বয়কট না করলে বস্তুর বয়কট কখনই বাস্তব চেহারা নেবে না। সামাজিক বয়কট ভিন্ন নিছক নৈতিক চাপসৃষ্টির দ্বারা জাতীয় কর্তৃত্ব কদাপি নিজ বিধানকে ফলদায়ীরূপে বলবৎ করতে সমর্থ নয়। আর শক্তিশালী জাতীয় কর্তৃত্ব-প্রযুক্ত ফলদায়ী বয়কট ভিন্ন নবনীতিও ফলপ্রসূ হবে না।"

উপসংহার-প্রবন্ধে অরবিন্দ জানালেন :

> "নিজেদের পক্ষে খোলাখুলি এই কথা বলতে পারি, আমরা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-তত্ত্বের প্রচার করলেও তাকে অন্ধ অনড় মতে পর্যবসিত করার ইচ্ছা নেই। পরাধীন দেশে স্বাধীনতা অর্জনই সকলের পক্ষে সর্বাদ্য কর্তব্য, তা যে-উপায়েই হোক, যে-

ত্যাগের মূল্যেই হোক। এই কর্তব্যের কাছে অপর সকল বিচার-বিবেচনা গৌণ। জাতীয় মুক্তি মহান ও পবিত্র যজ্ঞ—বয়কট, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা ও অন্য সকল ছোট-বড় কাজ জাতীয় মুক্তির ছোট-বড় অংশ ছাড়া কিছু নয়। আত্মোৎসর্গের দ্বারা আমরা প্রথম অর্জন করতে চাই স্বাধীনতা।"

অরবিন্দ অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলেননি।

এইকালেই অরবিন্দ 'দি মর‍্যালিটি অব বয়কট' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, বন্দেমাতরম্-সূত্রে অরবিন্দকে গ্রেপ্তারকালে সেটি পুলিশ নিয়ে চলে যায় বলে বন্দেমাতরম্-এ প্রকাশিত হতে পারেনি, কিন্তু পুলিশ কিছুদিন পরে আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলায় অরবিন্দের বিরুদ্ধে সেটি আদালতে পেশ করেছিল। এই লেখাটিতে অরবিন্দ স্পষ্টভাষায় রবীন্দ্রনাথের মতের সমালোচনা করেছিলেন। সমালোচনা খুবই কঠিন :—

"এক ধরনের মন আছে যা আক্রমণাত্মক ব্যাপারের কথা মনে হলেই সিঁটিয়ে পেছিয়ে যায়, যেন ওটা কতই পাপে ভরা।…এমন মনের কাছে সংগ্রামের আনন্দানুভব নিষিদ্ধ। …ওহেন মানুষেরা যাকে উপলব্ধি করতে অসমর্থ, তার বিষয়েই ধরে নেন, সেসব অশুভ ও বিকট। ওঁদের সরব ঘোষণা, 'প্রেমের দ্বারা ঘৃণার নিরাময় করো', 'অবিচারকে দূর করো বিচারের দ্বারা', 'পাপকে নিধন করো ন্যায়ের দণ্ডে।' প্রেম অতি পবিত্র শব্দ ; প্রেমবোধ করা অপেক্ষা প্রেমবাণী দান করা সহজতর। প্রেমের দ্বারা ঘৃণাকে দূর করা দিব্য ব্যাপার—হাজারে একজন হয়তো তাতে সমর্থ। সমগ্র মানবসমাজের প্রতি প্রেমে পূর্ণ ঋষিগণ, কিংবা জাতির দুঃখ-যন্ত্রণা নিরাময়ে ব্যাকুল সেবাধর্মীরা—এ প্রেমে অধিকারী। সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই ঊর্ধ্বজগতে আরোহণ করা বা তাতে অবস্থান করা সম্ভব নয়। রাজনীতি সর্বসাধারণের ব্যাপার—ব্যক্তিবিশেষের ব্যাপার নয়। মানবসাধারণকে ঋষিকৃত্য করতে বলা—দিব্যপ্রেমের স্তরে উত্থিত হয়ে শত্রুপক্ষ অথবা উৎপীড়কদের সম্বন্ধে প্রেমাভ্যাস করতে বলার অর্থ—মানবস্বভাবকে লঙ্ঘন করতে বলা। যখন অবিচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আঘাত করার জন্য মুক্তিদাতার হস্ত উত্তোলিত, তখন তাকে নিষ্ক্রিয় করা মানে অবিচার ও উৎপীড়নকে পুরস্কৃত করা। যাঁরা সংগ্রামকে পাপ এবং আক্রমণকে নীতিহীন বলে মনে করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বোত্তম উত্তর আছে ভগবদ্গীতায়।"

এর পরে সরাসরি রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ :

"পরম মধুরিমা ও প্রেমের কবি রবীন্দ্রনাথ, বাংলার জাগরণের ক্ষেত্রে যিনি অনেক-কিছু করেছেন—তিনি এখন বয়কটের বিরুদ্ধে নিন্দায় কলম ধরেছেন। ওটা নাকি ঘৃণার কাজ। রাজনীতির মধ্যে ঋষিত্ব-সঞ্চারের যে-অভিপ্রায় তিনি পোষণ করেন তা তাঁরই ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন—সাত্ত্বিক অবস্থাধীন রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা বর্ণময়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বয়কট মোটেই ঘৃণাকর্ম নয়—তা আত্মরক্ষাকর্ম ; তার আক্রমণ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই। এহেন বয়কটকে ঘৃণাধর্মী বলার অর্থ এই

দাঁড়ায়—কোনো মানুষকে যখন নিশ্চিতভাবে মেরে ফেলা হচ্ছে তখন হত্যাকারীর বিরুদ্ধে আঘাত করার নৈতিক অধিকার তার নেই। সেই লোকটিকে বলা হল—প্রতিরোধ করার যে-প্রথম অস্ত্রটি তোমার হাতে এসেছে তাকে তুমি প্রয়োগ করতে পারবে না, যেহেতু সেই কাজ ঘৃণার কাজ হয়ে দাঁড়াবে। বয়কট-নিন্দার যুক্তি এই প্রকারই। একথা অবশ্যই ঠিক যে, আত্মরক্ষাকারী মানুষটি তার আততায়ী সম্বন্ধে পবিত্র-মধুর হৃদয়বত্তায় পূর্ণ থাকে না। কিন্তু মানবস্বভাবের কাছে অতখানি আশা করা একটু বেশরকম অবাস্তব হয়ে যায় নাকি ?"

অরবিন্দ বললেন, রাজনীতিতে প্রেমের স্থান আছে, তবে তার জাত আলাদা। সে প্রেম স্বদেশবাসীর জন্য, স্বদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য। সেই প্রেমের টানে মানুষ স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করে ; "মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পিতৃপুরুষদের সঙ্গে মিলন-সম্ভাবনায় পায় অমৃতের স্বাদ।" স্বদেশের নিসর্গপ্রকৃতির দর্শনে, দেশীয় আচার-আচরণের অনুসরণে যে-উন্মাদনা জাগে, তা ওই প্রেমের শারীরিক শিকড় ; অতীতের জন্য গৌরববোধ, বর্তমানের জন্য বেদনাবোধ, ভবিষ্যতের জন্য ব্যাকুল বাসনা, তার কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা ; এবং সেবা, আত্মত্যাগ ও আত্মবিলয়, তার মহৎ ফল। অরবিন্দ পরিষ্কার জানালেন, রাজনীতিতে প্রেম সর্বদাই স্বদেশমুখী। অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে থাকে বারত্ব, কর্তব্য ও ন্যায়বোধ—প্রেম কদাপি নয়। এক জাতির এক ব্যক্তি অন্য জাতির এক ব্যক্তিকে ভালবাসতে পারে, কিন্তু জাতির সঙ্গে জাতির প্রেম মানবস্বভাবের পরিপন্থী। "তাই বৃটিশ জাতির বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতির বয়কটের সিদ্ধান্তকে যখন প্রেমহীনতা বলা হল, সে বস্তু একইসঙ্গে মন্দ মনস্তত্ত্ব ও মন্দ নৈতিকতার নিদর্শন ছাড়া কিছু নয়। এখানে ঘটছে এক জাতির স্বার্থের সঙ্গে অন্য জাতির স্বার্থের সংঘাত। বয়কটের ঘৃণা যথার্থত কোনো জাতির বিরুদ্ধে নয়, ঐ জাতির বদ স্বার্থের বিরুদ্ধে। আগামীকালই যদি বৃটিশের শোষণকার্য বন্ধ হয়ে যায়, তখনই বৃটিশ জাতির বিরুদ্ধে ঘৃণাও দূর হয়ে যাবে।"

অরবিন্দ 'ঘৃণা' সম্বন্ধে কোনো শুচিবাতিকতা দেখালেন না। ঘৃণা যেমন নৈতিকতার হানিকর হতে পারে, তেমনি হতে পারে উজ্জীবকও। তমোগুণ যখন ব্যাপক তখন চাই রজোগুণ—আর রজোগুণের মধ্যে ঘৃণার চেয়ে তীব্রতর অন্য লক্ষণ নেই।

বয়কটের ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি বা হিংসার বিষয়ে অরবিন্দের উত্তর :

"বয়কট বলবৎ করার ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তির প্রশ্ন উঠেছে। ব্যাপারটা কৌশলগত ; প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে জড়িত। হিংসাত্মক কোনো ঘটনা যদি আমাদের সংঘর্ষের মধ্যে ঠেলে দেয় তাহলে তা আমাদের মতো অবস্থায় পতিত জাতির পক্ষে তো সহায়ক। এখানে নৈতিকতার প্রশ্ন আসে না। হিংসাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করলে ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়—এই যুক্তি রাজনীতির নিজস্ব চরিত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সূচক। রাজনীতি মানেই ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। নীতি-নিয়ম তেমন হস্তক্ষেপ ; বাণিজ্যিক সংরক্ষণনীতি তেমন হস্তক্ষেপ ; গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের ইচ্ছাকে আইনকানুনের মধ্য দিয়ে বলবৎ করাও তেমনি হস্তক্ষেপ।

জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে, এমন ব্যক্তিস্বাধীনতা দমন করা সমাজের মৌল নীতির মধ্যে পড়ে। এই দিক থেকে বিচার করলে বলতে হবে, ব্যক্তিবিশেষকে বিদেশী দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয়ে বাধাদান করার সময়ে জাতি তার প্রাথমিক অধিকারই প্রয়োগ করছে।"

দ্বিধাহীন কণ্ঠস্বর অরবিন্দের :

"জোর করে বৃটিশ বস্ত্র পোড়ানো বেআইনি হতে পারে কিন্তু দুর্নৈতিক নয়। যুদ্ধকালে হিংসার প্রয়োগ হল ক্ষত্রনীতি—আর বয়কট হচ্ছে যুদ্ধ। আমেরিকানরা যখন বস্টন-বন্দরে বৃটিশ চা জলে ফেলে দিয়েছিল তখন কেউ সে-কাজ দোষের বলে মনে করেনি। ভারতে অনুরূপ কাজের বেলায় দোষ দেওয়া যাবে না।"

বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ, কিংবা অসৎ উদ্দেশ্যে অনিয়ন্ত্রিতভাবে হিংসার ব্যবহারকেই অরবিন্দ কেবল নীতিহীন বলতে রাজি। তাঁর বিতৃষ্ণা সেই নিষ্ফল দর্শন সম্বন্ধে যা নীতিনিয়ম প্রয়োগ করে যান্ত্রিকভাবে, সব কিছুকে কোনো এক প্রবচনের কাঠামোয় ঢুকিয়ে ফেলতে পারলে তবে খুশি হয়। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন, "ন্যায়নীতি ও ধর্মরক্ষার জন্য ঋষিগণের সাধুত্বের মতোই যোদ্ধার তরবারি প্রয়োজন। শিবাজীকে নিয়েই রামদাসের পূর্ণতা।"

হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় তাঁদের 'শ্রীঅরবিন্দ অ্যাণ্ড দি নিউ থট ইন ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স' নামক গ্রন্থে বন্দেমাতরম্ পত্রিকা থেকে অরবিন্দর রচনা বলে ১০৯টি রচনা সংকলন করেছেন—আভ্যন্তর প্রমাণে এবং বন্দেমাতরম্ পত্রিকার ওই সময়কার সম্পাদকীয় দপ্তরের লেখক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সাক্ষ্যের দ্বারা। তার সবগুলি অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ-রচনাবলীতে গৃহীত হয়নি। সেখানে অগৃহীত অথচ অরবিন্দর রচনা বলে মুখোপাধ্যায়দ্বয় কর্তৃক গৃহীত দুটি রচনার বক্তব্য এখানে উপস্থিত করব। প্রথমটির নাম, 'হোয়াই দি বয়কট সাক্সীডেড্' (৩০ জুলাই ১৯০৭)। এতে বলা হয়, যদি কোনো আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যাপক আকারে সমগ্র জাতি কর্তৃক গৃহীত হয় তাহলে তার ভিতরে নিশ্চয় যুক্তি আছে, ইতিহাস তাই বলে। "বয়কট আন্দোলন এই মহান সত্যের জীবন্ত উদাহরণ। কিশোরগঞ্জের মানুষ বিলাতি দ্রব্য বয়কট ঘোষণার আগে হিসেবী যুক্তিবুদ্ধির মধ্যে যায়নি, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেনি। তাদের মনকে অধিকার করেছিল যে-তাৎক্ষণিক ভাব—তারই স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা তারা করেছে।" যেখানে নেতৃত্ব ভীত সন্ত্রস্ত, পরিপ্রেক্ষিতের বোধহীন, যেখানে তা জাতির নাড়ির স্পন্দন অনুভব করতে পারে না—সেই নেতৃত্বকে সরিয়ে দিয়ে জয়ী হল জনগণের ইচ্ছা। "বাংলার মুখপাত্র হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে ধন্য কিশোরগঞ্জ"—তার কীর্তির অনুরূপ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা হয়েছিল জাহাজী করনীতির বিরুদ্ধে হ্যামডেনের বিদ্রোহ এবং তাতে জনগণের সমর্থনের কাহিনী থেকে। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এর পরেই এসে গিয়েছিল :

"আমাদের রবীন্দ্রনাথ যেন বয়কটের চরম তাৎপর্য বিস্মৃত না হন। বয়কট নিছক কোনো বিরাগ, অসন্তোষ বা ঘৃণার প্রকাশক নয়। তা জনগণের

দীর্ঘ-অনুভূত বাসনাকে রূপায়িত করার প্রয়াস—যার জন্ম ও বিকাশে ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের দান যথেষ্ট।"

তারপরে বয়কট-সমালোচকদের নানা তীব্র বাক্যে বিদ্ধ করা হয়। সমালোচকদের "মৃতকল্প মন", তাঁদের "শূন্যগর্ভ ফরমূলা", "প্রাণহীন লজিক"। "মন্দ দেখতে তাঁদের ব্যাকুল দৃষ্টি।" তাঁরা বুঝতে অসমর্থ যে, মানবিক যুক্তিরাজি মানবিক নীতিবোধের মতোই পারিপার্শ্বিকের ঘটনাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থনীতির দিক দিয়েও বয়কট-বিরোধী যুক্তির মোকাবিলা করার চেষ্টার পরে লেখা হল : "কাল প্রমাণ করে দিয়েছে, বয়কটের নিছক তাত্ত্বিক সমালোচকদের সংশয়বুদ্ধি কত অপদার্থ। ভারতীয় রাজনীতিতে বয়কটই প্রথম বৃহৎ সাফল্য। ...তা রাজনীতি ও দেশপ্রেমকে ছড়িয়েছে ঘরে ঘরে।" "ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান করেছে বয়কট। তা পথ দেখিয়েছে, সম্ভবত একমাত্র পথ—যে-পথে স্বৈরাচারী বিদেশী শাসনে সর্বপ্রকার দুঃখকষ্টের মধ্যে থেকেও কীভাবে নিরস্ত্র জনগণ দেশব্রতে যুক্ত হতে পারে।"

৭ আগস্ট ১৯০৭ তারিখের 'আওয়ার রুলার অ্যাণ্ড বয়কট' লেখাটি ভয়ঙ্কর। ব্যঙ্গকে খুনের ছুরির মতো ব্যবহার করা হয়েছে। হয়তো সেই কারণেই এর মধ্যে স্পষ্টভাবে রবীন্দ্রনাথের নাম করা হয়নি, কিন্তু তিনি, এবং তাঁর সমর্থকরাই যে আক্রমণ-লক্ষ্য তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। (মাত্র এক সপ্তাহ আগে মৃদুতর আক্রমণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম করা হয়েছিল)। যুদ্ধের সময়ে প্রেম-ভালবাসার বংশীধ্বনি প্রসঙ্গ নিয়েই রচনাটির শুরু :

> "প্রায়ই এই বিপরীত যুক্তি হাজির করা হয়—যে-সব নীতি বা পদক্ষেপ শাসক ও শাসিতের মধ্যে, শোষক ও শোষিতের মধ্যে, প্রীতিসম্পর্ক সৃষ্টি করে না, তাদের দুর্নৈতিক এবং অপ-বৌদ্ধিক বলে পরিহার করতে হবে। বয়কট যেহেতু শাসকদের সুখসেব্য ঔষধ নয়, তাই কিছু মোলায়েম মানবতাবাদী ব্যক্তি আতঙ্ক ও অবিশ্বাসের চোখে ব্যাপারটিকে দেখেন। তাঁরা বলেন, হাঁ, আমরা অবশ্যই দেশকে ভালবাসব, কিন্তু দেখতে হবে, সে ভালবাসা যেন বিজাতীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ঘৃণাসঞ্চার না করে। হাঁ, আমরা স্বদেশী দ্রব্যকে পছন্দ করব, তাদের উৎপাদনের উন্নতি ও বিস্তারের চেষ্টাও করব, কিন্তু বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ অতি জঘন্য। বাঁধা বুলি এইরকম : কোনো জাতিই ঘৃণা ও বিদ্বেষের সাহায্যে নিজেদের উন্নতি করতে পারে না, ইত্যাদি। কিন্তু অপরপক্ষে ঐতিহাসিক তথ্যযোগে অধিক সঙ্গতভাবে এই যুক্তি দেওয়া যায়—কোনো জাতিই এতাবৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালবাসা, দয়াদাক্ষিণ্য এবং বিশ্বজনীনতার দ্বারা নিজেদের উন্নতি ঘটিয়েছে দেখা যায়নি।"

ক্রমেই অধিক শাণিত হয়ে উঠল লেখনী :

> "ঐসব নীতিকথামালার বচনগুলি অবশ্যই লড়াইয়ে মার-খাওয়া মানুষদের সবিশেষ উপকারার্থ কথিত, তাতে সন্দেহ করি না। একই কথা অবশ্য

মাঝে-মধ্যে যাঁর বিনীতভাবে শাসকদের উদ্দেশ্যেও নিবেদিত হয়। তবে সে-সবই পত্র-পত্রিকার মুখ্য প্রবন্ধের অন্তর্গত নির্ধারিত স্থানপূরণের সাহিত্যানুশীলন-কৃত্য, তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না। কেউই গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্বাস করেন না যে, ভারতস্থ ইংরাজগণ এই দেশকে স্বেচ্ছাচারী শাসনে রেখে যে-বহুবিধ বস্তুগত সুখসুবিধা আদায় করছেন, সে সকলই তাঁরা বদান্য করুণায় ত্যাগ করে ফেলবেন—কেননা তার দ্বারা তাঁরা শাসিতদের প্রেম-ভালবাসা পেয়ে যাবেন, এবং অধিকন্তু তাতে শাসিতদের স্বার্থরক্ষা ঘটে যাবে!! কেউই সত্যসত্যই আশা করেন না—বৃটিশরা নিজেদের ব্যবসায়-স্বার্থের খরচে ভারতে দেশী শিল্পের বৃদ্ধিতে সাহায্য করবেন, যেহেতু ভারতের কোটি-কোটি মানুষ অনাহারে রয়েছে—দারিদ্র্যে তারা বিধ্বস্ত এবং অসুখী ও অসন্তুষ্ট! কেউই আন্তরিকভাবে এই চিন্তা পোষণ করেন না যে, বৃটিশরা তাদের স্বেচ্ছাচারী সর্বাত্মক শাসনকর্তৃত্বের একবিন্দুও ত্যাগ করবেন, যেহেতু আমাদের হীন পরাধীন অবস্থা জনগণের মধ্যে স্থায়ী ক্রোধ, তিক্ততা বা মানসিক বিরূপতার সৃষ্টি করছে। না, তাঁরা তা করবেন না। ফলে যত শুভকর্মের দায় পড়েছে ভারতের পদানত নির্যাতিত মানুষদের উপর। তাদের কাছে আশা করা হচ্ছে, তারা যেন ঘৃণা ও সংঘাতের পথে না গিয়ে সুমহান ও সংবেদনশীল ভাবানুভূতিতে চালিত হয়ে, জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় কল্যাণসাধনের প্রত্যক্ষ ফলদায়ী [বয়কটের] পথটিকে ত্যাগ করে।"

বন্দেমাতরম্-এর এই প্রবন্ধে পুনশ্চ বলা হল, বয়কট ঘৃণামন্ত্র নয়—তা স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের ঘোষক। শাসকগণ উদারতায় অভিভূত হয়ে বয়কটকে মেনে নেবে, এমন প্রত্যাশাও নেই। "বয়কট শান্তির অর্ঘ্য নিয়ে নয়—আবির্ভূত হয়েছে খড়্গ নিয়ে।" তা অনিবার্য। এতদিন পর্যন্ত "একপক্ষেই ছিল কেবল অসন্তোষ, বিরূপতা ও সহন।" এবার দিক পরিবর্তন হয়েছে। যতদিন অত্যাচার নির্যাতন যন্ত্রণাসহন থাকবে ততদিন থাকবে ক্রোধ ও বৈরিতার মনোভাব। সাধুবাক্যে, নীতিবাক্যে তাকে থামানো যাবে না। স্বাধীনতা ও সমানাধিকার এলেই তবে সৌভ্রাত্র সম্ভব। যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরকে স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক, তাদের পক্ষে উচ্চতর নৈতিকতা আশা করার অধিকারই নেই। শৃঙ্খলিত দাসেরা প্রভুকে ঘৃণা করবে; আবার শৃঙ্খলমোচনের চেষ্টা করা করা হলে প্রভুরাও দাসদের অধিকতর ঘৃণা করবে। এই হল নিয়ম। "তাই স্বাধীনতার বঞ্চনা বহুগুণে অধিক দুর্নৈতিক—এবং স্বাধীনতার পুনঃপ্রাপ্তিই শান্তি ও শুভেচ্ছার প্রথম শর্ত।"

কে কাকে বয়কট করেছে বা করছে, এই প্রশ্নের উত্তরে লেখা হল: "ইংরাজরা আমাদের দেশে আমাদেরই বয়কট করে চলেছে। তারা আমাদের শিল্পকে বয়কট করে নষ্ট করে দিয়েছে; জাতীয় জীবনে উচ্চতর কর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার দ্বারা আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বয়কট করে শীর্ণ ক্ষয়িত করে দিয়েছে; তারা আমাদের বয়কট করেছে স্বদেশীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে, এবং দেশরক্ষার কার্যে। স্বাভাবিকভাবে তাই

স্বত্বসর্বস্ব, অধঃপতিত, নৈরাজ্যযুক্ত ভারতবর্ষ শোষক ও বঞ্চকদের সম্বন্ধে প্রেমদৃষ্টি হানেনি। এখন বয়কট শুরু হয়েছে অপর পক্ষ সম্বন্ধে। সেকাজ কেবল প্রতিশোধের জন্য নয়। তার বৃহত্তর উদ্দেশ্য—ইংরাজদের জাল ছিন্ন করা।…আমরা কি চিরমৃত্যুর দিকে এগিয়েই চলব, ফিরতি-পথ ধরব না, যেহেতু তা করলে সাময়িকভাবে একশ্রেণীর সঙ্গে অন্যশ্রেণীর শত্রুতার মনোভাব জাগবে? আমরা কি চিরকালের জন্য মৃত্যুজালের উপরে শায়িত থাকতে সম্মত হব, যেহেতু বন্ধনমোচনের চেষ্টা করলে জালের মালিক-শিকারী রাগ করবে?" না, যতদিন না ভারতবর্ষ সম-অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ঘৃণার অবসান হবে না। এক্ষেত্রে সংঘাতের পথ ত্যাগ করার চেষ্টা মানে ঈশ্বরবিধান লঙ্ঘন করা—সে চেষ্টা "ভ্রান্তি ও ভণ্ডামি" ছাড়া কিছু নয়। "প্রত্যেক ত্রাণশক্তি বা ত্রাণকর্তা প্রথম পর্যায়ে একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন—আমি তোমাদের মধ্যে শান্তি আনিনি—এনেছি তরবারি।"

এইসব লেখালেখির পরেও বন্দেমাতরম্ পত্রিকাসূত্রে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হলে রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দের উদ্দেশ্যে 'নমস্কার' কবিতা লিখেছিলেন। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা হল, রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দের উদ্দেশ্যে কবিতাটি লেখার দুদিন পরে আমেরিকায় রথীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখেছেন, "স্টেটসম্যান কাগজের চাঁদা ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে বন্দেমাতরম্ কাগজ পাঠাতে থাকব। ওটা খুব ভালো কাগজ হয়েছে। কিন্তু অরবিন্দকে যদি জেলে দেয় তাহলে ও-কাগজের কি দশা হবে জানি না।"[২]

রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে মনে হয়, তিনি বন্দেমাতরম্-এর নিয়মিত পাঠক। সেক্ষেত্রে তাঁর মতের বিরুদ্ধে যে-সব কঠোর সমালোচনা ঐ পর্বে অরবিন্দ করেছিলেন (সেইসঙ্গে তাঁর অনুমোদনে অন্যান্যরা করেছিলেন)—তা কি রবীন্দ্রনাথের নজরে পড়েনি? অথবা তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদী পত্রিকাকেও প্রশ্রয়ের চোখে দেখতে প্রস্তুত ছিলেন? উত্তর জানি না।

৬

মডারেট ও একস্ট্রিমিস্টদের মতসংঘর্ষ ক্রমেই তীব্রতর হল। মডারেটরা বয়কট নামক অস্ত্রটি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রয়োগে নিতান্তই অনিচ্ছুক, আর একস্ট্রিমিস্টরা সেই কর্মে নাছোড়। ১৯০৬ কলকাতা কংগ্রেসে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পরে শেষ পর্যন্ত কেবল বাংলার জন্য বয়কট অনুমোদিত হল। তিলকের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় নেতারা অনেকে বাংলার পক্ষে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যেই বাংলার স্বদেশী আন্দোলন সারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক রূপ ধরেছিল। ১৯০৭-এর শেষে সুরাটে কংগ্রেস বসল, মডারেটরা সরকারের গোপন উস্কানিতে (সরকারী নথিতে তা প্রমাণিত) বয়কট প্রস্তাব বানচাল করবার জন্য যৎপরোনাস্তি করল; আর সেজন্য প্রচণ্ড ক্রোধে চরমপন্থীরা অরবিন্দের নির্দেশে সুরাটের কংগ্রেস ভেঙে দিল। (শ্রীঅরবিন্দ শেষোক্ত কাজের দায়িত্ব সানন্দে স্বীকার করেছেন)। তারপর কিছুদিন সারা ভারতের কাগজপত্রে

কেবল বিবাদ-বিসম্বাদের রে-রে শব্দ। পূর্ব থেকে বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ আরও বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বিলাতপ্রবাসী জগদীশচন্দ্র বসুকে পত্রে লিখলেন (২৩ পৌষ ১৩১৪): "এবার-কার কংগ্রেসের যজ্ঞভঙ্গের কথা তো শুনিয়াছই—তাহার পর হইতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে দিনরাত নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটাঘায়ের উপর দুই দলে মিলিয়াই নুনের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত রহিয়াছে। কেহ ভুলিবে না, কেহ ক্ষমা করিবে না—আত্মীয়কে পর করিয়া তুলিবার যতগুলি উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিবে। কিছুদিন হইতে গবর্মেন্টের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে—এখন আর সিডিশনের সময় নাই—যেটুকু উত্তাপ এতদিন আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল তাহা নিজেদের ঘরে আগুন দিতেই নিযুক্ত হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া বন্দেমাতরম্ কাগজে স্বাধীনতার অভয়-মন্ত্রণাপূর্ণ কোনো উদার কথা আর পড়িতে পাই না, এখন কেবলি অন্য পক্ষের সঙ্গে তাহার কলহ চলিতেছে।"[৩]

'বহুদিন' মানে চার মাসও নয়। মাত্র চার মাস আগে রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরম্-এর বিশেষ প্রশংসা করে পুত্রকে চিঠি লিখেছিলেন।

সুরাট কংগ্রেস-ভঙ্গ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'যজ্ঞভঙ্গ' প্রবন্ধ লিখলেন, তাতে উভয়পক্ষেরই সমালোচনা ছিল—এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দেশহিতকর্মে নিযুক্ত হওয়ার জন্য আবেদনও ছিল।

অল্পদিন পরে রবীন্দ্রনাথ পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন। সম্মেলনের উদ্বোধন হয় ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮। রবীন্দ্রনাথের ভাষণ সাধারণভাবে চরমপন্থীদের মনঃপূত হয়নি, কিন্তু অরবিন্দ এই সূত্রে বন্দেমাতরম্-এ যে-তিনটি সম্পাদকীয় রচনা প্রকাশ করেন, তাদের মধ্যে কিছুটা নমনীয় সুর ছিল।

রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণে সুরাট কংগ্রেসে 'আত্মবিপ্লব' প্রসঙ্গ ছিল। এ সম্বন্ধে কিছুটা প্রশ্রয়ের সুরে তিনি বলেছিলেন, "যে-জীবনধর্মের অতিচাঞ্চল্য কন্‌গ্রেসকে এক্‌বার আঘাত করিয়াছে সেই জীবনধর্মই এই আঘাতকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া কন্‌গ্রেসের মধ্যে নূতন স্বাস্থ্যের সঞ্চার করিবে।" মতবিরোধ কোথায় মঙ্গলকর, আর কোথায় মারাত্মক, তার বিশ্লেষণও কবি করেছিলেন।

হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গ এনে মিলনের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ কতখানি নির্ভরশীল, তা তিনি পূর্ববৎ বলেন।

নূতন দলের আবির্ভাবকে অভিশাপ না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বাগত জানান। নূতন দল চরমপন্থী। শাসকদল যেখানে চরমপন্থী, তার প্রতিক্রিয়ায় চরমপন্থী দলের সৃষ্টি হবেই। সরকারী চরমপন্থার বিকট রূপের বর্ণনা করার সঙ্গে তিনি বললেন, চরমপন্থীদের অসহিষ্ণুতা বাক্য থেকে কার্যে যখন রূপান্তরিত হচ্ছে তখন নিশ্চয় অসুবিধা ও আশঙ্কার কারণ আছে, "কিন্তু সেই সঙ্গে এইটুকু আশার কথা না মনে করিয়া থাকিতে পারি না যে, বহুকালের অবসাদের পরেও স্বভাব বলিয়া একটা পদার্থ এখনও আমাদের মধ্যে রহিয়া গেছে —প্রবলভাবে কষ্ট পাইবার ক্ষমতা এখনও আমাদের যায় নাই—এবং জীবনধর্মে

যে-স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ম বর্তমান এখনও আমাদের মধ্যে তাহা কাজ করিতেছে।" স্বদেশী ও বয়কট সম্বন্ধে বলার কালেও রবীন্দ্রনাথ প্রশ্রয়ের সুর বজায় রেখেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, বয়কট "অন্যকে জব্দ করিবার নহে, ইহা নিজেকে শক্ত করিবার।" "বিদেশীবর্জন ব্যাপারে" দেশবাসী যে যথেষ্ট দুঃখ সহ্য করেছে, তার তারিফ করলেন। আনন্দের সঙ্গে বললেন—শিক্ষিত ছেলেরা স্বদেশী দ্রব্য তৈরি ও বিক্রির কাজে নেমেছে, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, কারখানা তৈরি হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ করলেন, যতখানি উদ্দীপনা হয়েছিল, সংগঠন না থাকায় তাকে যথোচিত কার্যে নিয়োজিত করা যায়নি। সঠিক পন্থা সম্বন্ধে ধারণা নেই, এই কথাটা স্পষ্ট করে তোলার সময় আক্ষেপ করলেন, কোন্ ধরনের স্বরাজ চাই এই তর্কেই বলক্ষয় হচ্ছে। স্বতন্ত্র গ্রামসমাজের প্রয়োজনের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনাও করলেন, গ্রামের শোচনীয় অবস্থার জীবন্ত ছবি আঁকলেন, বিকেন্দ্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণের সমন্বয় কীভাবে ঘটবে, তাও বলবার চেষ্টা করলেন। এবং, তিনি চরমপন্থাকে যতই অনিবার্য বলুন, তার বিরুদ্ধে কঠিন কথাও বললেন : "বিরোধমাত্রই একটা শক্তির ব্যয় ; অনাবশ্যক বিরোধ অপব্যয়। দেশের হিতব্রতে যাঁহারা কর্মযোগী, অনাবশ্যক কণ্টকক্ষত তাঁহাদিগকে পদে পদে সহ্য করিতেই হইবে ; কিন্তু শক্তির ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবার জন্য স্বদেশের যাত্রাপথে নিজের চেষ্টায় কাঁটার চাষ করা কি দেশহিতৈষিতা।...যাঁহারা অনাহূত ঔদ্ধত্য ও অনাবশ্যক উগ্রবাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাদের কর্মের দুরূহতাকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা কি দেশের কাছে অপরাধী নহেন ?"

ভাষণের শেষে যুবকদের উদ্দেশ্যে অপূর্ব ভাবোন্মাদনার ভাষায় রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ আবেদন জানিয়েছিলেন।

অরবিন্দ বন্দেমাতরম্-এ পাবনা সম্মেলন প্রসঙ্গে লিখিত 'স্বরাজ' নামক রচনায় (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮) বললেন, না, মতের বিসম্বাদ আর নয়। "বাংলার হৃদয়-মন স্বরাজকেই একমাত্র লক্ষ্য বলে স্বীকার করে—সে স্বরাজ সংকুচিত বা শর্তসাপেক্ষ নয়। [পাবনা সম্মেলনের] সভাপতি [রবীন্দ্রনাথ] তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আদর্শ সম্বন্ধে অসম্মতির মনোভাব দেখিয়েছিলেন ; কিন্তু পরে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত ভাবপ্রবাহে এমনই অভিভূত হয়ে পড়েন যে, সেই সাবধানী মনোভাবকে পরিহার করে হৃদয়ের আনন্দে প্রেরণাময় বাণী-প্লাবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন—আর তার ফলে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বয়ে যায় মহৎ আদর্শের উন্মাদনার স্রোত। তাঁর বাগ্মিতার বিষয় ছিল স্বরাজ। তাঁর কথা যাঁরা সযত্ন মনোযোগে শুনেছেন তাঁদের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাধাহীন শর্তহীন স্বরাজের আদর্শই কবির হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজিত।... [সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ যাঁরা ঔপনিবেশিক স্বরাজের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তাঁরা ছাড়া] বাকি শ্রোতাদের হৃদয় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ-নির্গলিত ভাবব্যাকুল বাগ্মিতায় স্পষ্টতই আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে কোন্ প্রস্তাব পাস হল আর না-হল তাতে কী এসে যায় !"

৬ মার্চ, ১৯০৮, 'ব্যাক টু দি ল্যাণ্ড' রচনায় অরবিন্দ বললেন, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মাদক-বিষে আত্মহারা বাঙালীরা গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ছুটেছে, ফলে গ্রামের দুর্দশার অন্ত নেই। সুখের বিষয়, জাতীয় আন্দোলন গ্রামের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছে। "শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাবনায় একই প্রয়োজনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গ্রামে ফিরে যাও—এই আহ্বান বেজে উঠুক সুরে-সুরে; এবং যদি বাঙালী হিন্দুর কোনো জ্ঞানবুদ্ধি থাকে তাহলে তারা সে ডাকে সাড়া দেবে।" কৃষির উন্নতি, এবং জাতীয় বাণিজ্যের উন্নতিই যে আগামী দুর্ভিক্ষের নিশ্চিত প্রতিষেধক, অরবিন্দ তাও বললেন।

বন্দেমাতরম্-এ অরবিন্দের পরবর্তী প্রবন্ধ 'দি ভিলেজ অ্যাণ্ড দি নেশন' (৮ মার্চ, ১৯০৮)। এর মধ্যে গ্রাম সংগঠনের প্রসঙ্গ তিনি এনেছিলেন, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানগত যে-সকল প্রশ্ন তুলেছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখিয়ে দেয়। অরবিন্দের মোট বক্তব্য—স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামজীবন সর্বভারতীয় জাতীয়তার পরিপন্থী। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, গ্রীসে স্বয়ংসম্পূর্ণ নগর-জীবন থাকায় গ্রীক-জাতীয়তার সৃষ্টি হয়নি। রোমকরা নগরসীমা ভাঙবার পরেই তার জন্ম হয়েছিল। ভারতবর্ষেও নেশন সৃষ্টি হয়নি গ্রাম-জীবনের স্বাতন্ত্র্যের জন্য। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল আত্মস্বতন্ত্র বর্ণ। কুরুক্ষেত্রে বর্ণভেদ খানিক দূর হওয়ায় কিছুটা নেশন-ভাব এসেছিল। বিদেশী আক্রমণকালে গ্রাম-স্বাতন্ত্র্যের জন্যই এদেশে জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি। মারাঠারা গ্রাম-সমবায় ঘটিয়ে কিছুটা জাতীয়তা এনেছিল। যদি তারা ওর সঙ্গে প্রাদেশিক ও জাতিগত সমবায় ঘটাতে পারত তাহলে ওয়েলেসলির সাধ্য ছিল না তাকে চূর্ণ করেন। অরবিন্দ বললেন, বৃটিশ সাম্রাজ্য গ্রামের স্বাতন্ত্র্য ভেঙে দিয়ে জাতীয়তাসৃষ্টির পথে সবচেয়ে বড় বাধা দূর করেছে। তারপর স্পষ্টত রবীন্দ্রনাথকে স্মরণে রেখে অরবিন্দ লিখলেন, "আমাদের দেশের দু' একজন প্রধান প্রবক্তা-লেখক কখনো-কখনো এই ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, কেবল গ্রামেই রয়েছে মুক্তির ক্ষেত্র—জাতিগঠনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে নয়। কখনো-কখনো বলা হয়েছে—স্বরাজ মানে গ্রামজীবনের পুরাতন স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন। সাম্রাজ্যিক কর্তৃত্ব ইচ্ছামতো কর চাপাক, আইন বানাক, সেসব দিকে নজর না দেওয়াই ভালো কারণ তাদের ধ্বংস করা বড়ই কঠিন। আবার যাঁরা মনে করেন, সরকারের শক্তিকে চোখ বুজে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় (যে-সরকার নিজের ছাড়া অপর ছোট-বড় সকল শক্তিকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর)—তাঁরাও মাঝে মাঝে জোর দিয়ে বলেন, গ্রামেই আছে আমাদের জীবনরহস্যের উৎস; সেজন্য জাতীয় স্বরাজের উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রয়াসকে ত্যাগ করে গ্রামেই তার উপলব্ধির চেষ্টা করা উচিত। মারাত্মক এই পরামর্শ।" অরবিন্দ দৃঢ়ভাবে বললেন, "কোনো কিছুই যেন আমাদের স্বরাজের মহাশক্তিধর আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট করতে না পারে। সে আদর্শ জাতীয় এবং সর্বভারতীয়।" এই সর্বভারতীয় জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে আংশিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, গুপ্তরাজগণ, আকবর, শিবাজী প্রমুখ। "গ্রামসংগঠন অবশ্যকর্তব্য [অরবিন্দ আরও

বললেন], তাতে অবিলম্বে হাত লাগাতে হবে। কিন্তু আমরা যেন সতর্কতার সঙ্গে সেকাজ করি যাতে অনুভূত হয় যে, তা অখণ্ড জাতীয়তার খণ্ডাংশ। প্রত্যেক পদক্ষেপে তা নির্ভরশীল প্রথমত জেলার উপর, দ্বিতীয়ত প্রদেশের উপর, শেষত সমগ্র দেশের সহযোগিতার উপর। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম বা গ্রামগুচ্ছের দিন চলে গেছে, তার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা অবশ্যই করা উচিত নয়।"

৭

সুরাটে কংগ্রেস ভঙ্গের পরে সক্ষোভে রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন, অন্তর্কলহে লিপ্ত আন্দোলনকারীদের মধ্যে তিনি আর ডিসিপ্লিনের চিহ্নমাত্র দেখতে পাচ্ছেন না—তাঁর সে নৈরাশ্যকে (!) বিচিত্রভাবে নাড়িয়ে মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীর বোমা ফাটল, ৩০ এপ্রিল, ১৯০৮; মারা গেলেন মিসেস ও মিস কেনেডি; কয়েকদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার হলেন মুরারিপুকুরের বোমারুরা—এবং অরবিন্দ। রবীন্দ্রনাথ এবার কিন্তু কোনো 'নমস্কার' কবিতা লিখলেন না। আঘাতের পর আঘাত করে গেলেন নানা রচনায় বিপ্লববাদীদের।

রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরির এক অধিবেশনে মিনার্ভা থিয়েটারে ২৫ মে ১৯০৮, পাঠ করলেন সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'পথ ও পাথেয়'। এর গোড়ার দিকে তিনি আত্মমর্যাদাহীন কিছু ব্যক্তির হীন আত্মরক্ষার চেষ্টাকে কঠিন ধিক্কার দেন। ঐসব ব্যক্তি—"আমি ইহার মধ্যে নাই; এ কেবল অমুক দলের কীর্তি; এ কেবল অমুক লোকের অন্যায়; আমি পূর্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি, এসব ভালো হইতেছে না; আমি তো জানিতাম এমনই একটা ব্যাপার ঘটিবে"—ইত্যাদি ব্যগ্রভাবে বলে গা বাঁচাতে এবং ইংরেজের কাছে খাতির কুড়োতে ব্যস্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, বোমার ঘটনার দ্বারা অন্তত এইটুকু প্রমাণ হয়েছে, বাঙালী কেবল বাক্যে বীর নয়, দুঃসাহসের কাজও করতে পারে। অকুণ্ঠে ঘোষণা করলেন, যা ঘটেছে তার পিছনে সকলেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায়িত্ব আছে। তারপরেই কিন্তু ভিন্ন বক্তব্য। একদিকে শোনালেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের মহাবাণী, মহামিলনের সাধনার কথা, অন্যদিকে সতর্ক করলেন এই বলে, ইংরেজ ভারতবাসীর সঙ্গে যে-ব্যবহারই করুক, গুপ্ত হিংসার পথে গিয়ে ভারতবাসী যেন আত্মহত্যা না করে। অজস্র অলঙ্কারে আকীর্ণ ভাষায় বারেবারে বললেন, "শুধুমাত্র ভাঙন, নির্বিচার বিপ্লব কোনোমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।" ও-কাজ মাতালের নেশার মতো; নিজের ঘরে দুর্বুদ্ধিতে আগুন লাগাবার মতো। "মাতাল হইয়া মানুষ খুন করিতে পারে, কিন্তু মাতাল হইয়া কেহ যুদ্ধ করিতে পারে না।" ভারতবর্ষ কল্যাণবাসনায় নিভৃতে তপস্যায় বসেছিল, "এমন সময়ে আজ অকস্মাৎ ধৈর্যহীন উন্মত্ততা যজ্ঞক্ষেত্রে রক্তবৃষ্টি করিয়া তাহার বহুদুঃখসঞ্চিত তপস্যার ফলকে কলুষিত করিয়া নষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে।" বয়কটের প্রচুর নিন্দা রবীন্দ্রনাথ করলেন, বিশেষত যেখানে জবরদস্তি ছিল। "বয়কট ব্যাপারটা অনেক স্থলে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচারের দ্বারা সাধিত

হইয়াছে।" মাত্র কয়েক মাস আগে অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের পাবনা-অভিভাষণে পূর্ণ স্বরাজের ঘোষণা আছে বলে প্রশস্তি করেছিলেন, তাকে কার্যত বিচলিত করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

"ইংরেজ-শাসন নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার 'পরে জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া, সেবার দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা, বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করিয়া লইতে হইবে।"

'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধের সংযোজন হিসাবে রবীন্দ্রনাথ 'সমস্যা' নামক যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে একই কথা ছিল। আরও অগ্রসর হয়ে, ইংরেজ রাজত্বকে এদেশে দীর্ঘদিন অবস্থানের ছাড়পত্র পর্যন্ত দিয়ে ফেলেছেন :

"অতএব যে-দেশে বহু-বিচ্ছিন্ন জাতিকে লইয়া এক মহাজাতি তৈরি হইয়া ওঠে নাই, সে-দেশে ইংরেজের কর্তৃত্ব থাকিবে কি না-থাকিবে, সেটা আলোচনার বিষয় নহে ; সেই মহাজাতিকে গড়িয়া তোলাই সেখানে এমন-একটি উদ্দেশ্য অন্য সমস্ত উদ্দেশ্যই যাহার কাছে মাথা অবনত করিবে—এমন-কি ইংরেজ-রাজত্ব যদি এই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করে, তবে ইংরেজ-রাজত্বকেও আমাদের ভারতবর্ষেরই সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহা অন্তরের সহিত, প্রীতির সহিত স্বীকার করিবার অনেক বাধা আছে। সেই বাধাগুলিকে দূর করিয়া ইংরেজ-রাজত্ব কী করিলে আমাদের আত্মসম্মানকে পীড়িত না করে, কী করিলে তাহার সহিত আমাদের গৌরবকর আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, এই অতি কঠিন প্রশ্নের মীমাংসাভারও আমাদিগকে লইতে হইবে। রাগ করিয়া যদি বলি, 'না আমরা চাই না,' তবু আমাদিগকে চাহিতেই হইবে ; কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এক হইয়া মহাজাতি বাঁধিয়া উঠিতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজ-রাজত্বের যে প্রয়োজন, তাহা কখনই সম্পূর্ণ হইবে না।" (রাজা প্রজা, 'সমস্যা')।

'সদুপায়' নামক প্রবন্ধের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ মুসলমানগণের বয়কট-বিরোধিতার দৃষ্টান্ত ও কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। মুসলমানদের এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে নেতারা যখন ডাক দিয়েছিলেন, তখন তার পিছনে আত্মীয়তার টান নয়, প্রয়োজনের গরজই কাজ করছিল। এই রচনায় রবীন্দ্রনাথ বয়কট ও আনুষঙ্গিক প্রচেষ্টাকে সরোষে নিন্দা করেছেন, যা তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের উপাদান হয়েছে। "আমরা বয়কট-ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে-কোনোপ্রকারেই হোক বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে-পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে

আমরা সহায়তা করিলাম।" "আমরা নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছি, যাহারা আত্মহিত বুঝে না, বলপূর্বক তাহাদিগকে আত্মহিতে প্রবৃত্ত করাইব।" "আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মতো ধৈর্য আমাদের নাই ; আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তিকে দ্রুতবেগে পদানত করিবার জন্য চেষ্টা করি।" বিলাতি জিনিস আমদানি বন্ধ না করলে দোকানে-বাজারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে, এমন হুমকির সংবাদ রবীন্দ্রনাথকে কেউ পত্রযোগে জানিয়েছিল। সেই সূত্রে বললেন "ক্রমে এখন সেই উৎসাহ ঘরে আগুন লাগানো এবং মানুষ মারাতে গিয়া পৌঁছিয়াছে।" "যদি মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে লোকের ঘরে আগুন লাগানো এবং মারধর করিয়া গুণ্ডামি করিতে আমাদের কদাচই প্রবৃত্তি হইবে না।" "তাই বলিতেছি, বিলাতি দ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে ; গৃহবিচ্ছেদের মতো এত বড়ো অহিত আর নাই।" "সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না ; ভয় দেখাইয়া এমন-কি কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া, মতের অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় ঐক্যসাধন বলে না।" রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ শেষে আবেদন করেছিলেন, যেন "প্রেমের কাজে, সৃজনের কাজে, পালনের কাজেই যথার্থভাবে আমাদের সমস্ত শক্তির বিকাশ ঘটে।"

৮

বোমা ও বোমার মামলার পরে চরমপন্থীরা যত বিপাকেই পড়ুন, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার (অথবা আক্রমণের) উত্তর না দিয়ে তাঁদের পক্ষে গত্যন্তর ছিল না। আমরা গোড়ার দিকে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার যে-চারটি রচনার উল্লেখ করেছি, তাদের মধ্যে সেই চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই লেখাগুলি বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধেরই প্রতিবাদ। প্রথম প্রবন্ধের (২৭ মে, ১৯০৮) গোড়ায়, ভাবালুতা ও ভাবোন্মাদনার মধ্যে কোন্ পার্থক্য আছে, তার বিশ্লেষণ করা হয়, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ভাবোত্তেজনায় আত্মহারা হওয়ার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছিলেন। "আমরা কোনো ছেঁদো পানসে ভাবালুতার ভক্ত প্রচারক নই ; ওসব সর্বদাই দুর্বল বুদ্ধি এবং স্নায়ুপীড়িত মনের লক্ষণ।" কিন্তু যথার্থ ভাবানুভূতি ভিন্ন জাতীয়তার সৃষ্টি হতে পারে না। এই ভাবানুভূতি জাগে আত্মবোধ থেকে। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর উক্তি ফিরিয়ে দিয়ে বলা হল, এই আত্মবোধের অনুভূতি সৃষ্টির পিছনে রবীন্দ্রনাথের দান আছে। "রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরম্ মামলাসূত্রে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে রচিত কবিতায় যে-শব্দগুলিকে বিশেষ-চিহ্নিত করেছেন, সেই 'স্বদেশ-আত্মা' সম্বন্ধে চেতনাই—বিদেশের সঙ্গে স্বদেশ-আত্মার পার্থক্য উপলব্ধিই—যথার্থ স্বরাজলাভের পথে প্রথম পদক্ষেপ।" এর পরে পরিষ্কার বলা হল, ভিন্নদেশী সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘাতের দ্বারাই স্বদেশচেতনা স্ফূর্তিলাভ করতে পারে। "জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনার জাগরণের জন্য এই সংঘাতের ধারণা সৃষ্টি করা তাই নিতান্ত প্রয়োজন।" প্রেম-ব্যাপার খুবই সুন্দর, কিন্তু ভারতবর্ষের

এখন বিদেশীর সঙ্গে প্রেম করার সময় নয়। "আমরা বিজাতি-বিদ্বেষের প্রচারক নই," বন্দেমাতরম্ বলল, কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিল একই সঙ্গে, সত্যকার প্রেম আসতে পারে সংঘাতের পথেই, "যেমন কঠিনতম সংগ্রামের পরিণতিতেই মেলে খাঁটি শান্তি।" রবীন্দ্রনাথের তাত্ত্বিকতা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট ভাষায় পত্রিকাটি বলল, "অতীতে নির্বস্তুক তাত্ত্বিকতা এবং ভাববাহুল্য আমাদের চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সর্বাধিক দুর্বলতার হেতু হয়েছে ; প্রধানত তারই ফলে প্রাচীন পৃথিবীতে আমাদের যে-সম্মানের আসন ছিল তা হারিয়েছি। ঐ প্রকার নির্বস্তুক তাত্ত্বিকতা এখনো চালিয়ে গেলে আমাদের পরাধীনতা ও পতন অব্যাহত থাকবে।" "বায়ুচর তত্ত্ব এবং ছেঁদো সাধুবচন" ভারতবর্ষকে নেতিবাদী করে কোন্ সর্বনাশে ঠেলে দিয়েছিল তা বলার সঙ্গে এও বলা হল, অবাস্তব তত্ত্ব থেকে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে মুক্ত করার উপরে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। "বিচারমুখে সেই চেষ্টা করলেই দেখতে পাবো, সংঘাত ও শত্রুতা পর্যন্ত ত্রাণ-করুণার ভাব-বর্জিত নয়। এ-জিনিসটি অবশ্য বাবু রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর মতাবলম্বী ব্যক্তিরা এখনো পর্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। অথচ রবীন্দ্রনাথ যে-ঐক্যবোধকে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ লক্ষণ বলে ঘোষণা করেছেন, তাই তাঁকে আপাত অশুভের মধ্যে শুভবস্তুর দর্শনে প্রণোদিত করতে পারত। ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিচিত্র পদ্ধতির অনুসরণে তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন যে, সংঘাত ও শত্রুতা উদ্ভিন্নমান প্রেম ও সমন্বয় ছাড়া কিছু নয়।" এর পরে সমন্বয়তত্ত্ব ব্যাখ্যাত। ভারতীয় সংস্কৃতির খাঁটি ভাবধারার সঙ্গে ইউরোপের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষবাদের কোনো বিরোধ নেই। "উভয় ভাবের মহামিলন ঘটাবার জন্য হিন্দু-ইতিহাস ও হিন্দু-সংস্কৃতিকে ব্যাপকতর দৃষ্টিতে দর্শন করতে হবে—যা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিবা বাবু চন্দ্রনাথ বসু এতাবৎ করে উঠতে পারেন নি।" বন্দেমাতরম্-এর মতে, রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ নামক "দুই বিরাট বাঙালী লেখক" হিন্দুভাবের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দুই ভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাঁরা হাত মিলিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথের ভাবধারার মধ্যে বিস্ময়কর সমরূপতা এই পত্রিকা দেখেছে : "গত সোমবার মিনার্ভা থিয়েটার-মঞ্চে বাবু চন্দ্রনাথ বসু প্রকাশ্যে বাবু রবীন্দ্রনাথের উপর যে-সাধুবাদ বর্ষণ করেছেন তা তাঁদের মধ্যে সদা-বর্তমান সুস্পষ্ট আত্মীয়তা দেখিয়ে দেয়। একদিকে [রবীন্দ্রনাথের] যুক্তিবাদী ও বিমূর্ত তত্ত্ববাদী মত, অন্যদিকে [চন্দ্রনাথের] বহিরঙ্গ আচার ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাবাদী মত—উভয়ের মধ্যে আংশিক সম্পর্ক আমরা লক্ষ্য করতে পারছি। একথা শুনলে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত শিউরে উঠবেন যদিও তা ষোলআনা সত্য—পৌত্তলিকতা বলে যে-বস্তুর নিন্দায় মনোভাবে তিনি এযাবৎ বর্ধিত—সে-বস্তু তাঁর দ্বারা সত্য বলে স্বীকৃত ও প্রচারিত নিরাকার একেশ্বরবাদের স্বাভাবিক সন্তান। বাবু চন্দ্রনাথও বিমূর্ত ব্রহ্মজ্ঞানে বিশ্বাসী। কেবল তিনি রবীন্দ্রনাথের অননুরূপভাবে মনে করেন—ও-বস্তুকে পাওয়া যাবে প্রচলিত হিন্দুধর্ম কর্তৃক জনগণের উপরে চাপানো সামাজিক আচারানুষ্ঠানের কাছে আত্মসমর্পণের দ্বারা। তাই গত সোমবার উচ্চ বিমূর্ত ভাবগ্রহণের জন্য (যে-ভাব

মধ্যযুগীয় হিন্দুভাব ছাড়া কিছু নয়) বাবু রবীন্দ্রনাথের আবেদন সরাসরি বাবু চন্দ্রনাথের হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছিল—বিশেষত তা যখন বর্তমানের জন্য অথবা ভাবী দীর্ঘকালের জন্য রাজনৈতিক শৃঙ্খলকে বজায় রাখার পক্ষে প্রচার করেছে—এমন সন্দেহের সবিশেষ হেতু আছে। মধ্যবর্তী কাল নাকি রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার অধিকার অর্জনের অনুশীলন-পর্ব।"

দ্বিতীয় প্রবন্ধে (২৯ মে) রবীন্দ্রনাথ—"প্র্যাকটিক্যাল কাজের নামে জাতীয়তার আদর্শকে আক্রমণ করেছেন"—তার উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়। "নিছক আবেগ যদি দৃঢ় কর্মভিত্তিতে স্থাপিত না হয় তাহলে তা মারাত্মক—রবীন্দ্রনাথের এই কথা তত্ত্ব হিসাবে স্বীকার্য। কিন্তু যখন তিনি আমাদের আন্দোলনের কোনো অংশ সম্বন্ধে ঐ যুক্তিকে নিন্দাচ্ছলে ব্যবহার করেন তখন তিনি আন্দোলন সম্পর্কে, বিশেষত পূর্ববঙ্গের আন্দোলন সম্পর্কে, শোচনীয় অজ্ঞতা দেখান।" আন্দোলনের ব্যবহারিক সাফল্য সম্বন্ধে প্রবন্ধমধ্যে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছিল : কীভাবে পূর্ববঙ্গে মধ্যস্থতার দ্বারা মামলা-মোকর্দমার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, কীভাবে কর্মীরা সরকারী আদালত পরিহারে জনগণকে প্রণোদিত করেছে, ন্যাশন্যাল ভলান্টিয়াররা দুর্ভিক্ষত্রাণ, বন্যাত্রাণ ও উৎসবকালে বৃহৎ জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণের কোন্ কর্মে রত, ইত্যাদি। ভাব ও কর্মের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধেও আলোচনা ছিল :

> "বাবু রবীন্দ্রনাথ 'প্রাথমিক ও প্রস্তুতিমূলক' কার্যাবলীর কথা বাগ্মিতা-সহকারে পরিবেশন করেছেন।…কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন, এই প্রাথমিক ও প্রস্তুতিমূলক কার্যাবলী পূর্ববর্তী কারণ ও আন্দোলন থেকেই জন্ম নিতে পারে।… বিদেশীর পদানত থাকার দুঃখ যন্ত্রণা ও তজ্জনিত পতন বিষয়ে তীক্ষ্ণ সচেতনতা, এবং জাতীয় সরকার বা স্বরাজলাভ হলেই তবে ঐসকল দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করা সম্ভব হবে এই দৃঢ় বিশ্বাসই, প্রাথমিক ও প্রস্তুতিমূলক কার্যারম্ভের পূর্বশর্ত ; অথচ তারই বিরুদ্ধে বাবু রবীন্দ্রনাথ সাবলীল নিন্দা করে যাচ্ছেন—প্রথমে পাবনায় সভাপতির ভাষণে, তারপরে মিনার্ভা থিয়েটারে সর্বশেষ উক্তিসমূহে। এসকলই অতি দুঃখজনক চিন্তা-বিশৃঙ্খলার পরিচায়ক, যা আমরা বাবু রবীন্দ্রনাথের মতো শক্তিশালী চিন্তাবিৎ ও স্বচ্ছন্দ লেখকের কাছে কদাপি আশা করিনি। বাংলার সাম্প্রতিক মননজীবনের কোথাও একটা যন্ত্র আলগা হয়ে গিয়েছে যা ওহেন মহান আচার্যকে পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে ঐ প্রকার বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।"

তৃতীয় প্রবন্ধের (৩০ মে) সূচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভূত প্রশস্তি ছিল, যা আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। এই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা—'পথ ও পাথেয়' রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চরমপন্থীদের পক্ষে সহানুভূতিসূচক অনেক কথা বলেছিলেন। এমন যাঁর সাহস ও সহৃদয়তা, তিনি শেষ পর্যন্ত অহেতুক সমালোচনা কেন করলেন, সে সম্বন্ধে ব্যথাহত মনের রূপই এই প্রবন্ধে বড়ো আকারে প্রকাশিত। এতে রবীন্দ্রনাথকে কবি ও ঋষি বলে বন্দনা করা হয়েছিল ; সেই ভূমিকা ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ ভ্রান্তির কবলে পড়েছেন।

"কবি ও ঋষি, উভয়েরই সীমাবদ্ধতা আছে। তাঁদের কবিদৃষ্টি অথবা ঋষিত্বের বিশেষ শক্তিই চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কবি ও ঋষিরা যখন রাজনীতিজ্ঞ অথবা পদ্ধতি প্রণেতার ভূমিকা গ্রহণ করতে চান তখন তাঁরা তাঁদের বিশেষ কর্মপ্রকৃতিকে বিস্মৃত হন। বাবু রবীন্দ্রনাথ কবি ও ঋষিরূপে বাংলার মননজগৎ ও নৈতিক জগতে শ্রেষ্ঠ শক্তিধর জীবিত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, সমাজকর্মী বা রাজনীতি-দার্শনিক হিসাবে তিনি অতিরিক্ত দুর্বলতা ও বিভ্রান্তি দেখাবেন। গীতা বলেছেন, পরধর্ম সর্বদাই ভয়াবহ।" বলা হল, মিনার্ভা থিয়েটারে বক্তৃতাকালে রবীন্দ্রনাথ যতক্ষণ ঋষিভাবের মধ্যে ছিলেন ততক্ষণ মনে হচ্ছিল তিনি বুঝি তাঁর পুরনো আকার ফিরে পেয়েছেন। "কিন্তু যখনই দিব্য প্রেরণার হিমালয়-শিখর থেকে নেমে রাজনীতির সংকীর্ণ কর্দমাক্ত পথে ঘুরপাক খেতে লাগলেন তখনই দ্বিধায় জড়িত হয়ে ব্যর্থ হয়ে গেল কণ্ঠস্বর, এবং তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাটিতে ঘটল সঙ্গতি ও সংহতির অভাব।" সঙ্গতির অভাব এইজন্য যে, যে-রবীন্দ্রনাথ অকুতোভয়ে বিপ্লবীদের দুঃসাহসিকতার অনিবার্যতার কথা বলেছিলেন, এবং নিন্দা করেছিলেন গা-বাঁচানো কর্তাব্যক্তিদের কাপুরুষতা সম্বন্ধে, সেই তিনিই তাঁর রচনার দ্বিতীয় অংশে বিপরীত কথা সবিস্তারে বলতে শুরু করলেন!! বন্দেমাতরম্ তার এই সংখ্যায়, আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই নিশ্চয়, রবীন্দ্রনাথের সমর্থক উক্তিগুলি বিস্তৃতভাবে উৎকলন করেছিল। শেষে বলেছিল, আপত্তিকর অংশের সমালোচনা পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে থাকবে।

পরবর্তী একটি রচনাই আমরা পেয়েছি (১ জুন)। এর মূল কথা—রবীন্দ্রনাথও আন্দোলনের লক্ষ্য ও উপায় নির্ধারণে অংশ নিয়েছিলেন, কিন্তু তার থেকে তিনি এখন পশ্চাদ্‌অপসরণ করছেন।

"আমরা বিশেষ প্রকারের জ্ঞানালোক বা উচ্চতর প্রজ্ঞার অধিকারী নই [বন্দেমাতরম্ লিখেছিল] কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের প্রথম বক্তব্য [লক্ষ্য বা উপায় অনির্ধারিত আছে] পুরো সত্য নয়, অন্তত বর্তমান সংবাদপত্রটি যে-রাজনৈতিক মতাদর্শবাহী, তার বিষয়ে ও-কথা বলা যাবে না। বর্তমান আন্দোলনের একেবারে সূচনাপর্বে আমাদের কেউ-কেউ আদর্শ ও উপায় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন।" জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই পত্রিকা একটি বিভ্রান্তির বিষয় পরিষ্কার করে নিতে চেয়েছিল, যা বিজ্ঞজনদের মধ্যেও থাকে: "নব আন্দোলনের ক্ষেত্রে, বিশেষত বাংলার ক্ষেত্রে, বঙ্গভঙ্গের ভূমিকা আছে সত্য, এমন-কি তার প্ররোচনাও স্বীকার্য—কিন্তু আমরা কদাপি এমন ভাবিনি বা বলিনি যে, এই বিশেষ [কার্জনী-] ব্যবস্থার পরিবর্তনই আমাদের সকল কার্যের শেষ লক্ষ্য। বস্তুতপক্ষে এই প্রদেশের জনমত মৌল সমস্যার এইপ্রকার বিশেষ ঘটনাগত এবং আংশিক রূপ মানতে অস্বীকার করেছে। টাউন-হলের ৭ আগস্ট ১৯০৫ তারিখের সভায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কলকাতায় নেতৃগণ বৃটিশ-দ্রব্য বর্জনের যে-সিদ্ধান্ত করেছিলেন, তা অচিরে সারা দেশের

জনগণের মধ্যে সকলপ্রকার বিলাতী-দ্রব্য বয়কটের সিদ্ধান্তরূপে ছড়িয়ে পড়েছিল ; উদ্দেশ্য—নিজ শক্তি ও সম্পদ সংগঠিত করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন —বঙ্গভঙ্গ থাক বা যাক।"

রবীন্দ্রনাথকে এই রচনায় 'স্বাধীনতা' কথাটা বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। "বয়কট সমস্ত সময়ের জন্যই—এই ধ্বনি অবিলম্বে জনগণের সর্বজনীন ধ্বনি হয়ে উঠেছিল। ফলে আত্মবোধ ও আত্মনির্ভরতার ভাব জেগে ওঠে। একেবারে সূচনা থেকে এমন একটি চেতনার উদ্‌বোধন হয় যা গোড়ার দিকে কিছুটা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট থাকলেও দ্রুত স্পষ্ট আকার লাভ করে। একদিকে জনগণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অন্যদিকে সরকারের অত্যাচার—উভয়ের মধ্যে সংঘাত ক্রমেই তীক্ষ্ণতর তীব্রতর রূপ ধরেছিল। সুতরাং জনগন নিজেদের লক্ষ্য ও তা লাভের উপায় সম্বন্ধে অনবহিত ছিল, একথা সত্য নয়। বাবু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ১৯০৫-এর শরৎকাল এবং শীত-সূচনাকালে তাঁর ভাষণাদির মধ্যে এই নতুন জাতীয়-আদর্শের রূপ এবং তা অর্জনের উপায় সম্বন্ধে নির্দেশাদি দিয়েছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত ও ভাষণাদির দ্বারা যে-ভাবপ্রবাহ ঘটিয়েছিলেন, তার বিশেষ উল্লেখের পরে [যে-ধরনের উল্লেখের উদ্ধৃতি আগেই দিয়েছি] পত্রিকাটি লিখল :

> "তিনি [রবীন্দ্রনাথ] যেকালে আদর্শচেতনার গতিবৃদ্ধি করছিলেন, সেইকালেই ঐ আদর্শ কোন্ প্রণালীতে অনুসৃত হবে, তার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সে আদর্শ নানা কথায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত না হলেও তা স্বরাজেরই আদর্শ—যার আলোচনাকে তিনি এখন খোলাখুলিভাবে নিরুৎসাহিত করতে চাইছেন। যে-পদ্ধতির নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন, বিশেষত টাউন-হলে প্রদত্ত 'নব ভারত পর্যায়ের বক্তৃতা'য়—'অবস্থা ও ব্যবস্থা' বিষয়ে—তা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং আত্মগঠনেরই আদর্শ। নিউ পার্টি তো গত দুই বৎসর ধরে তারই প্রচার করে যাচ্ছে। যতদূর স্মরণ হয়, বাবু রবীন্দ্রনাথ পোলাণ্ডের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন—বাংলার জনগণকে তাঁর অনুসরণে বেসরকারী সংগঠন তৈরি করে, তার সাহায্যে বিদেশী সরকারকে কেবল রাজস্ব আদায়, বড় অপরাধের শাস্তিবিধান, এবং সীমান্তরক্ষার কাজে মাত্র সীমাবদ্ধ রাখতে বলেছিলেন। জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকদল, সালিশী-আদালত, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, দুর্ভিক্ষ-ত্রাণসমিতি ইত্যাদি প্রকারের নানা সংগঠন অর্থাৎ জনগণের শিল্পবাণিজ্য, শিক্ষা এবং পৌর-জীবনগত সংগঠন, যা বর্তমান বিদেশী সরকার-নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাবে কিন্তু বর্তমানের আইন লঙ্ঘন করবে না—এইসকল উপায়ে শেষপর্যন্ত স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতালাভের কথা বাবু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরাও বলেছিলাম। সুতরাং একথা সত্য নয় যে, লক্ষ্য বা উপায় সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না। ধারণার অভাব নয়, অন্য কারণ আছে বর্তমান সংকটের মূলে। সেগুলি কী, তা বাবু রবীন্দ্রনাথের বর্তমান রচনার সূত্রে আমরা পরে আলোচনা করব।"

দুঃখের বিষয়, সেই পরবর্তী লেখাটি আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি।

৯

অরবিন্দ ঘোষ কি রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের সন্দীপ? প্রশ্নটি প্রায় বোমার মতো বিস্ফোরিত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে চমকিত ও বিচলিত করেছিল। বিব্রত রবীন্দ্রনাথকে পত্রিকায় পত্র লিখে প্রতিবাদ করতে হয়। বিপাকে ফেলার মতো এই ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ যদুনাথ সরকার।

যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮), রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা-সহ স্বদেশী আন্দোলনের বহুতর নেতাদের সম্মানিত বন্ধু। স্বদেশী আন্দোলনকালে (১৯০৫-১১) তাঁর বয়স ৩৫-৪১। ঐতিহাসিকের তথ্যবোধ এবং যুক্তিবোধের সঙ্গে তিনি স্বদেশী আন্দোলনকে নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বন্দেমাতরম্ পত্রিকা তিনি নিয়মিত পড়েছেন, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীও পড়েন নি তা নয়। তাঁর লেখা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি রাজনীতিতে অরবিন্দনীতির সমর্থক ছিলেন না। রবীন্দ্রনীতি সম্বন্ধেই তাঁর সমাদর। সেই সমাদর তিনি প্রকাশ করলেন মডার্ন রিভিউ পত্রিকার নভেম্বর ১৯১৯ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ 'দি হোম অ্যাণ্ড দি ওয়ার্ল্ড'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে।

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার যেহেতু অরবিন্দ ও অরবিন্দপন্থীদের মতবাদ ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, এবং রবীন্দ্রনাথের মতও তাঁর জানা ছিল, তাই যখন সন্দীপের মুখে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক কথার প্রতিধ্বনি শুনলেন, তখন সিদ্ধান্ত করে বসলেন, রবীন্দ্রনাথ, স্বদেশীদল ত্যাগের পরে অরবিন্দ-মতের বিষয়ে তাঁর অসন্তোষ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

তাঁর লেখার প্রথমাংশ এই :

"বাংলার বিরাট স্বদেশী আন্দোলনকালের ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে রচিত এই উপন্যাসটিতে রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ ঘোষের বক্তব্যের উত্তর দিয়েছেন।...

"আমাদের দেশে মল্লযোদ্ধারা পরস্পরকে পাকড়াবার আগে পরস্পর সেলাম ঠোকে। আমাদের কবিরাও তাই করেন। বর্তমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনাকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেরা স্টাইলে অরবিন্দের উপরে দীর্ঘ কাব্য-নমস্কার জানিয়েছিলেন : 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।' ভারতীয় জাতীয়তার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ দ্রষ্টাপুরুষ [অরবিন্দও] রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনুরূপ মধুর ভাবনায় ছিলেন। তারপর তাঁরা যুদ্ধে অবতীর্ণ।"

যদুনাথ সরকার ঐতিহাসিক, সুতরাং রেখে-ঢেকে বলা অভ্যাস নেই। খোলা গলাতেই রবীন্দ্র-অরবিন্দের ভিন্ন কোটির মতের কথা বলে গেলেন :

"রবীন্দ্রনাথ ঘৃণা, হিংসা এবং রাজনৈতিক কূটকচালির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ধিক্কার দিয়েছেন—যেসব জিনিস আমাদের কোনো-কোনো জাতীয়তাবাদী নেতা শিক্ষা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের যুক্তি—নৈতিকতা দূষিত হলে দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিনাশ ঘটবে। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোনো দুর্নীতি বা মিথ্যাচার শেষপর্যন্ত জয়ী হতে পারে না। অরবিন্দ (কিংবা ঠিকভাবে বলতে গেলে তাঁর অন্তরঙ্গরা) বন্দেমাতরম্-এ তার এই উত্তর দিয়েছিলেন : ঐ ধরনের নীতিকথা অবাস্তব ; উন্মাদনার ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করতে পারলেই তবে বড়ো আকারে জাতীয় জাগরণ ঘটবে ; ভারতীয় মনের দারুণ মন্থনের পরেই নব-স্বর্গ রচিত হতে পারবে ; মন্থনের কালে অমৃতের সঙ্গে গরলও উঠবে ; বর্তমান [শাসন-] ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গোটা ভারতীয় জাতিকে প্রচণ্ড বিদ্রোহে জাগাতে হবেই ; এবং শেষপর্যন্ত যে-ভাবেই হোক, বিপ্লবের শেষে শুভ জয়ী হবে অশুভের উপর। মিঃ বিপিনচন্দ্র পালও রুশোর মারাত্মক নীতি প্রচার করেছিলেন : সংখ্যালঘুদেরও (এখানে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের) অবশ্যই স্বাধীন করতে হবে ; ঐ প্রকার যে-সকল লোক স্বীয় স্বার্থ বিষয়ে অজ্ঞ থাকার জন্য স্বদেশী ব্রতকে গ্রহণ করতে পারছে না, তাদের স্বদেশীদলে ঢোকাতে হবে জোর করে। এবং, স্বপ্নময় কবি রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জীবনের বহু উর্ধ্বে আশমানে অবস্থান করে 'প্রেম ও মধুরতার বাণী ছড়াচ্ছেন' (যে-কথা অরবিন্দ বলেছেন), তিনি কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে শিশু। ভারতে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই তুলতুলে দস্তানাপরা হাতে করা সম্ভব নয়।"

অরবিন্দ ও অরবিন্দপন্থীদের যেসব রচনার সঙ্গে ইতিমধ্যে আমাদের পরিচয় হয়েছে তাতে বোঝা যায়, যদুনাথ সরকার সেইসব বক্তব্যের একাংশের উপযুক্ত সারসংক্ষেপ করেছেন। কিন্তু একথাও মানতে হবে, চরমপন্থীদের বক্তব্যের মননগভীরতা এই সাদা-মাঠা সারসংক্ষেপে মার খেয়ে গেছে।

যদুনাথের রচনা অগ্রসর হয়েছে :

"রবীন্দ্রনাথ অবিলম্বে উত্তর দেননি। [কথাটা মোটেই ঠিক নয়, যথেষ্টই উত্তর দিয়েছিলেন, আমরা আগেই দেখেছি]। তাঁর নীতিবোধ ধাক্কা খেয়েছিল বলে তিনি স্বদেশীদল ত্যাগে প্রণোদিত হয়েছিলেন। আহত চিত্তের নিরাময়ের জন্য শান্তিনিকেতনের শান্ত গ্রামজীবনে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি 'ধ্যানে বিচরণকালে নির্মাণ করেছিলেন সেই অস্ত্র যা ক্ষুরধার ও ভয়াবহ।' সে অস্ত্র কোনো বিতণ্ডা-পত্র কিংবা মঞ্চ-বক্তৃতা নয়—একটি উপন্যাস—'ঘরে বাইরে'—যার নীতিকথা কী, পাঠক পড়লেই বুঝবেন।"

যদুনাথ উপন্যাসটির কাহিনী ও চরিত্রকে দুই দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন—এক, রাজনৈতিক , দুই, ব্যক্তিক ও পারিবারিক। রাজনৈতিক প্রকৃতির বিশ্লেষণ এই :

"বাংলার এক নিভৃত অংশকে দৃশ্যপট রূপে নির্বাচন করা হয়েছে। সেখানে জনসম্

বাগ্মী সন্দীপ খোলাখুলি প্রচার করেছে—মানুষের সকল মন্দ প্রবৃত্তিকে জাগাতে হবে যদি বাঁচাতে হয় দেশকে; নীতিসুধা কিংবা এদেশীয় মানুষের ধীর শিষ্ট আচরণ ঐ উচ্চাদর্শকে সফল করতে পারবে না; দেশবাসীর মধ্যে যথার্থ জাতীয় ঐক্য এবং স্বাধীনতাপ্রীতি উদ্রিক্ত করার জন্য গোড়ায় নৈতিক ও বৌদ্ধিক উজ্জীবনচেষ্টা কর—নিতান্ত মন্থরগামী পদ্ধতি; বিদেশী আমলাতন্ত্র তাকে বাধা দিয়ে বিধ্বস্ত করে দেবে; উপায় কেবল নিজের গৃহদাহ, যার ফলে রহস্যময় মঙ্গলশক্তি কোনো-না-কোনোভাবে নূতনতর সুন্দরতর গৃহভবন উপহার দেবে। সন্দীপ মাতৃভূমির মহান সেবায় খোলাখুলি বলপ্রয়োগ ও চাতুরীর সমর্থন করেছে। লক্ষ লক্ষ পশ্চাদ্‌পদ মুসলমান ও অনুন্নত নমশূদ্রদের সম্বন্ধে সে চোখ বন্ধ করে রেখেছে। তাদের পরিবর্তিত ও উন্নত করার এবং তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের দ্বারা স্বমতে আনার ধীর কিন্তু নিশ্চিত পথ গ্রহণ না করে, তাদের প্রতারিত সন্ত্রস্ত ও উৎপীড়িত করে, দ্রুত উদ্দেশ্যসিদ্ধির আশা সে করেছিল, যেন পূর্বোক্ত কাজগুলি খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। গোটা উপন্যাসটি প্রমাণ করেছে, ওসব মোটেই তুচ্ছ ব্যাপার নয়। চারিত্রশক্তি, হৃদয়ের ঐক্য এবং বিসম্বাদহীনতার উপর ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপিত না হলে তা বালির উপর প্রাসাদ তৈরি হয়ে দাঁড়াবে। তাই তারপর যখন ঝড় উঠল, বৃষ্টি নামল, তখন অবিলম্বে পতন হল জাতীয়তা-বাদের 'নব-জেরুজালেমের' (বরিশালের)। সে পতন ট্র্যাজিক। সেই ট্র্যাজেডিতে উপন্যাসের উপসংহার।"

যদুনাথ সরকার কেবল ইতিহাসের নয়, সাহিত্যেরও ছাত্র, সুতরাং 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের "স্থায়ী আকর্ষণ" যে, গভীর জীবনসমস্যার উন্মোচন, তাও বলেছেন। যাঁরা "বাংলার সাম্প্রতিক ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ তাঁরা এর রাজনৈতিক তাৎপর্য না বুঝেও একে কিছু কম উপভোগ করবেন না।" এর মধ্যে জেন অস্টেন-তুল্য "মৃদু তুলিকার স্পর্শে চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ" যদুনাথ লক্ষ্য করেছেন। এই উপন্যাসে জীবনসমস্যা কী, তা তিনি বিশ্লেষণের চেষ্টা যখন করেছেন, তখন তাঁকে কিন্তু যথেষ্টই রক্ষণশীল দেখা গেছে। 'ঘরে'-র রক্ষণাবেক্ষণে নিরাপদ হিন্দুনারী 'বাইরে'-র মুক্তজগতে এসে পড়লে কী শোচনীয় অবস্থা দাঁড়ায়—সেই সমস্যাই যদুনাথের মতে রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শনের বিষয়। যদুনাথ হিন্দুনারীকে ঘর থেকে বাইরে টেনে বার করার সমর্থন মোটেই করেননি। উপন্যাসের নায়িকা তার অপরিণত মন নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াবার পরে যে-ট্র্যাজিক পরিণতি লাভ করেছিল, "তার প্রত্যেকটি পর্যায়কে ডঃ ঠাকুরের অস্ত্রোপচারের নির্মম ছুরি কেটে-কেটে দেখিয়েছে।" 'বাইরে' উপস্থিত দিশাহারা বিমলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি ছিল, যদুনাথ এমন মনে করেননি। তাই তিনি বিরক্তি ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন কোনো-কোনো দেশীয় সাহিত্যিকের বিরোধী সমালোচনা সম্পর্কে, যাঁরা মনে করেছেন, রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে "মুক্ত প্রেম ও বিবাহিত জীবনের ধ্বংসের ছবি" আঁকতে চেয়েছেন।

এসব সত্ত্বেও, "রবীন্দ্রনাথ খুবই কুশলী শিল্পী, উপদেশামৃতের উপরে 'উপন্যাস' শব্দটি

সেঁটে দেবার পাত্র নন," বলার পরেও—যদুনাথ সুচারুভাবে উপন্যাসের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনসমস্যার সঙ্গে রাজনৈতিক সমস্যাকে আলোচনার শেষাংশে জুড়ে দিয়েছেন :

"এই উপন্যাসে কি রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গের হাসি পাই না? স্বদেশীদলত্যাগী তিনি —এখানে কি উক্ত দলভুক্তদের উদ্দেশ্যে বলতে চাননি : তোমরা অজ্ঞ অনিচ্ছুক সংখ্যালঘুদের উপর স্বদেশী চাপিয়ে দেবার জন্য বলপ্রয়োগ ও প্রতারণার সমর্থন করেছ। এখন যদি দেখ, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সেই একই উপায় অন্তঃপুরবাসিনী এক অজ্ঞ নারীকে করায়ত্ত করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, তাহলে সে কাজ কেমন লাগবে? ব্যক্তিগত জীবনের নীতিকে কি রাজনীতি-ক্ষেত্রে নিরাপদে বর্জন করা সম্ভব?"

১০

রবীন্দ্রনাথ আঁতকে উঠলেন। যদুনাথ সরকারের মতো ঐতিহাসিক তাঁকে খুবই বিপজ্জনক অবস্থায় ঠেলে দিয়েছেন—অরবিন্দ হলেন সন্দীপ!! আগেই বলেছি, যদুনাথের লেখা থেকে স্পষ্টই দেখা যায়, অরবিন্দ-মতের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল না, তিনি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিরই সমর্থক। কিন্তু তিনি যেভাবে দেখিয়েছেন তার দ্বারা চরিত্রের দিক থেকে না হলেও মতবাদের দিক থেকে অরবিন্দ ও সন্দীপের মধ্যে কিছুটা ঐক্য ছিলই। এখানে ঐতিহাসিক যদুনাথের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে বলা চলে—ইতিহাসের প্রেক্ষিতে রচিত এই উপন্যাসের আলোচনায় তিনি তাঁর নিজের ইতিহাসবোধে সামঞ্জস্য রাখতে পারেন নি। বিশেষ কালের ইতিহাসের উপর স্থাপিত উপন্যাসের মধ্যে ইতিহাস-রসাশ্রিত চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রাখার প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তা রাখেননি—তাঁর বিরুদ্ধে স্থায়ী এই সমালোচনা। এই উপন্যাস পরবর্তীকালের পাঠক যখন পড়বেন তখন তাঁর ধারণা হবে, সন্দীপই চরম-পন্থীদলের প্রতিনিধি চরিত্র। সন্দীপ নারীলোভী (বন্ধুপত্নীকে ফুসলানো তার প্রধান দেশহিতব্রত দাঁড়িয়েছিল), অর্থলোভী, স্বার্থপর, অকারণে হিংস্র। অথচ বাস্তব ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক চরমপন্থাই ত্যাগে তপস্যায় ইতিহাসের বরেণ্য চরিত্র। আশ্চর্যের বিষয়, যদুনাথ সরকার উপন্যাসটির এই ঐতিহাসিক ভারসাম্যচ্যুতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। উল্টোপক্ষে অরবিন্দ ও সন্দীপের মতের আংশিক ঐক্যের জন্য পরিষ্কার বলে বসেছেন—অরবিন্দ বা অরবিন্দপন্থীদের মতের উত্তর দিতেই রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রধান অসুবিধা দাঁড়াল, সন্দীপের মতো নীচু চরিত্রের মানুষের সঙ্গে অরবিন্দের মতো সুমহান চরিত্রের মানুষ বন্ধনীবদ্ধ হয়ে গেলেন। অথচ তা মনে হতেই পারে, কারণ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে অরবিন্দের অসাধারণ চরিত্রের ছায়াবাহী কোনো বিপ্লবী ছিলেন না। তাই রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদের জনৈক পত্রলেখকের উত্তরে ঝটিতি এক পত্র প্রকাশ করলেন মডার্ন রিভিউ-এ (জানুয়ারি

১৯২০), যার মধ্যে প্রথমত তিনি অরবিন্দের চরিত্র ও প্রতিভার মুক্ত প্রশস্তি করলেন, দ্বিতীয়ত জানালেন, তিনি অরবিন্দের রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নন (!')। শান্তিনিকেতন থেকে লেখা ৩০ নভেম্বর ১৯১৯ তারিখের পত্রটি অনুবাদে এই :

"প্রিয় মহাশয়, যদুবাবু আমার বইয়ের উপর যে আলোচনা করেছেন, তা আমি এখনো পড়িনি। কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা, তিনি অবশ্যই বলতে চাননি যে, অরবিন্দ ঘোষ আমার কাহিনীর সন্দীপের সমস্তরের মানুষ। আমাদের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সাহিত্যের সঙ্গে আমার খাপছাড়া উপর-উপর পরিচয়। আমি এখন পর্যন্ত অরবিন্দ ঘোষের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কী, তা নির্দিষ্টভাবে জানি না। কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে জানি যে, তিনি মহান ব্যক্তি, আমাদের মধ্যে মহত্তমদের একজন ; তাই তাঁর বন্ধুদেরও তাঁকে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা আছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর সম্বন্ধে যা অনুভব করি তা কেবল তাঁর আধ্যাত্মিক গভীরতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সমাদরেই আবদ্ধ নেই—তাঁর প্রসারিত দূরদৃষ্টি, সেই-সঙ্গে অসামান্য কল্পনার অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রকাশসামর্থ্যে সমৃদ্ধ সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধেও বলবৎ। তিনি যথার্থই এক দেহে ঋষি এবং কবি। আমি এখনো তাঁকে 'নমস্কার' জানাই, যা জানিয়েছিলাম প্রথম যখন তিনি ঝঞ্ঝাটে পড়েছিলেন—শেষপর্যন্ত যা তাঁকে বাংলা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করেছে।"

১১

বর্তমান প্রবন্ধ রচনার পিছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল, রবীন্দ্র ও অরবিন্দ, উভয় পক্ষের মত জানানো। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধীয় মতামত বুদ্ধিজীবী মহলে যতখানি আলোচিত, অরবিন্দ-মতের আলোচনা সেই পরিমাণে হয় না। সাম্প্রতিক ভারতের সমস্যাজটিল পরিস্থিতিতে রবীন্দ্র-মতের ঔচিত্য লক্ষণীয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগে ভারতবর্ষ যখন পরাধীন ছিল তখন সেই অপমান ও নিষ্পেষণের পাষাণভারের বিরুদ্ধে যে-কোনো উপায়ে বিদ্রোহ ছিল মনুষ্যরক্তের দাবি—আর তার পক্ষে যাঁরা কলম ধরেছিলেন, বিশেষত স্বদেশী আন্দোলনপর্বে, তাঁরা কেবল দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের অধিকারী নন, অসাধারণ মনীষার অধিকারীও ছিলেন, যথা অরবিন্দ, নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র পাল। রবীন্দ্র-অরবিন্দ বিতর্কের বিষয়েও যে-আলোচনা করেছি, তাতে কিন্তু চরমপন্থী জাতীয়তার গভীর চিন্তা ও চেতনাবাহী সমাজবিজ্ঞানসম্মত রচনাদির বিশেষ পরিচয় নেই, সে ত্রুটি স্বীকার করছি। আমার এই লেখা থেকে এমন মনে করার সম্ভাবনাও আছে, স্বদেশী আন্দোলন বুঝি কেবল দেশী জিনিস তৈরি এবং বিদেশী জিনিস বয়কটেই আবদ্ধ ছিল। না, তা নয়। সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল এই আন্দোলনসূত্রে। সেসব প্রসঙ্গ এখানে আনা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যেটুকু বিতর্কের রূপ উপস্থিত করতে পেরেছি তার থেকেই বোঝা যাবে—আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত সকল দলের মানুষই কত

গভীরভাবে জাতীয় সমস্যাকে গ্রহণ করেছিলেন, এবং কোন্ সাহস ও সত্যনিষ্ঠায় তাঁরা নিজেদের মত ব্যক্ত করতেন। দেখা যাবে, সকল মতাদর্শেরি মধ্যেই অবশ্যগ্রাহ্য সত্য আছে। এখানে অধিকন্তু বিশেষ কালের দাবির সঙ্গে নিত্য আদর্শের টানাপোড়েন যেন লক্ষ্য করি। বিশেষ কাল যেমন তার জর্জর জীবনের যন্ত্রণাকে অগ্রাহ্য চিরকালীন আদর্শের উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে পরমগতি লাভে প্রস্তুত নয়, তেমনি চিরকালীন আদর্শও বিশেষ কালের রুদ্ধশ্বাস বন্দীত্ব স্বীকারে গররাজি। এই দ্বন্দ্ব সভ্যতার মতোই প্রাচীন। উভয়ের সামঞ্জস্য চাই, অথচ তা ঘটে না। সভ্যতার ট্রাজিডি এইখানেই।

রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সংগঠনবাদীদের বিতর্ক এদেশে দীর্ঘদিন চলেছে। আন্দোলনকারীরা বলবেন, আমরা বয়কট, অসহযোগ, আইন-অমান্য এবং সশস্ত্র পন্থায় দেশের বৃহৎ অংশের স্বাধীনতা তো অর্জন করেছি। সংগঠনীরা বলবেন, সে স্বাধীনতার তো এই চেহারা—চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা, ভেদবৈষম্যের বিস্তার, কর্মে আলস্য, আদর্শের অবলুপ্তি। আন্দোলনকারীরা বলবেন, ঐসব আপদ দূর করার পথে বড় বাধা আমরা সরিয়েছি—এখন তোমাদের অভিপ্রেত কাজটা তোমরা করে ফেল না কেন! সংগঠনীদের বক্তব্য, করতে তো চাই, কিন্তু দেশকে যে-অবস্থায় নিয়ে গেছ তাতে কাজটা অসম্ভব দাঁড়িয়েছে। তার উত্তর : পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কব্জা থেকে মুক্তি পেয়েও যদি কাজটা অসম্ভব দাঁড়ায় তাহলে তা বুঝি সম্ভব ছিল ওদের সাঁড়াশির দাঁতের মধ্যে থাকার সময়ে?

তর্ক চলবে—যেমন চলেছিল স্বদেশী আন্দোলনকালে রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের মধ্যে। মীমাংসা হয়নি, কারণ হওয়া সম্ভব নয়।

পাদটীকা

১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রবাসীতে (আশ্বিন ১৩১৪) লেখেন

"স্বদেশীর আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে ত্রুটি করে নাই। বেশ মনে আছে, ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব হইতে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার এক-একটা নূতন গান বা কবিতা বাহির হইত, আর আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কাঁপিয়া আর নাচিয়া উঠিত।...সে সময়টার যে-উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না। উত্তেজনার বশে আমরা দুই বৎসর ধরিয়া ইংরেজের অনুগ্রহ লইব না, ইংরেজের শাসনযন্ত্র অচল করিয়া দিব বলিয়া লাফালাফি করিয়া আসিতেছি; এবং ইংরেজরা যখন সেই লাফালাফিতে ধৈর্যভ্রষ্ট হইয়া লগুড় তুলিয়া আমাদের গলা চাপিয়া ধরিয়াছেন, তখন আমাদের সেই অস্বাভাবিক আন্দোলনের নিষ্ফলতা দর্শনে ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—ও পথে চলিলে হইবে না—মাতামাতি লাফালাফির কর্ম নহে, নীরবে ধীরভাবে কাজ করিতে হইবে।" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে, ১৩৫৫ সংস্করণ, উদ্ধৃত। পৃ. ১৫৯-৬০)

২। প্রভাতকুমার, রবীন্দ্র-জীবনী, ২য়, পৃ. ১৬১।

৩। ঐ. পৃ. ১৬৫।

REVIEWS AND NOTICES OF BOOKS

English

The Home and The World by *Rabindranath Tagore. Translated into English* (*Macmillan*) 294+101. One dollar 75 cents.

This novel of modern Indian life in the days of the great Swadeshi movement in Bengal is Rabindranath's reply to Arabindo Ghosh. And thereby hangs a tale.

Our wrestlers salam each other before they come to grips, and so do our poets. At the dawn of the present Nationalist agitation Tagore published a long poetical salutation to Arabindo in his best style : *Arabinda Rabindrer Laha Namaskar.* The inspired seer of Indian Nationalism was equally sweet on Rabindranath. And then they began to spar.

Tagore publicly denounced the cult of hatred, violence and political jugglery taught by some of our Nationalist leaders. This moral canker would, he argued, kill all our country's hopes ; in God's world nothing immoral, nothing false, can triumph in the end. Arabindo (or more correctly his pal') replied in the Vande Mataram saying that such moral preaching was unpractical, that a great National regeneration can be effected only by rousing a whirlwind of passions, that in the great churning of the Indian mind which must precede the construction of our new heaven, poison and nectar alike must be expected to rise to the surface, that we must awaken the entire man in India in passionate insurrection against the existing order and then somehow in the end the good will triumph over the evil of the Revolution. Mr. Bipin Chandra Pal also preached Rousseau's dangerous doctrine that the minority (here the East Bengal Muhammadans) must be *compelled* to be free, that those people who through ignorance or self-interest cannot accept the Swadeshi cult, must be coerced to join the Nationalist ranks ; in short, that Rabindranath, a dreamy poet living in an etherial atmosphere far away from our real world, was a "preacher af love and sweetness" (as Arabindo

styled him) but a child in politics ; and our war with the Anglo-Indian bureaucracy cannot be conducted in kid gloves.

Rabindranath did not reply immediately. The moral shock that he had received forced him to leave the Swadeshi camp and seek to heal his stricken heart in the rural quiet of Shanti Niketan. But he.

"In meditation dwelt,
And shaped his weapon with an edge severe."

That reply is no polemical tract or platform oration, but a novel—*the Home and the World* (*Ghare Baire*), the moral of which he who runs may read.

Here in the corner of Bengal selected as the scene, the fiery orato (Sandip 'blazing') openly preaches that all the baser passions of man must be roused if we are to save our country, that copybook morality, a sober decorous conduct on the part of our people, will not serve this high purpose, that the moral and intellectual elevation of our countrymen for ensuring true national union and love of independence is too slow a process and will be thwarted by the alien bureaucracy and that we have only to set fire to our house and the mysterious force of Goodness will somehow or other present us with a newer and better home as the result ! He openly justifies force and fraud in the great cause of the Mother-land. He would shut his eyes to the enormous drag of so many millions of ignorant Muhammadans and depressed Namasudras, and instead of following the slow but sure process of converting them, elevating them, making friend with them—he hoped to achieve a speedy success by hood-winking them, coercing them, riding roughshod over them, as negligible factors. The whole novel proves that these are not negligible factors and that a nationalist India when not based upon strength of character, hearty union and true obliteration of differences, is a house built on sand. The storm came, the rain descended, and the Nationalist "New Jerusalem" fell (in Barisal) and tragic was the fall of it. With this tragedy the novel ends.

But Rabindranath is too clever an artist to write a sermon and label it as a novel. The Home and the World is much more than a political parable. Indeed, readers ignorant of recent Bengal history will relish it none the less for altogether missing its political significance, for the abiding interest of the book lies in its unfolding a grave human problem with Jane Austen's delicacy of touch and subtle analysis of character. The problem is, how does the cloister virtue of the Hindu *home* fare in the wide *world* outside ? Hitherto Hindu wives have led a sheltered life within the family circle : we have set up walls round them, not so much out of suspicion as from a desire to protect them. We have been giving our daughters in marriage before they could know what temptation is. And they have been models of virtue. But how would such virtue stand the strain of the world outside the harem walls where men and women move freely ? Would not freedom under proper chaperoning in the early years have braced their characters and made them able to guard themselves like the free womanhood of the West or even of Maharashtra ? The Irish girls carefully herded by Catholic priests in all their acts are models of virtue at *home* ; but the same Irish girl breaks down hopelessly when thrown on her own guardianship as an emigrant in New York, because she has never been taught to take care of herself.

"Queen Bee" the heroine of our novel, at *home* is all that a wife should be. But as soon as she enters the *world* her unformed character is imperceptibly driven by the irresistible force of environment and incident into a stage of development which ruins her home and appals her own self. Dr. Tagore's pitiless scalpel has dissected her heart at every step of this tragic change, and herein lies his literary craftsmanship. Oddly euough, some vernacular writers have denounced this novel as a plea for free love and wrecking ot wedded life.

Apart from its personal and deeper significances as described by me above, can we not detect in the novel, an ironicnl laughter of Tagore ? Is not he here telling his opponents in the Swadeshi

camp that he has renonnced, "you justify force and fraud it, imposing Swadeshi on the unwilling, ignorant minority, employed for a personal purpose to win an ignorant woman living within the circle of the home? Can the rules of private morality be safely abjured in politics?"

JADUNATH SARKAR

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতিচর্চা

১

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতি-সান্নিধ্য বিস্তৃত আলোচনার বিষয়। ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের উপর বৈষ্ণব প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের এক বিশেষজ্ঞ সমালোচক একটি প্রাচীন কবিবচনকে স্মরণ করেছেন—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'সকল ভুবনোপজীবী' কবি। রবীন্দ্রনাথের উপজীব্য 'ভুবনের' মধ্যে বৈষ্ণব 'ভুবনও' ছিল, একথা স্বীকৃত হয়েছে সমালোচকদের দ্বারা। মতভেদ কেবল গ্রহণের পরিমাণ ব্যাপারে।

বৈষ্ণব কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথ কতখানি নিয়েছেন তার অল্প-বিস্তর বিবরণ সকলেই পাবেন বিভিন্ন রবীন্দ্র-সাহিত্যালোচনার গ্রন্থে। আমি একটি সুখবর জানাতে পারি—বিষয়টি একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থের বিষয়বস্তু হয়েছে। লেখক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতো মনস্বী ব্যক্তি। সামান্য অপেক্ষায় এই প্রসঙ্গের প্রায় সমস্ত কথাই জানতে পারব। (গ্রন্থটি ১৩৬৮ সালে 'রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান' নামে প্রকাশিত হয়েছে)।

বলা বাহুল্য সেই গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বে এমন একটি গুরু বিষয় সম্বন্ধে কোন দ্রুত উক্তি করতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে। সুতরাং সামান্যভাবে কিছু কথা বলব, সেই ভালো।

আলোচনার অনেকগুলি বিষয় আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি। যেমন ধরা যাক, বিদ্যাপতির রচনার ধ্বনিগুঞ্জন, যা সাক্ষাৎ বিদ্যাপতির ভাষা থেকে এবং বিদ্যাপতির ভাষার দ্বারা প্রভাবিত ব্রজবুলি ভাষার মধ্য দিয়ে, রবীন্দ্রনাথকে যৌবন-সূচনায় একেবারে মাতিয়ে তুলেছিল। যৌবনরাগ তিনি বেঁধেছিলেন ব্রজবুলি ভাষার তারে, রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহ হয়ে অভিনব বিদ্যাপতি হবার রোমান্সে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। 'এত বড়ো' একটা প্রসঙ্গ আমি বাদ দেব—বাদ দেব 'এত বড়ো' বলেই, কারণ ধ্বনিসিদ্ধ কবির শ্রবণ-সমন্বয়ের ক্ষেত্রে পদাবলীর ঋণ—গভীর ও সূক্ষ্ম গবেষণার বিষয়।

আর বাদ দেব, যেটি কোনোমতে বাদ দেবার বস্তু নয় সেটিকে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় কোন্ কোন্ স্থানে বিদ্যাপতির ভাষা, অলঙ্কার ও চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে। বিদ্যাপতি ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এইটেই মূল আলোচনার বিষয়—কিন্তু আমার এই উচ্চাশাহীন প্রবন্ধের বিষয়বস্তু তা হতে পারে না।

বিদ্যাপতির প্রতিভার বহুমুখিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার তুলনা করেছেন ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর সম্পাদিত বিদ্যাপতি পদাবলীর ভূমিকায়। বিদ্যাপতির প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনার একাংশের তুলনা আমি করেছি আমার 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' গ্রন্থে। বিদ্যাপতি ও রবীন্দ্রনাথের শিবের মধ্যে তুলনামূলক বিচারও সেখানে আছে। সে সকল প্রসঙ্গও এখানে আলোচ্য নয়।

কিন্তু ন্যূনতম প্রয়োজনের একটি বিষয়কে বাদ দেওয়া যায় না—বিদ্যাপতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের ব্যাপারটিকে। রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার

মুখোপাধ্যায় ঐ বিষয়ের তথ্য সঙ্কলন করেছেন। তথ্য নিবেদনে তাঁকেই মোটামুটি অবলম্বন করব।

প্রথমে আনা যাক রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি।" "জীবনস্মৃতি", রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, "জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।" রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের ইতিহাসই আমাদের লক্ষ্যের বিষয়। জীবনস্মৃতির কিছু অংশ—

> "শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ সে-সময়ে [১৮৭৪-৭৬] আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি-অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।"

অতঃপর আছে ভানুসিংহের পদাবলী রচনার বিবরণ। 'মৈথিলী মিশ্রিত দুর্বোধ ভাষা' বালক রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং অপরিচিত প্রাচীন কাব্য-ভাণ্ডারের 'দুর্গম অন্ধকার' থেকে রত্ন তুলবার বাসনার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকেও 'রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার' বাসনা তাঁকে কীভাবে পেয়ে বসেছিল, তার কাহিনী নিজেই বলেছেন কবি। অক্ষয় চৌধুরীর কাছে ইংরাজ বালক-কবি চ্যাটার্টনের কথা শুনেছিলেন তিনি, যে চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের কবিতা নিখুঁত রকমে নকল করতে পেরেছিলেন এবং ষোল বছর বয়সে আত্মহত্যা করে মরেছিলেন। ষোল বছরের রবীন্দ্রনাথ 'আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে' রেখে দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হবার জন্য কোমর বাঁধলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে এক বয়স্ক বন্ধুকে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের চেয়েও উৎকৃষ্ট পদাবলী প্রাপ্তির সম্ভাবনায় পুলকিত করে তুললেন। কেবল সেই বন্ধুটিই বিভ্রান্ত হননি, রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনুযায়ী জার্মানী-প্রবাসী নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এই প্রাচীন ভানুসিংহ নামক পদকর্তার উপর গবেষণা করে ডক্টরেট সংগ্রহ করেছিলেন। একে বলা চলে গবেষণার "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম।"

গোটা ব্যাপারটার রসভঙ্গ কিন্তু হয়েছে দুই ব্যক্তির দ্বারা। এক স্বয়ং ভানুসিংহ, দুই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত বন্ধু যখন ভানুসিংহের আবিষ্কারে "বিষম বিচলিত," তখন যশোলুব্ধ বালক কবি তাঁর "খাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া" দিলেন যে, "এ লেখা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের হাত দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না," কারণ—"এ আমার লেখা।" তখন "বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, 'নিতান্ত মন্দ হয় নাই।'"

আর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার জানিয়েছেন—

"নিশিকান্ত একুশ বৎসর বয়সে (১৮৭৩) বিলাত যান,...জমর্নিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে The Yatras নামে একখানি ছোট বই লিখিয়া ডক্টর উপাধি পান। সে গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি। তাহাতে ভানুসিংহের কোনো কথা নাই।...সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ভ্রমশূন্য নহে।"

অন্যায় সত্যাগ্রহ। এমন শোচনীয় পরিস্থিতিতে চ্যাটার্টনের আত্মহত্যা আর "অনাবশ্যক" থাকে কি? উক্ত বন্ধুর রুচির পৃষ্ঠপ্রদর্শন, 'জীবনস্মৃতি'কার রবীন্দ্রনাথের নিজ রচনা সম্বন্ধে অকরুণ সমালোচনা (ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তাহা আজকালকার সস্তা আর্টিনের বিলাতি টুংটাং মাত্র") এবং এবং প্রভাতকুমারের নিরাসক্ত তথ্যগত নিষ্ঠুরতা—এমন ক্ষেত্রে পোস্ট ডেটেড্ আত্মহত্যাই একমাত্র করণীয়।

কিন্তু আসল কথা থেকে আমরা সরে গিয়েছি। সেই যেদিন—

"মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে।' লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম।"

সেই খুশির আরো এক অপূর্ব রসালাপ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, যা লিখতে পারেন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এবং মুখে বলতে পারেন বোধ হয় অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের কথা, দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার আরম্ভপথ থেকে ফিরে এসে জ্যোতিদাদার গঙ্গাতীরের বাগানে বাস করতে গেছেন:

"আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি-একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো-বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়াম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে-গাহিতে বৃষ্টিপাত-মুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম, কখনো-বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম, পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত।"

রবীন্দ্রনাথের "আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রির" সঙ্গে বিদ্যাপতি জড়িয়েছিলেন।

২

বিদ্যাপতি যেখানে রবীন্দ্রনাথের জীবনানুভূতির সঙ্গে যুক্ত, যেখানে বিদ্যাপতির রচনা

তাঁর অস্তিত্বের অনুভূতিকে স্পন্দিত করেছে, আত্মার প্রশ্বাসে এনেছে সুগন্ধি, বিদ্যাপতির বেদনাধ্বনি ('বিদ্যাপতি কহ, কৈছে গমায়ব, হরি বিনু দিন রাতিয়া') তাঁর সত্তার মূলে দিয়েছে টান—সেই বিদ্যাপতিই রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। অনাদিকালের হৃদয়-উৎসের রক্তরসে সে বিদ্যাপতির পদ রচিত। আমরা এখানে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতিচর্চার আরো প্রত্যক্ষ তথ্যে মনোনিবেশ করছি। কুড়ি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১২৮৮) "বিদ্যাপতি পদাবলী" সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের অন্তর্গত ঐ "বিদ্যাপতি পদাবলী" সম্পাদনা করেছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। রবীন্দ্রনাথ আলোচনার শুরুতে আদর্শ সম্পাদনার নীতি নির্দেশ করলেন, এবং সেই মাপকাঠিতে বিচার করতে লাগলেন অক্ষয় সরকার-কৃত বিদ্যাপতি পদাবলীর ব্যাখ্যা, অর্থনিরূপণ ইত্যাদিকে।

রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্রের সম্পাদনায় খুশি হতে পারেননি। শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে আমি ভারতী পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা দেখতে পেয়েছি। সেখানে রবীন্দ্রনাথের বিরাগের যথেষ্ট পরিচয় আছে। যেমন—

> "পাঠকেরা কি সম্পাদকবর্গকে একেবারে অভ্রান্ত দেবতা বলিয়া জ্ঞান করেন, অথবা তাঁহাদের স্বদেশের প্রাচীন-আদি কবিদের প্রতি তাঁহাদের এতই অনুরাগের অভাব, এতই অনাদর যে, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার দেয় স্বরূপে যৎসামান্য শ্রমস্বীকার করিতেও পারেন না? বঙ্গভাষা যাঁহাদের নিকট নিজের অস্তিত্বের জন্য ঋণী, এমন-সকল পূজনীয় প্রাচীন কবিদিগের কবিতা সকলের প্রতি যে-সে যেরূপ ব্যবহারই করুক না কেন, আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া চাহিয়া থাকিব? তাহারা কি আমাদের আদরের সামগ্রী নহে?"

নিশ্চয় আদরের সামগ্রী, এবং রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে "যৎসামান্য শ্রম-স্বীকারের" অভাবরূপ অপমানের ক্ষেত্রে প্রতিবাদে মোটেই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের 'সচেষ্ট' সমালোচনায় একদিকে ছিল বিরক্তির দংশন, অন্যদিকে অনুরাগের সত্যান্বেষণ। বৈষ্ণব পদাবলীর এই সমালোচনা সম্বন্ধে প্রভাতকুমার যে দাবি করেছেন—"বৈষ্ণব পদাবলী ও পদকর্তাদের সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম সমালোচনা ইতিপূর্বে বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ"—প্রভাতকুমারের সে দাবি অগ্রাহ্য করা কঠিন। সেই সঙ্গে যোগ করা চলে, রবীন্দ্রনাথের ঐ সমালোচনা, সূক্ষ্ম, গভীর, কিন্তু—নিশ্চয় সর্বাংশে নির্ভুল নয়।

বিদ্যাপতির পদ্যাংশ এবং অক্ষয় সরকার-কৃত টীকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা ভালো, সেগুলি খুবই আকর্ষক।

> "নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
> হাসত আপন পয়োধর হেরি॥
> পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ।
> দিনে দিনে অনঙ্গ উথারঙ্গে অঙ্গ॥ (পৃ. ২)

সম্পাদক ইহার শেষ দুই চরণের এইরূপ টীকা করিতেছেন ;—"প্রথম বর্ষার মতো নূতন নূতন ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিতে লাগিল। বরখি (হিন্দী) বর্ষা।"

রবীন্দ্রনাথের এই ক্ষেত্রে অনুযোগ—সম্পাদক বদরি এবং নবরঙ্গের আভিধানিক অর্থ কুল ও নারাঙ্গা লেবু অগ্রাহ্য করেছেন।

সে ক্ষেত্রে তাঁর সংশোধন—"রাধা নির্জনে কতবার আপনার উরজ দেখেন, আপনার পয়োধর দেখিয়া হাসেন। সে পয়োধর কিরূপ? না, প্রথমে বদরির (কুল) ন্যায় ও পরে নারাঙ্গার ন্যায়।"

পুনশ্চ :

"খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ। (পৃ. ৩)

সম্পাদক এই দুই চরণের অর্থ করিতেছেন : 'খেলার সময় হউক বা না হউক, লোক দেখিলে লজ্জিত হয় ও সহচরীগণের মধ্যে থাকিয়া একবার দৃষ্টি করে ও তখনি অপরদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে।"

এখানে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা—"খেলে, খেলে না ; লোক দেখিয়া লজ্জা হয়। সহচরীদের মধ্যে থাকিয়া দেখে, দেখে না। অর্থাৎ খেলিতে খেলিতে খেলে না ; দেখিতে দেখিতে দেখে না।"

পুনশ্চ :

"যব গোধূলি সময় বেলি
ধনী মন্দির বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরী রেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি। (সং ১৬, পৃ. ১৭)

সম্পাদক টীকা করিতেছেন : "বিদ্যুৎরেখার সহিত দ্বন্দ্ব (বিবাদ) বিস্তার করিয়া গেল। অর্থাৎ তাহার সমান বা অধিক লাবণ্যময়ী হইল।"

রবীন্দ্র-কৃত অর্থ : "রাধা গোধূলির ঈষৎ অন্ধকারে মন্দিরের বাহির হইলেন, যেন নবজলধরে বিদ্যুৎরেখা দ্বন্দ্ব বিস্তার করিয়া গেল।"

জিজ্ঞাসা চিহ্ন না দিয়ে সম্পাদক মহাশয় যে অর্থ করেছিলেন অনেক সময় তাতে ভাবহানি হয়েছিল বলে রবীন্দ্রনাথের ধারণা। যেমন 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন—সম্পাদক "জিজ্ঞাসাসূচক 'কি' শব্দের উপর নিতান্ত নারাজ।"

পুনশ্চ :

"লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধুমাতল কিয়ে উড়ই না পার? (৩ সং, পৃ. ৪)

সম্পাদককৃত অর্থ, লোচন স্থির ভৃঙ্গের আকার, "যেন মধুমত্ত হইয়া উড়িতে অক্ষম।"

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যার শেষে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দেবার পক্ষপাতী। তৎকৃত অর্থ—"তাঁহার লোচন স্থির ভৃঙ্গের ন্যায়; মধুমত্ত হইয়া সে কি উড়িতে পারিতেছে না?"

ঐরূপ—

"দারুণ বঙ্ক, বিলোকন থোর।

কাল হোই কিয়ে উপজল মোর?

সম্পাদককৃত শেষ চরণের অর্থ—আমার কালস্বরূপ হইয়া উপস্থিত হইল।"

শেষ চরণে জিজ্ঞাসা আনার পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ অর্থ করেছেন—"নিদারুণ এবং বঙ্কিমদৃষ্টি কি আমার কাল হইয়া উৎপন্ন হইল?"

অনুরূপ—

"চিকুরে গরয়ে জলধারা।

মুখশশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা?"

সম্পাদক—"মুখশশির ভয়ে আঁধার কি বা রোদন করিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ—"মুখশশির ভয়ে কি আঁধার রোদন করিতেছে?"

নবীন রবীন্দ্রনাথ অর্থগ্রহণে ও ব্যাখ্যায় যে প্রবীণদের এখানে পরাস্ত করেছেন, তা রসিক পাঠককে নিশ্চয় বলে বোঝাতে হবে না। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাই পরবর্তীকালে বহুলাংশে গৃহীত হয়েছে, তা বিদ্যাপতি পদাবলীর পরবর্তী বিভিন্ন সংস্করণ দেখলেই বোঝা যাবে।

৩

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতিচর্চা এখানেই সমাপ্ত নয়। বৈষ্ণব পদকারদের সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ যৌবনে বিশেষ প্রবল। ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় "পদরত্নাবলী" নামে বৈষ্ণব পদসংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই পদরত্নাবলী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ মজুমদারকে এক পত্রে বলেছেন—"তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না, এবং আমার সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়োজন।"—(২৬শে আশ্বিন, ১২৯২)। রবীন্দ্রনাথ অধিকন্তু বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশ করতে মনস্থ করেন।

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতিচর্চা সংক্রান্ত একটি অত্যন্ত কৌতূহলজনক ব্যাপার সম্বন্ধে প্রভাতকুমার গবেষণামুখে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য জানিয়েছেন। ১২৯৩ সালের আশ্বিন মাসে 'সাবিত্রী' পত্রিকায় এই 'বিজ্ঞাপন'টি প্রকাশিত হয়—

"বিদ্যাপতির পদাবলী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

"প্রায় দশ বৎসর কাল রবীন্দ্রবাবু বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী অধ্যয়ন করিয়া এই

সম্পাদকীয় কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলী যথাসম্ভব নির্দোষ ও নির্ভুল হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইতিপূর্বে মুদ্রিত কয়েকটি সংস্করণে পদের বা টীকার যত ভুল আছে, এই গ্রন্থে প্রায় সে সমস্ত সংশোধিত হইল। ফল কথা, সেই প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবির কবিত্ব বুঝিতে হইলে…রবীন্দ্রবাবু কর্তৃক সম্পাদিত এই সুন্দর মনোহর পদাবলী সকলেরই ক্রয় করা উচিত।

"১৫০ পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ তারিখের [১২৯৩] মধ্যে প্রকাশিত হইবে। পিপল্স্ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।"

প্রভাতকুমার লিখেছেন :

"এই সময়ে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭) নামে উদীয়মান সাহিত্যিক The Poets of Bengal নামে একটি গ্রন্থমালা সম্পাদন করিবার সঙ্কল্প করেন।…রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে রবীন্দ্রনাথ নিজ বিদ্যাপতির সম্পাদিত খাতাখানি তাঁহাকে দিয়া দেন।…কালীপ্রসন্ন তাঁহার সঙ্কলিত 'বিদ্যাপতি' ১৩০১ সালের পূর্বে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে কাব্যবিশারদ লিখিয়া ছিলেন—'শ্রীমোতিলাল চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কয়েকটি পরামর্শ দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু তাঁহার একখানি পুরাতন খাতা দিয়াও আমাকে বাধিত করিয়াছেন।' (ভূমিকা ১৩০৫ আশ্বিন ১)। রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে ঐ খাতা তিনি কখন পান তাহা তিনি বলেন নাই। তবে বোধ হয় কালীপ্রসন্নের সঙ্কল্পিত গ্রন্থমালা প্রকাশের কথা জানিতে পারিয়া তিনি (রবীন্দ্রনাথ) 'বিদ্যাপতির পদাবলী' সম্পাদন করিয়া এবং প্রকাশের কথা বিজ্ঞাপিত করিয়াও প্রকাশ করিলেন না। কালীপ্রসন্ন রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে যে-খাতাখানি পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি কখনো ফেরত দেন নাই।"

কালীপ্রসন্নের "বিদ্যাপতি পদাবলী" প্রকাশের সংকল্প এবং সেই সংকল্পে রবীন্দ্রনাথের খাতা-আহুতি বাংলা সাহিত্যের কতখানি ক্ষতি করেছে, তা কালীপ্রসন্ন বা রবীন্দ্রনাথ কেউই পুরো জেনেছেন কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ পরম প্রেমে খাতাখানি দিয়েছিলেন এবং কালীপ্রসন্ন পরমানন্দে তা নিয়েছিলেন, মাঝখান থেকে রবীন্দ্রনাথের দশ বছরের পরিশ্রম ও প্রতিভা-আঁকা খাতাখানি হারিয়ে গেল, যে 'আট আনা মূল্যে'র খাতাখানি পাবার জন্য, আমাদের কথা বাদ থাক, আমরা দরিদ্র, কয়েকশো বছর পরের মানুষ হয়তো আট লক্ষ (আট কোটি?) টাকা দিতে প্রস্তুত থাকবে। আত্মত্যাগী বাংলা দেশে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আরো আছে, অন্তত একটি, ত্যাগধর্মে তা আরো মহান, চারশো বছরের পুরনো ঘটনা—কোনো এক বিদ্যাযশপ্রার্থীর কাতর মুখের দিকে চেয়ে নিমাই পণ্ডিত তাঁর রচিত পুঁথিখানি নাকি নদীগর্ভে নিক্ষেপ করেছিলেন!

ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়!

৪

রবীন্দ্রনাথের উদারতার বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষোভের দুটি কারণ—প্রথমত রবীন্দ্রনাথ কবি ছাড়াও আরো কিছু ছিলেন—শব্দ ও শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর সক্রিয় জীবন্ত আগ্রহ ছিল। এই শব্দসিদ্ধ কবি (কথাটায় কে সন্দেহ করবে?) শব্দতত্ত্বকে বৃদ্ধবয়সেও গ্রন্থবিষয় করেছেন কৈশোর থেকে শব্দ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের বিষয়ে উল্লেখ করেছি পূর্বে। সারদা'র বিজ্ঞাপনে যে জানানো হয়েছিল, "বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর ভাষা বুঝিতে হইলে...এই সুন্দর মনোহর পদাবলী সকলের ক্রয় করা উচিত"—সেটা প্রচলিত বিজ্ঞাপন ছিল না—সেটা সত্যজ্ঞাপন।

দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি তো নিশ্চয়ই, সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম মনীষায় অদ্বিতীয়। কালব্যবধানের কারণে দুর্বোধ মৈথিল পদাবলীর অর্থগ্রহণের জন্য শব্দজ্ঞানের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন অন্তর্নিবিষ্ট সুগভীর সুতীক্ষ্ণ প্রতিভার, যা কবির মধ্যে কবি হয়ে প্রবেশ করতে পারে, যা আবেগের উত্তাপে গলিয়ে দিতে পারে কালের অন্ধকার, যা সহমর্মিতার নাড়ীর টানে তুলে আনতে পারে অতীতকে বর্তমানে। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই তা করতে পারেন।

তথ্য নিবেদনে আর একটু অংশ এখনও বাকি আছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ গ্রিয়ার্সন-সংগৃহীত বিদ্যাপতির সৌখিন উৎকৃষ্ট পদাবলী-সংগ্রহ পড়ে ঐ পদাবলী গ্রন্থের মার্জিনে অনেকগুলি পদের গদ্যে ও পদ্যে পূর্ণ বা আংশিক অনুবাদ লিখে রেখেছিলেন। এমন ৫২টি পদের অনুবাদ ছিল।

রবীন্দ্রনাথের সেই পূর্ণ বা আংশিক অনুবাদগুলি ১৩৪৮ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত চার মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় যে কেউ দেখে নিতে পারবেন। অনুবাদগুলি উদ্ধৃত ক'রে মন্তব্য করবার লোভ আমি সংবরণ করতে বাধ্য হচ্ছি। তাতে এই প্রবন্ধ আকারের ভদ্রসীমা অতিক্রম করবে (এখনো কি করেনি?)। ঐ অনুবাদগুলি একটি চমৎকার স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হতে পারে সংজ্ঞেই।

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যৌবনের এই প্রচুর আগ্রহের পটভূমিকায় আমরা সহজেই অনুমান করে নেব, রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি সম্বন্ধে নিশ্চয় একেবারে মুগ্ধ মধুকর ছিলেন। বিদ্যাপতি-পদ-সরোজের মধুকর যে তিনি ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই, মুগ্ধও ছিলেন, কিন্তু মধুপান-শ্রান্তিও তাঁর রচনায় দেখা গিয়েছে। কথাটা বোধ হয় নরম হয়ে গেল: প্রশংসার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অতি কঠিন সমালোচনা করেছেন বিদ্যাপতির কাব্য-বস্তুর। বিদ্যাপতিতে তিনি সেই গভীরতা পাননি, যা পেয়েছিলেন চণ্ডীদাসে। রবীন্দ্র-নাথের দুটি রচনাকে স্মরণ করা চলে এই প্রসঙ্গে। কুড়ি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ লিখে-ছিলেন "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি" প্রবন্ধ, এবং তিরিশ বছর বয়সে "বিদ্যাপতির রাধিকা"। প্রবন্ধ দুটির বক্তব্য প্রায় অনুরূপ, প্রভেদ রয়েছে রচনার সৌকর্যে। তিরিশ বছরের

রবীন্দ্রনাথ দশ বছর পূর্বেকার রবীন্দ্রনাথের চেয়ে নিশ্চয় বড়ো লেখক। ঐ দুটি প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বহুভাবে যা বলতে চেয়েছেন, তার মূল কথা হল—"বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।" এবং "নবীন চঞ্চল প্রেমহিল্লোলের উপর সৌন্দর্য যে কত ছন্দে কত ভঙ্গিতে বিচ্ছুরিত হইয়া ওঠে বিদ্যাপতির গানে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দেশে যে গভীরতা নিস্তব্ধতা, যে বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানলীনতা আছে তাহা বিদ্যাপতির গীতিতরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।"

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতিকে ভাবের কবিত্ব থেকে খারিজ করলেন। রূপের কবিত্বে বিদ্যাপতির আসন পাকা রইল, কিন্তু হায়, সেটা যে ছোটো কবির চেহারা। আর, যিনি 'রূপে তোমায় ভোলাবো না, ভালবাসায় ভোলাবো'—একথা বলতে পারেন না, তাঁকে কি কবি বলা যাবে ?

আমি রবীন্দ্রনাথের তিরিশ বছরের লেখা 'বিদ্যাপতির রাধিকা' প্রবন্ধ থেকে বিদ্যাপতির সমালোচনাত্মক অংশগুলি তুলেছি। তিরিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তাঁর প্রথম যৌবনের ধারণায় অবিচলিত থাকলেও সমালোচনায় কিছু সংযত হয়েছেন। কিন্তু কুড়ি বছর বয়সে, অল্প বয়সের ধর্ম অনুযায়ী ("অল্প বয়সের ধর্মই এই, সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ অত্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া দেখে"—'বিদ্যাপতির রাধিকা'), তিনি ভালো এবং মন্দকে রীতিমত স্বতন্ত্র করে দেখেছিলেন। চণ্ডীদাস পড়েছিলেন ভালো কবির দলে এবং বিদ্যাপতি মন্দ কবির দলে। "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি" প্রবন্ধের ভূমিকায় তিনি সত্য-কবি ও মিথ্যা-কবির মধ্যে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে যে-সব কথা বলেছেন, সেখানে বিদ্যাপতিকে স্পষ্ট ক'রে দ্বিতীয় দলে ফেলা হয়নি বটে, কিন্তু সমালোচকের মনোভাব বুঝতে ভুল হবার কথা নয়। সেখানে এমন সব কথাও বলা আছে :

> "নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। যাহারা প্রকৃতির বহির্দ্বারে বসিয়া কবি হইতে যায়, তাহারা কতকগুলা বড়-বড় কথা, টানাবোনা তুলনা ও কাল্পনিক ভাব লইয়া ছন্দ নির্মাণ করে।...গোঁজামিলন দিবার কল্পনা, না পড়িয়া পণ্ডিত হইবার, না অনুভব করিয়া কবি হইবার এক প্রকার গিল্‌টি-করা কল্পনা আছে, তাহা জালিয়াতের কল্পনা।"

সর্বনাশ! সমালোচনার কথাগুলি যদি বিদ্যাপতির সম্বন্ধে লেখা হয় তো—ব্যাপারটা ভয়াবহ। যা হোক রবীন্দ্রনাথ নাম করেন নি, এবং আমরা সন্দেহের অজুহাতে বিদ্যাপতিকে জালিয়াতির অভিযোগ থেকে মুক্তি দিতে পারি। মোটকথা বিদ্যাপতি 'সুখের কবি এবং চণ্ডীদাস দুঃখের কবি।' রবীন্দ্রনাথ ঐ দুই প্রবন্ধে উৎকৃষ্ট ভাবে ও ভাষায় চণ্ডীদাসের প্রেমলতাকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তাঁর প্রত্যেকটি কথা চণ্ডীদাসের কাব্য-

সমালোচনায় গভীরতার সঞ্চার করেছে। চণ্ডীদাসের অন্তর্জগতের এই বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়।

অপরপক্ষে বিদ্যাপতির কাব্যধর্ম ও কাব্যরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আংশিক সত্য ও সার্থক, কিন্তু তা পূর্ণাঙ্গ সত্য নয়। বলতে পারি, চণ্ডীদাসের মতোই বিদ্যাপতিতেও 'ভাবের মহত্ত্ব' এবং 'আবেগের গভীরতা' ছিল; 'অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা', 'সমুদ্রের নিস্তব্ধতা ও ধ্যানলীনতা' ছিলনা তা নয়; তা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন—"বিদ্যাপতির সমস্ত পদাবলীতে একটি মাত্র কবিতা আছে, চণ্ডীদাসের কবিতার সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে"—আমরা বিশেষ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলব, ঐ 'সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়' পদটি ছাড়াও বিদ্যাপতির আরো বেশ কিছু পদে চণ্ডীদাসের অনুরূপ "প্রেমের তীব্রতা ও প্রেমের আলোক" পাওয়া যাবে।

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আংশিক বিচারভ্রান্তির কারণ অনুমানের চেষ্টা করা চলে। রবীন্দ্রনাথ হয়ত বিদ্যাপতির সমগ্র পদাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাননি। কিংবা বিদ্যাপতির আধ্যাত্মিক পদ অপেক্ষা দেহমূলক পদগুলি সংখ্যাগুরু বলে রবীন্দ্রনাথ বহুর ধর্ম দিয়ে বিদ্যাপতির কবিধর্মের স্বরূপ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। সে প্রয়াসকে অনর্থক বলা চলে না; এবং আমার ব্যক্তিগত ধারণা হল, বিদ্যাপতি মূলত লৌকিক প্রেমের কবি। কিন্তু ঐ লৌকিক প্রেমই তীব্রতায় এমন অনেক গভীর মুহূর্তকে পদের মধ্যে স্পন্দিত ক'রে তুলেছে যে, সেখানে প্রেম সত্যই 'অশেষ' এবং তা মাত্র একটি জায়গায় নয়, যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। চণ্ডীদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পক্ষপাতের কারণ, এই সময়কার কাব্যে তিনি যে-দর্শনকে প্রকাশ করতে চাইছেন চণ্ডীদাসের মধ্যে সেই প্রেমদর্শনের অবস্থান লক্ষ্য ক'রে পুলকিত হয়েছিলেন, তারই কৃতজ্ঞতায় চণ্ডীদাসস্তুতি করেছেন অকুণ্ঠে (যেটা মোটেই ভ্রান্ত স্তুতি নয়)। এই চণ্ডীদাসের বিপরীত দিকে আছেন বিদ্যাপতি। তাই বিদ্যাপতিকে বিপরীত বিচারে রবীন্দ্রনাথ আঘাত করেছেন। প্রভাতকুমার চণ্ডীদাসের প্রতি আকর্ষণের এই দিকটির বিষয়ে বলেছেন:

> "এই তুলনামূলক প্রবন্ধের (চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি) উপসংহারে তরুণ লেখক যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতারই এক প্রকার মর্মব্যাখ্যা। সন্ধ্যাসঙ্গীতে কবির চিত্ত যে-প্রেমের জন্য লালায়িত, যাহার জন্য দুঃখকে বরণ করিতে প্রস্তুত, সেই প্রেমই জগতে স্বীকৃতি লাভ করিবে, ইহাই ছিল প্রতিপাদ্য বিষয়।"

ঐ প্রেমের পরাকাষ্ঠা চণ্ডীদাসের মধ্যে কবি দেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কী পরিমাণে এই চণ্ডীদাসীয় বিশুদ্ধ প্রেমতত্ত্বের দ্বারা বিচলিত হয়েছিলেন, তার আর একটি প্রমাণ দেওয়া যায়। অল্প পরে রবীন্দ্রনাথ ভারতীর (শ্রাবণ ১২৮৯) পৃষ্ঠায় 'বসন্ত রায়' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে এই অবিশ্বাস্য সিদ্ধান্ত দেখা যায়—বসন্ত রায় বিদ্যাপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি। বসন্ত রায় উল্লেখযোগ্য

বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে পড়েন না, আর বিদ্যাপতি শ্রেষ্ঠ দুই বৈষ্ণব কবির একজন—তবু বিদ্যাপতি অপেক্ষা বসন্ত রায় শ্রেষ্ঠ? নিশ্চয়। কারণ বসন্ত রায় যে, তুলনায় 'সহজ ও স্বাভাবিক।'

তবে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন এমন সর্তজিয়া থাকেন নি। পরবর্তীকালে উৎকৃষ্ট কাব্যের দৃষ্টান্ত দিতে তিনি চণ্ডীদাস অপেক্ষা বিদ্যাপতিকেই বেশী গ্রহণ করেছেন। কাব্যের জগতে 'প্রাণ'-কে কিনতে হয়, 'রূপ' দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে কাব্যবিচার করতে গিয়ে তা মেনেছেন। যৌবনকালে যৌবনের ধর্মে তিনি রূপকে চেয়েছেন, পীড়নদলিত দ্রাক্ষার মতো শুষে পান করেছেন বক্ষ, তার পরেই হতাশাজর্জর কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠেছেন—"ক্ষুধা মেটাবার খাদ্য নহে তো মানব।" রবীন্দ্রনাথের দেহক্ষুধা এবং ক্ষুধান্তে অবসাদের বিলাপোক্তিতে এই সময়ের কাব্য পূর্ণ হয়ে আছে। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যকে এ-ব্যাপারে বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত-রূপে গ্রহণ করা যায়। বিদ্যাপতি রবীন্দ্রনাথের ওই 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের মধ্যেই ভাবরূপে সর্বাধিক বর্তমান। এবং বিদ্যাপতির প্রতিবাদও ওই কাব্যের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতিচর্চার মধ্যে এই জিনিসটি বিশেষভাবে দেখা যায়। তিনি এইকালে বিদ্যাপতির ইন্দ্রিয়মূলক পদগুলির প্রতিই অধিক আকৃষ্ট, অন্তত তাঁর কৃত বিদ্যাপতির অনুবাদ, উদ্ধৃতি ও আলোচনা থেকে তাই প্রমাণ হয়। বিদ্যাপতির ভক্তিপদাবলী বাদ দিয়ে দেহমাদকতার পদগুলিকে তাঁর একটি মন পরমানন্দে আস্বাদন করছে, অন্য একটি মন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলছে তারস্বরে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মধ্যে তুলনার কালে বিদ্যাপতিকে নিছক দেহভাবী বলার মধ্যে তারই প্রমাণ রয়েছে।

ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য 'কড়ি ও কোমলে'র দৃষ্টান্ত নেওয়া উচিত। 'দেহের মিলন' নামক কবিতাটির রূপ নিম্নোক্ত প্রকার :

"প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে,
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ 'পরে।
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়া করিতে দর্শন।
হৃদয় লুকানো আছে দেহের সায়রে,
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন।
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।

আমার এ দেহমন চির রাত্রিদিন
তোমার সর্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।"

(পদটিতে জ্ঞানদাসের এক বিখ্যাত পদের প্রতিধ্বনি মেলে)।

এবার অন্য কয়েকটি কবিতার প্রথম লাইনগুলি তুললেই দেহমিলনের গ্লানির চেহারা ধরা পড়বে—

"সুখশ্রমে আমি, সখী, শ্রান্ত অতিশয়—" (শ্রান্তি)
"দাও খুলে দাও, সখী, ওই বাহুপাশ—" (বন্দী)
"এ মোহ ক'দিন থাকে, এ মায়া মিলায় —" (মোহ)
"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে, দাঁড়াও সরিয়া—" (পবিত্র প্রেম)
"মিছে হাসি, মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন—" (পবিত্র জীবন)
"এসো, ছেড়ে এসো সখী, কুসুমশয়ন—" (মরীচিকা)

কড়ি ও কোমলে বিদ্যাপতির ভাবকে গ্রহণ-বর্জনের ঐ রূপ। এখন ওই কড়ি ও কোমলে চণ্ডীদাসকে দেখা যাক। চণ্ডীদাসের পদ-সায়রে বাঁশি ডুবিয়ে কান্নার সুর তুলছেন রবীন্দ্রনাথ—সেই সুরের ব্যাকুলতায় চণ্ডীদাসের অর্চনা। কড়ি ও কোমলের গানগুলি চণ্ডীদাসের জন্য, সনেটগুলি বিদ্যাপতির। বিদ্যাপতির রাধিকার দেহ কঠিন সনেটের সাজ পরে দাঁড়িয়ে আছে—আর গানের সুরে অশরীরী হয়ে গেছে চণ্ডীদাসের শ্রীমতী। চণ্ডীদাস-নিঃশ্বসিত গানের দু' এক চরণ :

"আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে।…
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
মরিব কাঁদিয়া রে…
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে।…
ওই বাঁশিস্বর তার আসে বার-বার
সেই শুধু কেন আসে না।
এই হৃদয়-আসন শূন্য যে থাকে
কেঁদে মরে শুধু বাসনা।…
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাতে চরণে ঝরিব,
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল,
দেখে তারে আমি মরিব।" (বিরহ)

এবং—

"যদি আমারে আজ সে ভুলিবে সজনী
আমারে ভুলাল কেন সে ?
ওগো এ চিরজীবন করিব রোদন
এই ছিল তার মানসে।…
যদি মনে নাহি রাখে সুখে যদি থাকে
তোরা একবার দেখে আয়,
এই নয়নের তৃষা পরাণের আশা
চরণের তলে রেখে আয়।…
না না এত প্রেম সখী, ভুলিতে যে পারে
তারে আর কেহ সেধো না।" (বিলাপ)

এবং-

"কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে (সারাবেলা

এবং—

"ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে।
আমার ঘরে কেহ নাই যে।
তারে মনে পড়ে যারে চাই যে।…
সারা বিভাবরী কার পূজা করি
যৌবনডালা সাজায়ে,
ওই বাঁশিস্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়
আমি কেন থাকি হায় রে।' (গান

৫

মূল আলোচনা শেষ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতিচর্চার একটা খসড়ার দ্বারা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের রূপ দেখাবার চেষ্টা করেছি মোটামুটি। বিদ্যাপতির কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ শেষ অবধি বজায় ছিল। বিদ্যাপতি কত গভীরভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলেন, সেইসব রচনায় তার প্রমাণ আছে। পরিণত বয়সে সাহিত্যের তত্ত্বালোচনার কালে দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বিদ্যাপতির কাব্যাংশকে রবীন্দ্রনাথ অনেকবার ব্যবহার করেছেন। তিনি যে 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারল' অংশটিকে ব্যবহার করবেন তাতে আশ্চর্য কিছু নেই, এটা তাঁর চিরকালের প্রিয়—'অত্যাসীমাকে ছাপিয়ে' ওঠবার যোগ্য 'এতবড় অদ্ভুত অত্যুক্তি' তিনি শ্রেষ্ঠ কাব্যে আর পাননি বোধ হয়।

কিন্তু আরও একটি কাব্যাংশ, যার সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল—তা 'যৌবনের প্রথম আরম্ভের আনন্দোচ্ছ্বাস', 'হৃদয়ের নবীন বাসনাসকলের পাখা মেলে দেওয়ার প্রয়াসের' রূপ, কিংবা 'নবানুরাগের উদ্‌ভ্রান্ত লীলাচাঞ্চল্য'—সেই অংশটি কবির মনে কখন যে সৌন্দর্যের অক্ষয় রেখায় বন্দিনী চিরপ্রতিমার রূপ নিয়েছে, তা কবিও হয়ত জানতেন না। 'তথ্য ও সত্য' নামক প্রবন্ধে তথ্য ও সত্যের পার্থক্য বোঝাতে যা বলেছেন এবং যে-উদাহরণ দিয়েছেন, তা নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য :

"বিদ্যাপতি লিখছেন—

যব, গোধূলিসময় বেলি
ধনি মন্দিরবাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

গোধূলিবেলায় পূজা শেষ ক'রে বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে ঘরে গেল, আমাদের দেশে সংসার-ব্যাপারে এ ঘটনা প্রত্যহই ঘটে। এ কবিতা কি শব্দ-রচনার দ্বারা তারই পুনরাবৃত্তি? জীবন-ব্যবহারে যেটা ঘটে, ব্যবহারের দায়িত্ব-মুক্ত ভাবে সেইটেকেই কল্পনায় উপভোগ করাই কি এই কবিতার লক্ষ্য? তা কখনোই স্বীকার করতে পারি নে। বস্তুত, মন্দির থেকে বালিকা বাহির হয়ে ঘরে চলেছে, এই বিষয়টি এই কবিতার প্রধান বস্তু নয়। এই বিষয়টিকে উপলক্ষমাত্র করে ছন্দে বন্ধে বাক্যবিন্যাসে উপমা-সংযোগে যে-একটি সমগ্র বস্তু তৈরি হয়ে উঠছে, সেইটেই হচ্ছে আসল জিনিস। সে জিনিসটি মূল বিষয়ের অতীত, তা অনির্বচনীয়।...

"গোধূলিবেলায় একটি বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে এল, এই তথ্যটিমাত্র আমাদের কাছে অতি সামান্য। এই সংবাদমাত্রের দ্বারা এই ছবিটি আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না, আমরা শুনেও শুনি নে; একটি চিরন্তন এক-রূপে এটি আমাদের চিত্তে স্থান পায় না। যদি কোনো নাছোড়বান্দা বক্তা আমাদের মনোযোগ জাগাবার জন্যে এই খবরটি পুনরাবৃত্তি করে তা হলে আমি বিরক্ত হয়ে বলি, 'না হয় বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে এল, তাতে আমার কী।' অর্থাৎ আমার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ অনুভব করি নে বলে এ ঘটনাটি আমার কাছে সত্যই নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে ছন্দে সুরে উপমার যোগে এই সামান্য কথাটাই একটি সুষমার অখণ্ড ঐক্যে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল অমনি এ প্রশ্ন শান্ত হয়ে গেল যে 'তাতে আমার কী!' কারণ সত্যের পূর্ণরূপ যখন আমরা দেখি তখন তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হই নে, সত্যগত সম্বন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হই। গোধূলিবেলায় বালিকা মন্দির হতে বাহির হয়ে এল, এই কথাটিকে তথ্য হিসাবে যদি সম্পূর্ণ করতে হত তা হলে হয়তো আরও অনেক কথা বলতে হত; আশ-পাশের অধিকাংশ খবরই বাদ গিয়েছে। কবি হয়ত বলতে পারতেন, সে সময়ে বালিকার খিদে পেয়েছিল, এবং মনে মনে মিষ্টান্ন-বিশেষের কথা চিন্তা করছিল।

হয়ত সেই সময়ে এই চিন্তাই বালিকার পক্ষে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। কিন্তু তথ্যসংগ্রহ কবির কাজ নয়। এইজন্যে খুব বড়ো বড়ো কথাই ছাঁটা পড়েছে। সেই তথ্যের বাহুল্য বাদ পড়েছে বলেই সংগীতের বাঁধনে ছোটো কথাটি এমন একত্বে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কবিতাটি এমন সম্পূর্ণ অখণ্ড হয়ে জেগেছে, পাঠকের মন এই সামান্য তথ্যের ভিতরকার সত্যকে এমন গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছে। এই সত্যের ঐক্যকে অনুভব করবামাত্র আমরা আনন্দ পাই।" (তথ্য ও সত্য ; সাহিত্যের পথে)

বৈষ্ণব কাব্যের এই এক আধুনিক সমালোচনা। কোনো একটি বক্তব্যকে প্রমাণ করবার জন্য বৈষ্ণব পদের দৃষ্টান্ত এখানে নেওয়া হয়েছে, সেইজন্য ধীর চিন্তা—সমালোচনায় বুদ্ধি ও বোধের মিশ্রণ। কিন্তু বৈষ্ণব পদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এমন রচনাও আছে যার বিষয়ে একটি মাত্রই কথা বলা চলে—'ক্রিয়েটিভ'। বুদ্ধি যেখানে অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করেছে এবং অনুভূতি যেখানে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে আলোকিত রসসরতীরে আমাদের আকর্ষণ ক'রে নিয়ে গেছে—সেই অপূর্ব সৃষ্টিকর্মকে আমরা রবীন্দ্রনাথের রচনায় দেখতে পাব। আপাত বিসদৃশের মধ্যে নিগূঢ় ঐক্যকে কবিরা কোন্ শক্তিতে আবিষ্কার করেন এবং সেই কবিশক্তির মধ্যে রমণীয়তার সঙ্গে পুরুষ-চরিত্রের প্রকাশ কিরূপ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে—তার যোগ্য দৃষ্টান্ত ঐ অংশে মিলবে। অংশটি উদ্ধৃত করা উচিত। মূল প্রবন্ধটির নাম "কেকাধ্বনি", 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র এক সুবিখ্যাত রচনা। যে-কেকারব শুনতে মোটেই মিষ্ট নয়, তার প্রতি কবিদের পক্ষপাত কেন—তার কারণ জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের এক মহাগৌরব রচনা করেছেন—

"সেই [কেকারবের] মিষ্টতার স্বরূপ কুহুতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র। নববর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারই গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতরঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তন্যপিপাসু ঊর্ধ্ববাহু শতসহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখাপ্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে-একটি কাংস্যক্রেংকারধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া ওঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান; কান তাহার মাধুর্য জানে না, মনই জানে, সেইজন্যই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকখানি পায়, সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।"

কেকারব যেমন সুখশ্রাব্য নয়, তেমনি নয় দাদুরীরব। কবি সূত্র টেনে বলেছেন—

"বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মত্ত ভাবের সঙ্গে নহে, ঘনবর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গে বড়ো চমৎকার খাপ খায়। মেঘের মধ্যে আজ কোনো বর্ণবৈচিত্র্য নাই, স্তর-বিন্যাস নাই; শচীর কোনো প্রাচীন কিংকরী আকাশের প্রাঙ্গণ মেঘ দিয়া সমান করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, সমস্তই কৃষ্ণধূসরবর্ণ। নানাশস্যবিচিত্র পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল আলোকের তুলিকা পড়ে নাই বলিয়া বৈচিত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। ধানের কোমল মসৃণ সবুজ, পাটের গাঢ় বর্ণ এবং ইক্ষুর হরিদ্রাভা একটি বিশ্বব্যাপী কালিমায় মিশিয়া আছে। বাতাস নাই। আসন্ন বৃষ্টির আশঙ্কায় পঙ্কিল পথে লোক বাহির হয় নাই। মাঠে বহুদিন পূর্বে খেতের কাজ সমস্ত শেষ হইয়া গেছে। পুকুরে পাড়ির সমান জল। এইরূপ জ্যোতিহীন, কর্মহীন, গতিহীন, বৈচিত্র্যহীন, কালিমালিপ্ত একাকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে। তাহার সুর ঐ বর্ণহীন মেঘের মতো, এই দীপ্তিশূন্য আলোকের মতো, নিস্তব্ধ নিবিড় বর্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে; বর্ষার গণ্ডিকে আরও ঘন করিয়া চারিদিকে টানিয়া দিতেছে। তাহা নীরবতার অপেক্ষাও একঘেয়ে। তাহার নিভৃত কোলাহল। ইহার সঙ্গে ঝিল্লিরব ভালোরূপ মেশে; কারণ যেমন মেঘ যেমন ছায়া, তেমনি ঝিল্লিরবও আর-একটা আচ্ছাদন বিশেষ—তাহা স্বরমণ্ডলে অন্ধকারের প্রতিরূপ, তাহা বর্ষানিশীথিনীকে সম্পূর্ণতা দান করে।"

আমার বিবেচনায় বৈষ্ণব সাহিত্যের অংশবিশেষের এইটেই সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য সমালোচনা।

(Tagore Centenary Souvenir (1961). Rabindra Centenary Committee, Muzaffarpur)

সংযোজন

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রবীন্দ্রনাথের বহু বৎসরের পরিশ্রমের ধন বিদ্যাপতি পদাবলীর পাণ্ডুলিপি মেরে দিয়েছিলেন—বাঙালী পাঠক এই সংবাদ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-সহ নানা গবেষক-লেখকদের রচনা মারফত জেনেছেন। আঃ, "রাজকোষ হতে চুরি?" তদুপরি কালীপ্রসন্ন "কুসুমে কীট"-এর সন্ধানী, "মিঠে কড়া"-র ব্যাপারী। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ও ঘৃণাবোধ করতে অসুবিধা হবার কথা নয়, আমারও হয়নি—এই লেখাতে তার নিদর্শন আছে। কিন্তু সেই উপভোগ্য সুখে বাদ সেধেছেন ডঃ বিশ্বনাথ রায় নামক রবীন্দ্র-অনুরাগী গবেষক। নির্বিচারে, কোনো কিছুতে বিশ্বাস করায় অনিচ্ছুক এই সত্যসন্ধানী লেখক দেখেছেন যে, কালীপ্রসন্ন প্রায় বিনা অপরাধে দণ্ডিত। সেজন্য উক্ত 'দণ্ডিত' ব্যক্তির মরণোত্তর মুক্তির ব্যবস্থাপনায় ডঃ রায় সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর 'গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের 'বিদ্যাপতি পদাবলী: রবীন্দ্রনাথ ও

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ' প্রবন্ধে নানা অকাট্য প্রমাণযোগে দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ কালীপ্রসন্নকে মোটেই বিদ্যাপতি পদাবলীর পাণ্ডুলিপি দেননি—দিয়েছিলেন বিদ্যাপতি পদাবলীর "শব্দার্থ, ব্যাকরণের বিশেষত্ব এবং টীকা-টিপ্পনি" সংবলিত একখানি খাতা। সেই খাতা রবীন্দ্রনাথ দেন কালীপ্রসন্নর বিদ্যাপতি পদাবলীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে যাবার পরে। এই ঋণ কালীপ্রসন্ন বিদ্যাপতি পদাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় স্বীকার করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবনের শেষপ্রান্তে এসে" "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"-র সূচনায় যে-কথা বলেছেন, তা সতর্কভাবে পড়লে [ডঃ রায় জানিয়েছেন] পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "পদাবলীর যে-ভাষাকে ব্রজবুলি বলা হোত, আমার কৌতূহল প্রধানত ছিল তাকে নিয়ে। শব্দতত্ত্বে আমার ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। [অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বৈষ্ণব পদাবলীর] টীকায় যে শব্দার্থ দেওয়া হয়েছিল তা আমি নির্বিচারে ধরে নিইনি। এক শব্দ যতবার পেয়েছি তার সমুচ্চয় তৈরী করে যাচ্ছিলুম। একটি ভালো বাঁধানো খাতা শব্দে ভরে উঠেছিল। তুলনা করে আমি তার অর্থ নির্ণয় করেছি। পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির সটীক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তিনি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।"

কালীপ্রসন্নকে পুরো ছাড় অবশ্য রায় মহাশয় দেননি। উপরের কথাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এও বলেছিলেন, "তাঁর [কালীপ্রসন্নর] কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই খাতা আমি তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারিনি।"

কলঙ্কের ছিটে তাহলে কালীপ্রসন্নর গায়ে লেগে রইলই, বিশেষত যখন দেখা যায় যে, খাতাটি হাতছাড়া হবার ফলে "বৈষ্ণব পদাবলী বিষয়ে এই ধরনের লেখা [যাতে শব্দার্থ বিচার ছিল] পরবর্তীকালে আর তাঁকে [রবীন্দ্রনাথকে] লিখতে দেখা যায় নি।"

আমরা এখানে এই কল্পনা করতে ইচ্ছুক, খাতাটি থাকলে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর শব্দচর্চায় মেতে থাকতে পারতেন, কেননা তাঁকে সুবৃদ্ধ বয়সেও 'বাংলা ভাষা পরিচয়' নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে দেখা গেছে।

তাছাড়া বহুদিনের এক সঙ্গী, যার অঙ্গে ভালবাসার নানা কালের অঙ্গুলিরেখা—তাকে হারানোর দুঃখ নিবিড়। "বস্তুত এই খাতাটি কিশোর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিল। 'জীবনস্মৃতি'-র 'ঘরের পড়া' অধ্যায়ে 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' পাঠের নিজস্ব পদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে এই 'বাঁধানো খাতা'-রই উল্লেখ করেছেন তিনি।…কৈশোর কাল থেকে দীর্ঘদিনের সঙ্গী ছিল বলেই পরিণত বয়সেও সেই 'বাঁধানো খাতাটির' কথা ভুলতে পারেন নি কবি।"

সব জড়িয়ে মনে হচ্ছে, বিদ্যাপতি পদাবলীর কোনো 'পরিকল্পিত' পাণ্ডুলিপি অপেক্ষা (রায় মহাশয়ের আরও ধারণা, রবীন্দ্রনাথেরবিদ্যাপতি পদাবলী 'ইচ্ছা হয়ে মনের মাঝারে'

থেকে গিয়েছিল, কদাপি পাণ্ডুলিপি-জন্ম পায়নি) দীর্ঘদিনের মন্তব্যপুষ্ট বাঁধানো খাতাটি হারানোর দুঃখই রবীন্দ্রনাথের কাছে অধিক ছিল। সুতরাং নিবেদন—ডঃ বিশ্বনাথ রায়ের রচনার পরে ভবিষ্যতের লেখকগণ 'যা ছিল না' তার জন্য রোরুদ্যমান না হয়ে, 'যা রীতিমতো ছিল' তার বিহনে শোকার্ত হলেই বাস্তববোধ দেখাবেন।

যথাবর্তীকালে আমি আমার দুঃখকে 'পাণ্ডুলিপি হারানো' থেকে 'খাতা হারানোর' স্থানান্তরিত ক'রে নিচ্ছি।

সাংকেতিক নাটক 'রাজা'

১

বাল্যকালে য়ুরোপের কবিকুলগুরু গ্যেটের আকুল আর্তনাদের কথা যখন পড়িয়াছিলাম—Light more Light—তখন কেমন যেন একটা রহস্যময় অনুভূতি জাগিয়াছিল। কথাটির বাচ্যার্থ তো সামান্য। বোধকরি ব্যঙ্গ্যার্থই মনের ঐ বিচিত্র অনুভবের কারণ। যে-কথা বলিয়া গ্যেটে তাঁহার মর্ত্যজীবনের নিকট হইতে বিদায় লইলেন, 'রাজা' নাটকের আরম্ভে প্রায় সেই কথাগুলিই আছে—"আলো, আলো কই?" বিভিন্ন পরিবেশে কথিত অনুরূপ এই দুই উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় কি? আমার মনে হয়, সমস্ত জীবনব্যাপী প্রস্তুতি সত্ত্বেও মহারহস্যের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া অপরিচয়ের আশঙ্কায় গ্যেটে আলোর জন্য আর্তনাদ করিয়াছিলেন, আর সুদর্শনার জীবনের প্রারম্ভেই সেই রহস্যমিলন। এত সহিবে কেন? সুতরাং সুদর্শনা কাতরোক্তি করিলেন—"আলো আলো কই, এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না?" আলো জ্বলিবে, তাহার জন্য সাধনার প্রয়োজন। মহাধ্বান্তকে আলোকে সহিবার মানসপ্রস্তুতিকে সংক্ষেপে রাজা নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বলা চলে।

স্পষ্ট করিয়া বলিলে, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা বাহিয়া এক মানব-আত্মা কেমন করিয়া সেই পরমের উদ্দেশ্যে অভিসার করিয়া তাহাকে পাইল, তাহাই রাজা নাটকের মধ্যে বিবৃত। মানবাত্মাটির প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সঙ্গে আলো-অন্ধকারের একটি তত্ত্ব সংযুক্ত করা হইয়াছে এবং এখানে যে-মানবাত্মার অভিসার-কাহিনী রূপায়িত, তাহাকেও একটি বিশেষ রসসাধনার মধ্যে স্থাপন করা হইয়াছে।

স্থূলত সুদর্শনা মধুর রসের সাধিকা। তাঁহার এবং নাটকের অন্যান্য চরিত্রের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ছায়াপাত আছে। সে তত্ত্বটি কি?

রাজা স্বয়ং ঈশ্বর—তিনি অরূপরতন—তাই তাঁহাকে বাহিরের কেহ দেখিতে পায় না; যাহারা দেখে, তাহারা কুরূপ বোধ করে।

রাণী সুদর্শনা এই রাজার মহিষী, মধুর রসে রাজার সহিত তাঁহার মিলন।

রাণীর দাসী সুরঙ্গমা দাস্যভাবের সিদ্ধ সাধিকা।

ঠাকুরদা সখ্যভাবের ভাবুক। তিনিও সিদ্ধ।

কাঞ্চীরাজ শত্রুভাবের উপাসক।

এই সকল দিক হইতে এবং সুবর্ণকে ইন্দ্রিয়সৌন্দর্যের প্রতীক কল্পনা করিয়া কেহ-কেহ রাজা নাটকের রূপকার্থ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু আসলে এটি রূপকও নয় অথবা সম্পূর্ণত বৈষ্ণব রসাদর্শসম্মতও নয়। তাহার কারণ বলি।

রাজা ভগবান সুনিশ্চিত। কিন্তু এই ভগবান্ কি বৈষ্ণবের ভগবান! বৈষ্ণবের ভগবান্ কৃষ্ণ, অখিলরসামৃতসিন্ধু অনন্তলীলাময়, মধুরমূর্তি। আর বৈষ্ণবের রাধিকা ঐ

কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির বিগ্রহ—লীলারস আস্বাদনের জন্ম সৃষ্ট। তত্ত্বত রাধা মানবাত্মা নহেন। সুতরাং "রাধিকা ও সুদর্শনা এক পথের যাত্রী" (প্রমথনাথ বিশীর অভিমত), একথা সত্য নহে। তাহা ছাড়া বাস্তবেও রাধিকার সাধনা ও সুদর্শনার সাধনায় পার্থক্য আছে। বৈষ্ণবের রাধিকা তো স্বয়ং কুলমান বিসর্জন দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেমের ঔচিত্য বা আকর্ষণ সম্পর্কে তাঁহার দ্বিধা কোথায়? পথের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করার মধ্যেই তাঁহার গৌরব। সেখানে কৃষ্ণ অনেকাংশে নিষ্ক্রিয়। অথচ রাজা নাটকে সুদর্শনার পতন ঘটিয়াছে। তিনি রাজাকে চিনিতে পর্যন্ত পারেন নাই, অতি নিম্নস্তরের রূপমোহে ধরা দিয়াছেন। সেই মোহ ধরা পড়িলেও তিনি সহজে মোহ-ছাড়া হইতে পারেন নাই। রাজাই তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

অধিকন্তু রাজা নাটকে স্পষ্টত রূপমোহকে ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে। রূপের ঊর্ধ্বে অরূপের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কিন্তু কোনো বৈষ্ণব ইহার কথা চিন্তা করিতেও পারেন না। বৈষ্ণব তো রূপ দেখিয়াই আকুল। তাহার চোখে প্রথমে রূপ তারপর গুণ। রূপমুগ্ধতা বৈষ্ণবসাধনার আদি অঙ্গ। বৃন্দাবনের চিরকিশোর চিরকিশোরীর অনিন্দ্য দেহকান্তির প্রতি বৈষ্ণবের অতৃপ্ত নয়ন নিত্যকাল জাগিয়া আছে। তাহার তো সর্বপ্রথম "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে", তবে "গুণে মন ভোর"। আগে "রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল", অতঃপর অন্য সবকিছু। অথচ রাজা নাটকের মধ্যে রূপের তিরস্কার প্রধান। বৈষ্ণবের যাত্রা রূপ হইতে অপরূপে—সুদর্শনার ক্ষেত্রে রূপ বর্জনে অরূপে।

আবার এখানে ঈশ্বর-কল্পনাতেও বৈষ্ণবধারণার সহিত আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বৈষ্ণবের ভগবান নিছক রসমূর্তি, মধুরভাবের বিগ্রহ। তাঁহার মধ্যে ঐশ্বর্যের লেশমাত্র নাই। কিন্তু 'রাজার' মধ্যে যুগপৎ মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের মিলন। রবীন্দ্রনাথ মধুরভাবের অর্চনা করেন বটে, কিন্তু ঐশ্বর্যরূপ তাঁহার মনকে কম টানে না। তাঁহার ভগবান ভীষণ মনোহর, ভীমকান্ত, বজ্রশ্যামল, প্রচণ্ডসুন্দর। রবীন্দ্রনাথের নটরাজ পরিকল্পনার মূলে এই দুই বিপরীতের সমন্বয়। নটরাজের পদপাতে বিশ্ব ধ্বংস হয়, আবার তাঁহারই শীর্ষে চন্দ্রালোক, তাঁহারই ললাটে স্বপ্নচোখ। তিনি তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে কামকে ভস্মসাৎ করেন অথচ পুনরায় তাহারই হাতে পরাজয় মাগিয়া লন। 'রাজা' নাটকের মধ্যে এই পরিকল্পনার কাব্যরূপায়ণ অতি চমৎকার। রাজার কেতনে, পদ্মের মাঝখানে বজ্র আঁকা। রাজা ভয়ানক 'নিষ্ঠুর' আবার 'সুন্দর', 'অনুপম'। করভোগ্যানে অগ্নিবেষ্টিত রাজার সে কি ভয়াল মূর্তি—"তোমার মুখের উপর আগুনের আভা লেগেছিল—আমার মনে হল, ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো তুমি কালো,… ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো—তারই তুফানের উপর সন্ধ্যার রক্তিমা।" আবার ঠিক পরেই এই রাজা করুণ কোমল কণ্ঠে গাহিতেছেন—

"আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,
ভালবাসায় ভোলাব।

আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।"

এই ভগবান্ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব, এমন কি অপরেরও হইতে পারে, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কোনোমতে নয়।

সুরঙ্গমার দাস্যসাধনা বৈষ্ণব দাস্যভাবের অনুরূপ হইলেও সর্বাংশে এক নহে। সুরঙ্গমার মধ্যে দাস্যভাবের সহিত সখীত্বের খানিক সংমিশ্রণ হইয়াছে। রাজার সহিত রাণীর মিলনসাধন সে করাইয়া দিতেছে। সখী-সুলভ "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা" তাহার। দাস্যসাধকের এতখানি অগ্রসর অবস্থা নয়।

ঠাকুরদার সখ্যভাবের সহিত বৈষ্ণব সখ্যভাবের পার্থক্য আছে। ঠাকুরদা রাজার বন্ধু সত্য, কিন্তু পুত্র হারাইয়া বন্ধুত্বের পরীক্ষা আবার কি? বৈষ্ণব সখার মধ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে সমত্ববুদ্ধিই প্রবল, কৃষ্ণের কাঁধে চড়িয়া তাহাদের খেলা, সেখানে সম্পূর্ণ সম্ভ্রমশূন্যতা। অথচ ঠাকুরদার মধ্যে পুরোপুরি সম্ভ্রমবোধ।

কাঞ্চীরাজের শত্রুভাবে সাধনাও বৈষ্ণবসাধনা নয়, তা পুরাণ-সংগৃহীত।

সুতরাং বৈষ্ণব রসাদর্শের মধ্যে ফেলিয়া রাজা নাটকের রূপক-কল্পনা অর্থহীন।

রাজা দেখা দেন না, অথবা অন্ধকারে দেখা দেন। অন্ধকারে দেখা দেওয়া আর আর না-দেওয়া সাধারণ মানুষের কাছে সমানই। কারণ দর্শনকার্যে আমরা একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করিয়া থাকি, চক্ষুরিন্দ্রিয়। আবার এই ইন্দ্রিয়টি নিতান্ত অপরিণত। অতুল গুপ্ত মহাশয় জানাইয়াছেন, হেল্‌হোলমৎসের মতে এইটি একটি নিতান্ত ত্রুটি-বহুল যন্ত্র। চোখ কেবলমাত্র আলোকেই সক্রিয়, অন্ধকারে অচল। সুতরাং অন্ধকারের রাজা যত সত্যই হোন, দেশের লোক তাঁহাকে দেখিতে পায় না, দেশের রাণীও তদ্রূপ। রাজা অবাঙ্‌মনসগোচর। অবশ্য সে বাক্, মন—সাধারণ মানুষের প্রাকৃত বাক্, মন—নচেৎ রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ বুদ্ধির, শুদ্ধ জ্ঞানের বা মনের গোচর। রাজাকে প্রকাশ্যে দেখিবার জন্য তত্রাচ একটা কামনা কি রাণী, কি প্রজা সকলের মনেই তীব্র। কিন্তু বিশেষ অধিকার অর্জন না করিলে বোধকরি তাঁহাকে আলোকে দেখা যায় না। রাজার রাজ্যে ইতিপূর্বে দুই জন তাঁহাকে আলোকে দেখিবার অধিকার অর্জন করিয়াছে, সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদা। সুরঙ্গমা সে অধিকার পাইলেও ব্যবহার করে নাই, রাজার চরণতলে চোখ রাখিয়াই তাহার দিন কাটে; রাজাকে জানিয়াও সে রাজ-রহস্যকেই বরণ করিয়াছে, রাজ-প্রকাশকে গ্রহণ করে নাই। একমাত্র ঠাকুরদাই বোধকরি রাজাকে সর্ব অবস্থায় দর্শন করিবার অধিকারী; তথাপি কতখানি তাঁহার অধিকার তাহাও স্পষ্ট করিয়া বুঝি না। কারণ সুরঙ্গমাকে তবু অন্ধকার ঘরে রাজার সহিত কথা কহিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কি আলোকে, কি অন্ধকারে ঠাকুরদার সঙ্গে রাজার প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে নাই, অবশ্য সংযোগ নিশ্চিত ছিল। আনন্দের দিনে ঠাকুরদা রাজার বাণী বহন করিয়াছেন; দুঃখের দিনেও রাজার আদেশে তাঁহার

যোদ্ধবেশ। সুতরাং রাজার এই অন্ধকারই বা কি, আলোকই বা কি? এটি তুচ্ছ প্রশ্ন নয়, ইহাই সুদর্শনার জীবন-সাধনার মূলে।

২

সমালোচকদের মধ্যে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে নানা মত আছে। অন্ধকারের মতো অস্পষ্ট বস্তু, একই স্পষ্ট উপায়ে সকলের মন টানিবে আশা করা যায় না। প্রমথনাথ বিশীর মতে, ঐ অন্ধকার গৃহ মানুষের সাধনার পর্ব, নিভৃতে সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়া তবে পথে বাহির হইতে হয়। আবার ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে, ঐটি Inner Consciousness, হৃদয়ের গোপন আঁধার কক্ষে সেই অরূপ সুন্দরের আবাহন করিতে হয়। মানুষের সাধনার পর্বকে অন্ধকার গৃহ বলা চলে বটে, কারণ সাধনজীবনটা প্রকাশ্যে নয়, অন্ধকারেই সমাপ্ত করিতে হয়। মহাজন বাণীতে আছে—ভগবানকে ডাকবে মনে বনে কোণে। ঐ তিনটি স্থানেই আলোর গতিবিধি একটু সংকীর্ণ। আবার অন্ধকার ঘরকে Inner Consciousness যে বলা যায় না তাহা নয়, ব্যক্তিমানুষের গহন মানসগুহায় তিনি আবির্ভূত হন। কিন্তু এই দুই ব্যাখ্যায় অন্ধকার ঘরের বৃহত্তর তাৎপর্য একটু ক্ষুণ্ণ হয় না কি? উভয় অর্থেই অসিদ্ধ ক্ষণে অন্ধকার, সিদ্ধিতে পৌঁছিলেই আলোকাবতরণ। কিন্তু অন্ধকারকে এই প্রকার সীমাবদ্ধ অর্থে গ্রহণ করিতে আমাদের আপত্তি আছে। তবে অন্ধকারের অর্থ কি?

অন্ধকার অর্থে অসীম, Universal; আর অন্ধকারের রাজা মানে ভূমা—সর্বব্যাপী ভগবান্। ঐ অন্ধকার—রাজারই বিকাশ। অন্ধকারও যিনি অন্ধকারের রাজাও তিনি। অন্ধকারই ঘনীভূত হইয়া অন্ধকারের রাজার রূপ ধারণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ কালী মূর্তির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা এই তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা করে। কালী আলোকে কৃষ্ণবর্ণ কেন? যাহা অসীম অনন্ত, যাহা সর্বশূন্য, তাহার প্রতীক কি কৃষ্ণবর্ণ-মূর্তি নয়? কালোর কোনো রঙ নাই। আলোকে 'রাজা'কেও তাই ভয়ঙ্কর কালো দেখায়।

এই অন্ধকার যদি সর্বশূন্য অসীম অনন্ত হয়, তবে বিপরীত আলোক হইল সীমাবদ্ধ, সান্ত, খণ্ড। অন্ধকার যদি Universal, আলোক তবে detail। রাণী বলিতেছেন, রাজাকে দিনের আলোকে দেখিব। অর্থাৎ অস্তিত্ব দিয়া প্রকাশিত দেখিব। এ অস্তিত্ব কার? দিনের আলোকে আমরা আত্মসচেতন হই। সুতরাং আলোকে রাজাকে কি রাজ-অস্তিত্বে নিরীক্ষণ করা সম্ভব হইবে—না, আত্ম-অস্তিত্বের ছায়া তখন ব্রহ্ম-অস্তিত্বকে আবৃত করিবে? রাণী তাই আলোকে রাজাকে দেখিতে চাহিলে সে বাসনা পূরণ হইবে না। রাজার বদলে তিনি সুবর্ণকে দেখিবেন। কারণ সুবর্ণ আর কিছুই নয় রাণীর নিজ ব্যক্তিগত বাসনার প্রতিবিম্ব।

নাটকের শেষে কিন্তু আবার আলোর কথা কেন? রাজা বলিলেন—"আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম। এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো—আলোয়।" এই আলো কিন্তু অন্ধকারের চেয়ে

ঊর্ধ্বতর কিছু নয়। রাজা যে, রাণীকে আলোকে লীলায় আহ্বান করিলেন, তাহা ক্ষতি নাই বলিয়া। অখণ্ডের অনুভূতি যখন ঘটিয়াছে খণ্ডের বন্ধনও তখন ক্ষয় পাইয়াছে। অখণ্ডবোধ তখন খণ্ডের মধ্যেও প্রতিভাত হইবে। Detail-এ আর ভয় নাই—detail-এর মধ্যে Universal-কে দেখিবার শক্তি আসিয়াছে। আবার ইহাতে আনন্দের বৃদ্ধি; অখণ্ডের অনুভূতি অন্তরে রাখিয়া খণ্ডের সহিত লীলা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, একবার পূর্ণের প্রকাশ অন্তরে আসিলে আর বাহিরের প্রতিঘাতে ভয় নাই। "একবার পরশমণিকে ছুঁয়ে সোনা হও। সোনা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটিতে পোঁতা থাকে, মাটি থেকে তোলবার সময় সেই সোনাই থাকবে।" কিন্তু সোনা হইবার পর মাটির সম্পর্ক আবার কেন? তাহার কারণ, "ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস করতে ভালবাসে—কখনো সাঁতার দেয়, কখনো ডুবে, কখনো উঠে, যেমন জলের ভিতর বরফ টাপুর-টুপুর, টাপুর-টুপুর করে।" রবীন্দ্রনাথ লীলায় বিশ্বাস করিতেন, খণ্ড এবং অখণ্ড উভয়কেই তিনি আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

তত্ত্বের প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের এই রাজা—ইনি কি সর্বাংশে নির্বিশেষ? ইহার বিশেষ রূপ কি নাই? তাহা যথার্থ নয়। প্রমথনাথ বিশী বস্তুটিকে প্রকাশ করিয়াছেন এইভাবে—"তিনি যুগপৎ বিশেষ ও নির্বিশেষ। অর্থাৎ তিনি একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত। বস্তুত তিনি দুইই। তিনি 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র', আবার 'অন্তর মাঝে শুধু একা একাকী', বিচিত্রের আলয়-রূপে তিনি আকাশ, আর অন্তরবাসীরূপে তাঁহার আলয় নীড়। 'একাধারে তুমিই আকাশ তুমিই নীড়'।" ইত্যাদি। রবীন্দ্র-দর্শনের দিক হইতে এই কথাগুলি মিথ্যা নয়। তথাপি আমার মনে হয়, রাজা নাটকে বিশেষ আর নির্বিশেষ—আলো আর অন্ধকার নয়; তাহা "জগতের মাঝে কত বিচিত্র" এবং "অন্তর মাঝে একা একাকী" নয়। শুধু আলোকের মধ্যে নয়, অন্ধকারের মধ্যেও রাজা বিশেষ। অর্থাৎ আঁধারে রাণীর নিকট তিনি একইসঙ্গে অশেষ এবং বিশেষ। আলোকে তো তিনি নিশ্চয়ই বিশেষ, কিন্তু অন্ধকারেও তাঁহার বিশেষ একটা রূপ আছে। রাজা তো রাণীকে আলোকে বিশেষ করিয়া ভালবাসিতেছেন না, সুতরাং রাণীকেও তাঁহাকে অন্ধকারেই ভালবাসিতে হইবে। আবার অন্ধকারের মধ্যেও রাণীর প্রতি তাঁহার প্রেম মিথ্যা নয়। পৃথিবীর সকলের মধ্যে রাণীই তাঁহার প্রেয়সী। অন্য কেউ দাসী, কেউ সখা, কেউ বিদ্রোহী। অতএব রাজা রাণীকে বলিতেছেন—"আলোয় তুমি হাজার-হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে আমায় দেখতে চাও, এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি-না কেন?" এখানে লক্ষণীয়, অন্ধকারে তোমার 'একমাত্র' হয়ে থাকি—আলোকে নয়। অন্যত্রও রাজা বলিয়াছেন—"আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়।" রামকৃষ্ণ-বাক্য অনুসরণ করিয়া বলিতে গেলে—সচ্চিদানন্দ-সাগর অদ্বিতীয়, কিন্তু ভক্তির হিমে তার খানিকটা জমিয়া গিয়া আপাত রূপ ধরে। এই বিশেষ ভগবানকে ভক্তই সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং ইহার উপর তাঁহার বিশেষ অধিকার। এই বিশেষকে উপভোগ করিবার জন্য আলোকের প্রয়োজন

নাই—কি আলোক, কি অন্ধকার সর্বত্র তিনি বিশেষ—মানুষের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার হৃদয়াসীন দেবতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি প্রবন্ধে এই ধরনের উক্তি করিয়াছেন—"সেই যে একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব আছে,…আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব প্রভু। আমি নামক তোমার সকল হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সেই-যে একটি বিশেষ লীলা আছে এই বিশেষ লীলায় তোমার সঙ্গে যোগ দেব।…অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অখণ্ড সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রখাপাত বয়ে এসেছে সেটি হচ্ছে আমির রেখা—এই রেখাপথে তোমার সঙ্গে আমি বরাবর চলে এসেছি। সেই তুমি আমার অনাদি পথের চালক, অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু, তোমাকে আমার সেই একলা বন্ধুরূপে আমার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করব।"

৩

এ পর্যন্ত রাজা নাটকের সাংকেতিক তত্ত্ব-লক্ষণই আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু এই তত্ত্ব বা অধ্যাত্মভাব নাটকের মধ্যে সর্বত্র উপস্থিত আছে কি? ইহার সর্বাঙ্গীণ প্রতিষ্ঠার উপরেই নাটকের বিশেষ প্রকৃতি নির্ভর করিবে।

সে প্রসঙ্গে বক্তব্য: মূল গঠনকৌশলের দিক দিয়া রাজা নাটকের ঘটনাগত পারম্পর্যহীনতা অধ্যাত্মভাবরসকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিয়াছে। নাটকের প্রারম্ভে আমরা এক অদৃশ্য রাজাকে পাইলাম। এ বড় অদ্ভুত জিনিস! রাজা—দেশের সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব যাঁহার—তিনি রহিয়া গেলেন লোকলোচনের অন্তরালে, প্রজাসাধারণ তাঁহাকে কোনোদিন দেখিতেই পাইল না। সুতরাং প্রথমেই আমাদের বিশ্বাসবোধে আঘাত লাগিল। যেখানে রাজা বস্তুটা আর পাঁচটা বস্তু হইতে আত্মপ্রকাশে অধিক তৎপর সেখানে রাজাকে প্রকাশিত দেখাই যায় না। সুতরাং এ যে সাধারণ রাজা নহে তাহা বোঝা গেল। কিন্তু কেমন অসাধারণ? রাজাকে কেহ দেখিতে পায় না, অথচ তিনি সকলকে দেখিতে পান, তাঁহার বাহ্যত অনুপস্থিতি সত্ত্বেও দেশের শাসনতন্ত্রে বিন্দুমাত্র শৃঙ্খলাহানি বা ছন্দোনাশ ঘটে না। ফলে দর্শকসাধারণের মনে একটিমাত্র যে রাজা, রাজার রাজা বিশ্ব-রাজার কল্পনা আছে, তাহাই জাগ্রত হইয়া ওঠে, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বক্রিয়ার কারণস্বরূপ।

আবার রাজা রূপে ধরা দেন না বটে, কিন্তু অরূপ অন্ধকারে তাঁহার আবির্ভাব হয়, তাঁহারও দাসী আছে, প্রিয়া আছেন। ফলে রাজার আর একটি রূপ হৃদয়গোচর হইল, তিনি নির্বিশেষের সহিত বিশেষও।

প্রথম দৃশ্যে এইরূপভাবে রাজার অসাধারণ স্বরূপ নানা ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। এই প্রথম দৃশ্যের সংকেত এতই রহস্যময়, এতই তীব্র যে, সেখানে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিপ্রতিভার স্বাক্ষর অবশ্যস্বীকার্য।

ঘটনাসংস্থানে অন্যত্রও আমাদের লৌকিক বিশ্বাসবোধকে আঘাত করিয়া অলৌকিক

বিশ্বাসের উদ্বোধন করা হইয়াছে। যেমন উদ্যানে অগ্নিকাণ্ড, রাণীর পিতৃগৃহে যাত্রা, পিতৃগৃহে বীণার আকুল আহ্বান শ্রবণ, কাঞ্চীরাজ ব্যতীত অন্য রাজগণের মধ্যে পরস্পর সংশয়ে সংঘর্ষ, সুদর্শনার পরিবর্তন, ঠাকুরদার যোদ্ধৃবেশ ইত্যাদি। এইসকল স্থানে আমরা লজিকের অনুসরণ করিলে হতাশ হইব। অথচ এই ঘটনাগুলির উপরেই নাটকটির সাংকেতিকত্ব নির্ভর করিতেছে। ঐ অবিশ্বাস্য ঘটনার অনেকগুলিই অতি অপূর্ব ইঙ্গিত বহন করে ও রহস্যাভাস ঘনাইয়া তোলে। যেমন একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। উদ্যানে অগ্নিকাণ্ড। কাঞ্চীরাজ ও সুবর্ণ মিলিয়া স্থির করিল, প্রাসাদের এককোণে আগুন লাগাইয়া বিশৃঙ্খলার মধ্যে রাণীকে অপহরণ করিয়া লইবে। তাহাদের এই মতলবটি কিন্তু কোন্ পথে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ নাই, যেহেতু এটি একটি সাংকেতিক নাটক। কিন্তু আগুন লাগাইবার পূর্বে যেভাবে পরিবেশ চিত্রণ করা হইয়াছে, তাহা অতি অপূর্ব। এখানে বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাহারই মধ্যে—মালীদের সন্ত্রস্ত প্রস্থান, পশুপক্ষীদের ঊর্ধ্বশ্বাস পলায়ন, রাজগণের আকস্মিক চিত্তবৈকল্য, রোহিণীর কয়েকটি ইঙ্গিতময় বর্ণনা (যথা—"এরা কী বলে বুঝতে পারিনে—ভয় করছে। যে নদীর পাড়ি ভেঙে পড়বে সেই পাড়ি ছেড়ে যেমন জন্তুরা পালায়, এই বাগান ছেড়ে তেমনি সবাই পালিয়ে যাচ্ছে"; "চারদিকের দিগন্ত মাতালের চোখের মতো হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে। যেন চারদিকেই অকালে সূর্যাস্ত হচ্ছে"), সুবর্ণের আকুল আত্মনিবেদন, রাণীর তীব্র আর্তনাদ, অকস্মাৎ অকারণে সমগ্র বাগানে অগ্নিব্যাপ্তি, সর্বোপরি সেই অগ্নিবেষ্টিত দীপ্ত প্রলয়দাহের ঊর্ধ্বে অদৃশ্য অথচ অসংশয় রাজমহিমার ভীম ভীষণরূপ—ইহাকে সৃষ্টি বলিতে হয়।

ইহা ব্যতীত রাজপতাকা ও সুবর্ণপতাকার পার্থক্য (একটিতে কিংশুক ফুল আঁকা, অন্যটিতে পদ্মের মধ্যে বজ্র), নানাস্থানে বিপরীত ভাবধর্মী প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং নাম নির্বাচনের মধ্যেও সাংকেতিক ব্যঞ্জনা চমৎকার। প্রমথনাথ বিশী সুবর্ণ নামটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সত্য : "সুবর্ণ শব্দটির সুপ্রয়োগ হইয়াছে। সুবর্ণ বলিতে সুন্দর, স্বর্ণ ও মিষ্টবাক্য তিনই বোঝায়। প্রধানত এই তিনটির মোহেই মানুষ আত্মবিস্মৃত হয়।" এইসঙ্গে 'সুদর্শনা' নামটিরও সাংকেতিক ইঙ্গিত অনুমান করা চলে। সুদর্শনা কথাটিতে দ্ব্যর্থ আছে—এক, সে দেখিতে সুন্দর, দুই, তাহার 'দর্শন' সুন্দর। সুদর্শনা দেখিতে সুন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং সেই রূপের যে-বর্ণনা রাজা দিয়াছেন তাহাও সঙ্কেতরসে ভরপুর। আর সুদর্শনার দর্শনও সুন্দর। দর্শন দুই বস্তুর—রূপ ও স্বরূপ। সুদর্শনা রূপ দর্শনও করিয়াছিল আবার স্বরূপ দর্শনও করিয়াছিল। বস্তুত তাহার স্বরূপই-দর্শনই রাজা নাটকের বর্ণনীয় বস্তু।

৪

এ পর্যন্ত আমরা সাধারণভাবে রাজা নাটকের সাংকেতিক তাৎপর্য এবং তাহার প্রয়োগকৌশল দেখিয়াছি, কিন্তু ঐ তাৎপর্য ও প্রয়োগকৌশল সমগ্র নাটকটির মধ্যে

কতদূর সার্থকতা পাইয়াছে তাহা বিচার্য। প্রশংসার দিক আমরা যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু রাজা নাটকে ত্রুটির অংশও কিছু-কিছু আছে। নাটকের নানাদিক বিচার করিয়া তাহা লক্ষ্য করিব।

বিচার্য দিকগুলি হইল—(১) ঘটনা-সংহতি ; (২) চরিত্র ; (৩) সংলাপ ; (৪) সঙ্গীত।

নাটকের প্রাণবস্তু—ঘটনাধারা এবং সেই ঘটনাগুলিকে গাঁথিয়া তুলিবার কৌশল। কেন্দ্র-সংহতি না থাকিলে নাটক হয় না। এই কেন্দ্রীয় সংহতির রূপ হয়ত নাটকভেদে ভিন্ন, কিন্তু ঐ বস্তুটি না থাকিলে নয়। সাংকেতিক নাটকে সংকেতধর্ম অবিমিশ্রভাবে অনুসরণ অথবা ক্ষেত্রবিশেষে সংকেতধর্মের উপযোগী করিয়া ঘটনাগ্রন্থন প্রয়োজন। কোনো সময়েই সাংকেতিকতার হ্রাস করা চলিবে না। সাধারণ নাটকে হয়ত রসমিশ্রণ চলিতে পারে। ট্রাজেডির মধ্যে কমেডি বহু স্থানেই আছে। তাহা অপ্রয়োজন তো নয়ই বরং বহু স্থানেই অতি প্রয়োজন। ট্রাজেডির রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়াকে কথঞ্চিৎ লঘু করিতে কমিক রিলিফের আবশ্যক হয়। কিন্তু সাধারণ নাটকের রসমিশ্রণের অবসর সাংকেতিক নাটকে অপেক্ষাকৃত সংকুচিত ; কারণ সেখানে আবহাওয়া এতই সূক্ষ্ম, পরিবেশ এমনই ভাবসার যে, তাহার মধ্যে কোনো লৌকিক রসের মিশ্রণ অনেক সময় আপৎজনক হয়। অবশ্য সাংকেতিক নাটকও নাটক। সুতরাং তাহার রহস্যরস ধারণ করিবার আধার চাই। রস বস্তুটা যতই তরল হোক, আধার কঠিন। কিন্তু সেখানে ঐ কাঠিন্যের বাড়াবাড়ি চলে না, অনিবার্য আকারটুকু মাত্র বজায় রাখাই বিধি।

এই দিক দিয়া এই নাটকের জনসাধারণ সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন তোলেন। তাঁহাদের সংশয়ের যথার্থ হেতু আছে। রাজা নাটকে জনসাধারণ অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু জনসাধারণের কথাবার্তা বা কার্যকলাপে রহস্যময়তা বিশেষ নাই। তাহারা লৌকিক স্তরের জীব এবং তাহাদের কৌতুকপ্রবণতা, ভয়-ভীতি, বিতর্ক-বিক্ষোভ সর্বাংশে নাটকের মূল উদ্দেশ্যের পরিপোষকতা করে এমন নয়। নাটকে জনসাধারণের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু তাহা রহস্যকে ফুটাইয়া তুলিতে, রাজচরিত্রের বহুমুখিতা ও জনসমাজে তাঁহার সম্পর্কে নানা বিচিত্র ধারণার পরিচয় দিতে। জনসাধারণের কথাবার্তায় স্থানে-স্থানে তাহার আভাস আছে, যেমন বিদেশী পথিকদের রাজার রাজত্বে পথঘাটের একমুখী ঋজুগতি দেখিয়া বিস্ময় ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই তাহাদের কথাবার্তার সহিত রাজার সংযোগ নাই। তাহারা সাধারণ আমোদ-আহ্লাদে মাতিয়া থাকিয়াছে। সুবর্ণের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণের দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু সাধারণের উপর রাজার দুর্নিরীক্ষ্য আকর্ষণ তেমন অনুভব করা যায় না, অথচ ভগবৎ-আকর্ষণ সর্বমানবসাধারণ। জনসাধারণ, উৎসব ইত্যাদির অতিবিস্তারিত বর্ণনা কতকাংশে নাটকের রহস্যরসকে ফিকা করিয়াছে।

বসন্ত-উৎসবে সমাগত নানা দেশের নানা মানুষের আলাপে আলোচনায়, তামাসায় নাট্যরস জমিয়াছে সত্য কিন্তু তাহা সাধারণ নাট্যরস, অধ্যাত্ম নাট্যরস নয়।

নাটকে নানা ধরনের রাজার আবির্ভাবের সঙ্গত কারণ আছে। কারণ মহারাজার

রাজ্যে ছোটখাট নানা রাজার আবির্ভাব এবং বিদ্রোহ আশ্চর্য নয়। তাহাদের বিদ্রোহ দমনে রাজার রাজা-র মহত্ত্ব ও শক্তিই প্রকাশ পাইবে। সুতরাং তাহারা নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাহাদের আড়ম্বর একটু অতিরিক্ত, বিশেষত স্বয়ম্বর সভার জাঁকজমক, যুদ্ধ ইত্যাদি সাংকেতিক নাটকের রহস্যের সূক্ষ্ম তারে বাঁধা অবয়বে তেমন খাপ খায় না। আবার ছোটখাট রাজার বিদ্রোহ যত স্বাভাবিক হোক রাণীকে লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটু বেশি লৌকিক। রাণীর সাধনস্তর দেখান হইতেছে বলিয়া রাণীর চিত্ত-দ্বন্দ্ব প্রদর্শন অনুচিত নয়, কিন্তু তাঁহাকে লইয়া অনেকগুলি রাজার মধ্যে টানাহেঁচড়া —একটা বাহ্য কারণ আছে স্বীকার করা গেলেও—সাংকেতিক নাটকের পক্ষে তাহা অতিরিক্ত সহনশীলতার দাবি করে। সুদর্শনার পিতৃগৃহে পলায়নও লৌকিক রসের পোষক। সুদর্শনা রাজার নিকট হইতে আপনাকে সরাইয়া লইতে পারে ঠিকই, কিন্তু সেই সরিয়া যাওয়ার অর্থ পিতৃগৃহে প্রস্থান হইলে তাহা অতিরিক্ত বাস্তব হইয়া পড়ে না কি? যুদ্ধ ব্যাপার সম্পর্কেও অনুরূপ উক্তি করা যায়। বিভিন্ন রাজারা যখন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়া পরস্পর সংশয়ের জন্য পরাজিত হইল তখন তাহা রাজার ঐশী মহিমার প্রতিই অঙ্গুলিসঙ্কেত করে, কিন্তু কাঞ্চীরাজের বিরুদ্ধে ঠাকুরদার যুদ্ধ ও তাহার বক্ষে অস্ত্রাঘাত একেবারেই পার্থিব। সুতরাং স্থানে-স্থানে ঘটনাধারায় শিথিলতা এবং মূল উদ্দেশ্যচ্যুতি আছে তাহা স্বীকার্য।

এইবার বিভিন্ন চরিত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা চলে। সাংকেতিক নাটকে আমরা চরিত্রের সামগ্রিক রূপায়ণ পাই না। একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের অনুবর্তী করিয়া চরিত্রগুলিকে উপস্থাপিত করা হয়, এবং নাটকীয় প্রয়োজন অনুযায়ী চরিত্রের কোনো একটি বিশেষ দিকেই আলোকপাত করা হয়। সাংকেতিক নাটকে চরিত্রের বহিরঙ্গ সচলতা আবশ্যিক ধর্ম নয়। অথচ সাধারণ নাটকে চরিত্র-রূপান্তরই আসল। এমন কি সাংকেতিক নাটকের মধ্যে কতকগুলি চরিত্রকে অচল অটল ভাব-প্রতীক করিয়া নাটকের স্তম্ভস্বরূপ খাড়া রাখিতে হয়। দু'একটি মাত্র চরিত্রের রূপান্তর দর্শনই এই ধরনের নাটকের উদ্দেশ্য। এইদিক হইতে বিভিন্ন চরিত্রের বিচার করিতে হইবে। প্রথম, রাজা। 'রাজা'—নাটকের নাম-চরিত্র। তাঁহাকে ঘেরিয়াই সমস্ত রহস্য। সেই রহস্যকে কবি ফুটাইতে পারিয়াছেন। এই চরিত্রটিকে ক্রটিহীন বলা চলে। কী কী কৌশলে রাজার অসীমত্ব, সর্বব্যাপৃতত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে, আমরা তাহা দেখিয়াছি। 'রাজা' অন্ধকারের রাজা। রাজার রূপ ভীমকান্ত। রাজা একদিকে সৃষ্টি অন্যদিকে ধ্বংস করেন; তিনি রুদ্র-ভয়াল অথচ প্রেম-কোমল। উদ্যানে অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রচণ্ড মূর্তি লইয়া তিনি জাগিয়া উঠেন, ঠিক পরেই অন্ধকার কক্ষে তাঁহার বক্ষ ভেদ করিয়া কণ্ঠপথে সুরের তরঙ্গ নামিয়া আসে। রাণীর ক্রোধ, অভিমান, বিরাগ, বিদ্বেষে তিনি অচল অটল, কিন্তু রাণীর বাতায়ন-তলে তাঁহার বীণা আহ্বানের সুরে নিবেদনের ছন্দে বাজিয়া চলে। কোথায় তাঁহার শক্তির উৎস, কেমন করিয়া তিনি অবিশ্বাস্যকে সম্ভব করেন, তাহা কেহ জানেই না। কারণ এই, রাজা—বিশ্বরাজা।

রাণী সুদর্শনা কিন্তু মর্ত্যের মানবী। সুতরাং তাঁহার জীবনে পার্থিবের ছোঁয়া অধিক। তাঁহার কামনা-বাসনা, লোভ-মোহ, তাঁহার রূপ ও চরিত্র-দীপ্তি, তাঁহার পতন ও অভ্যুদয়, সমস্তই আমাদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে, কারণ তিনি মর্ত্যের অতীত নন। তাঁহার পার্থিবতায় নাটকের ক্ষতি হয় নাই কারণ তিনি মানবাত্মার প্রতীক-রূপে কল্পিত। বস্তুত সুদর্শনা 'রাজা' নাটকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। রাণী-চরিত্র সৃজনে কবির সূক্ষ্মদর্শিতার একটি প্রমাণ, তাঁহার সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল নাট্যকার যথাসম্ভব মিটাইয়াছেন। রাজার অতীতজীবন সম্বন্ধে আমাদের তেমন ঔৎসুক্য নাই। অথচ রাণীর পূর্ব-জীবন জানিতে ইচ্ছা হয়। নাট্যকার সে ইচ্ছার তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন। রাণী মর্ত্য-চরিত্র বলিয়াই এই কৌতূহল।

রাণী মর্ত্য-চরিত্র সত্য, তবে সাংকেতিক নাটকের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক কি একেবারে অকৃত্রিম মানব-চরিত্র হিসাবে? তাহা নয়। তাঁহার চারিত্রিক কামনা-বাসনার অতি-কৃতিই তাঁহাকে সাধারণত্ব হইতে রক্ষা করিয়াছে। সুদর্শনা অতুলনীয় সৃষ্টি।

সুরঙ্গমা আদর্শের বিগ্রহরূপে কল্পিত। সে সেবাভাবের প্রতীক। তাহার জীবনের সেই অংশকেই সামনে আনা হইয়াছে, যে অংশে তাহার মধ্যে আর দ্বিধা নাই, সংশয় নাই, ভয়ানকের চরণে যখন তাহার স্থান সুনির্দিষ্ট হইয়াছে। সাংকেতিক নাটকের ভাবস্তম্ভরূপে কল্পিত বলিয়া সুরঙ্গমার অতীত জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই দেওয়া হইয়াছে। তথাপি কিছু বর্ণনা যে আছে, তাহার কারণ ঐ বিবৃতির মধ্যে রাজার চরিত্র ফুটিয়া উঠিবে এবং মোহে চঞ্চল সুদর্শনার বিপরীত ভাবাদর্শ দর্শকের সামনে স্থাপিত থাকিবে।

কাঞ্চীরাজও সুদর্শনার মতো অনেকাংশে মর্ত্য-ভাবাশ্রিত। ভগবানের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করিয়া রাজার রাণীকে ছিনাইয়া লইবে এমন তাহার দুঃসাহস। সে অন্যায়কারী কিন্তু নীচ নয়। তাহার আন্তরিক শৌর্য তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। পৃথিবীর আর পাঁচটা মানুষ বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যে দুলিয়া বেড়ায়। তাহারা ভীরু, তাই অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে আপস করিতে দ্বিধা করে না। কোশল, কলিঙ্গ ইত্যাদি রাজার চরিত্রে এই বস্তুটি প্রবল। কিন্তু কাঞ্চীরাজের মধ্যে এই আত্মপ্রবঞ্চনা নাই। তাহার বিচার এবং বুদ্ধি একান্তই পার্থিব, তাহাতে কুহেলির লেশমাত্র নাই। তাহার এই বীরত্বই কবির শ্রদ্ধা তাহার উপর টানিয়া আনিয়াছে, পরিশেষে সেও মুক্তি পাইয়াছে। যত বড় অন্যায়কারীই হও রণক্ষেত্রে শস্ত্রপাণি অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে মুক্তি অনিবার্য—ইহাই শাস্ত্রমত। মহাভারতে আছে. ভীম অর্জুনাদির পূর্বেই দুর্যোধনের স্বর্গপ্রাপ্তি। ইহার পশ্চাতের বক্তব্য হইল, বীর্যের, আত্মশক্তির এমনই একটি দাহিকাশক্তি আছে, যাহা সকল দোষকে, অপরাধকে দহন করিয়া ভস্মসাৎ করিয়া দেয়। "তেজীয়সাং ন দোষায়।" তুলসীদাস বলিয়াছিলেন, বলবানের দোষ থাকে না। মহাভারতে আছে—কানীন পুত্র থাকা সত্ত্বেও কুন্তীর চরিত্রবিশুদ্ধি ঘোষণা করিয়া ব্যাসদেব বলিয়াছেন, সকলই বলবানের পথ্য, বলবানের শুচি সকলই; সকলই বলবানের ধর্ম এবং বলবানে সাজে না এমন বস্তু নাই।

কাঞ্চীরাজ চরিত্রের মধ্যে পৌরাণিক শক্তভাবে সাধনার ইঙ্গিত আছে।

সুবর্ণ চরিত্র হিসাবে মূল্যবান নয়। সে ইন্দ্রিয়ধর্মী সৌন্দর্যের প্রতীক। এই সৌন্দর্যের পশ্চাতে প্রাণশক্তি নাই। তাই নয়নে মোহাঞ্জন না লাগাইলে ইহার সৌন্দর্য চোখে পড়ে না। প্রাণ নাই বলিয়া তাহার সৌন্দর্যে কোনো ক্যারেকটার নাই—সে মোমের পুতুলের মতো। প্রজারাও বলিয়াছে, তাহাকে পাখার আড়াল করিয়া রাখিতে হয়। রাণীর চোখে তাহার সৌন্দর্য ননীর মতো কোমল, শিরীষ ফুলের মতো সুকুমার, প্রজাপতির মতো সুন্দর। এই সৌন্দর্য দর্শন করিবার উপযুক্ত সময় ও স্থান সেইখানে যেথায় "পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, ফুলের কেশরের ফাগ উড়বে, জ্যোৎস্নায় ছায়ায় গলাগলি হবে—সেই···দক্ষিণের কুঞ্জবনে।" মোহ বিদূরিত হইলে এই সৌন্দর্য আর চোখে পড়ে না। স্বয়ম্বর সভায় সুবর্ণকে দেখিয়া রাণী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন—"ওই সুবর্ণ, তুই সত্যি বলছিস? ওকেই আমি সেদিন দেখেছিলুম? না না। সে আমি আলোতে অন্ধকারে বাতাসে গন্ধেতে মিলে আর-একটা কী দেখেছিলুম। ও নয়, ও নয়।" ইন্দ্রিয়ধর্মী সৌন্দর্যের প্রতি চরম ধিক্কারবাণী নাটকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে—সুবর্ণের মতো ভীরু ও ভণ্ড কেহ নয়। তাহার লাঞ্ছনা সর্বাধিক, অসম্মান অপরিসীম।

রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা একটি অতি পরিচিত চরিত্র। অন্যান্য নাটকের মতোই রাজা নাটকেও ঠাকুরদা আছে। কিন্তু ইহার সৃষ্টি-কুশলতা ও অবতরণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অনেকের সংশয় আছে। ঠাকুরদার নাট্য-মাহাত্ম্য বিতর্কিত। সাধারণভাবে পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ ঠাকুরদার মহিমা স্বীকার করিতে চান না। তাহার একটি কারণ হয়ত, এই ধরনের চরিত্রের সহিত পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের সাযুজ্য নাই। কিন্তু এদেশী সমালোচকদেরও অনেকে ঠাকুরদা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। সে প্রশ্ন মূলত সৃষ্টির অন্তঃসঙ্গতির দিক হইতে, কারণ ঠাকুরদার চরিত্রমাধুর্য উপলব্ধিতে তাঁহাদের বাধা নাই।

সমালোচকদের আপত্তিকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এ বিষয়ে একটু বিচার করা যাক।

প্রথম কথা, ঠাকুরদা কোন্ প্রেরণার সৃষ্টি? ঠাকুরদা 'রাজা' নাটকে কোনো একটি বিচ্ছিন্ন চরিত্র হইলে এ বিষয়ে কবিপ্রেরণার তাৎকালিক প্রবর্তনার বিষয় অনুসন্ধান করিলেই চলিত। কিন্তু কেবল এইটি নয়, রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর চরিত্র অনেকগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার পিছনে আছে রবীন্দ্রনাথের এক বিশেষ মানসধর্ম। তিনি বিশ্বাস করিতেন, (অন্তত তাহাই মনে হয়), মানবমুক্তি কেবল রুদ্ধদ্বার যোগাসনে নয়। বহির্বিশ্বে আনন্দচঞ্চল জীবনযাত্রার প্রত্যেক মুহূর্তে ঈশ্বরের সন্ধান করিতে হইবে। সেই হাসি আর আনন্দের পথেও মুক্তি আছে। ঠাকুরদা সেই ধরনের মুক্তিসাধক—সদানন্দ হাস্যময় প্রাণদীপিত চরিত্র। ঠাকুরদা রাজার বয়স্য—বন্ধু, সুতরাং বিশ্বের সহিত তাঁহার হাসির সম্পর্ক। রাণীকে তিনি সেই কথাই বলিয়াছেন—"আমি কারো প্রণাম গ্রহণ করিনে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।" তাঁহার পাঁচ পুত্র মরিয়াছে; সুখে-দুঃখে, বেদনায়-

যন্ত্রণায় জীবনের অনেকগুলি দিন কাটিয়াছে ; কিন্তু হাসি দূর হয় নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের অধ্যাত্মবিশ্বাস ঠাকুরদা চরিত্রের মধ্যে রূপ ধরিয়াছে। হাসিয়া আর নাচিয়া মুক্তি আসে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা চলে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় ইহাদের স্বীকার করিতে হইবে।

তাহা স্বীকার করিয়াও যে-প্রশ্নটি অপেক্ষা করিয়া থাকে তাহা হইল, এই শ্রেণীর চরিত্র প্রয়োজনে আসিয়াছে না অপ্রয়োজনে, অর্থাৎ রচয়িতার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছায় —সৃষ্টির আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন নয়—ইহাদের আমদানী কিনা ? বর্তমান ক্ষেত্রে প্রশ্নটি আরও সংক্ষেপ করিয়া লইলে ঠাকুরদার নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা ?

কিছুটা নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা অস্বীকার করা চলে না। রাজার সর্বব্যাপকত্ব ফুটাইতে হইলে রাণীর সহিত তাঁহার একান্ত সম্পর্কের মতো বিশ্বের সহিত সম্পর্কও চিত্রে ফুটাইতে হয়। অথচ নির্বিশেষ রাজা সাক্ষাৎভাবে জনসাধারণের মধ্যে আসিতে পারেন না। ঠাকুরদাই রাজা এবং জনসাধারণের সংযোগসূত্র। সাধারণের মধ্যে রাজতত্ত্বের তিনি ব্যাখ্যাতা। তাঁহার অনেক উক্তির মধ্য দিয়া রাজার আচরণের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যথা, রাজ্যে রাজার অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা তিনি করিতেছেন এই বলিয়া—"আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে।…সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে !…আমাদের রাজা নিজে জায়গা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয় ;" "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে," ইত্যাদি। আবার রাজার সঙ্গে রাণী সুদর্শনার যে সম্পর্ক, তদতিরিক্ত ঠাকুরদার সঙ্গে রাজ-সম্পর্কের চিত্র দিয়া বিভিন্নমুখী অধ্যাত্মমার্গ বা উপলব্ধির পরিচয় দিবার চেষ্টাও নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ঠাকুরদা রাজদর্শন লাভ করিয়াছেন বলিয়া সংসার-নীরে পদ্মটির মত ভাসিবার, হাসিবার শক্তি তাঁহার আছে। তাঁহার অবস্থা "দুধ থেকে তোলা মাখনের মতো, লেজ খসা বেঙাচির মতো।" একদিকে অন্ধকারের কারাপ্রাচীরে অলব্ধ-পরিচয় রাণীর তীব্র আকুলতা আছড়াইয়া পড়িতেছে, অন্যদিকে প্রাপ্ত-সুন্দর ঠাকুরদার আলোকদীপ্ত ভুবনে তাঁহার বরণোৎসব চলিতেছে। সুদর্শনার সঙ্গে রাজার দর্শন রহস্যলোকে। আর ঠাকুরদা ও তাঁহার চেলা-চামুণ্ডারা আমাদের নন্দনলোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। বোধকরি ঈশ্বরের এই দুইমুখী প্রকাশই সমান সত্য।

সুদর্শনার অরূপ-সুন্দর এবং ঠাকুরদার আনন্দ-সুন্দর, এই উভয়ের মিলন নাটকে হইয়াছে কি ? ঠাকুরদা প্রচুর নৃত্যগীত করিয়াছেন, বসন্তোৎসবের মত্তমাতন সকলের মধ্যে ঘূর্ণিবেগে ছড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু এ সকল কি সাধারণ প্রাণানন্দের বহিঃপ্রকাশ—না ইহার পশ্চাতে ঈশ্বর-সত্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে? সাধারণ দর্শক প্রাণাবেগের অভিব্যক্তি সম্পর্কে যতখানি অসংশয় হয়, ঈশ্বর-সংকেত সম্পর্কে ততখানি নয়। অবশ্য এই বসন্তোৎসবের যাথার্থ্য নির্দেশ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন, রাজা ও বসন্ত উভয়েরই বাহিরে ঐশ্বর্য কিন্তু ভিতরে তাঁহারা চিরবৈরাগী ; ঋতুরাজ এবং বিশ্বরাজ

কাহারও আসক্তি নাই ; প্রাচুর্যের মধ্যে পরিত্যাগের প্রবর্তনা তাঁহাদের ইত্যাদি। কিন্তু প্রশ্ন এই—এই তত্ত্ব কি সর্বাঙ্গীণ সুষমা ও সামঞ্জস্যে মিলিত হইয়াছে ?

আমার মনে হয়, ঠাকুরদার মতো চরিত্র শারদোৎসবের মতো নাটকে চলিলে চলিতে পারে, কিন্তু বর্তমান নাটকে যেখানে সেই পরমপুরুষের সহিত ব্যক্তিচরিত্রের রহস্যময় সম্পর্কই প্রধান, সেখানে নয়। রাজা নাটকে বিশ্বসাধনার যত জয়ঘোষণাই করা হোক ব্যক্তিসাধনাই জয়ী। ঠাকুরদা বিশ্বচরিত্রকে বিশ্বরাজের দিকে আহ্বান করিয়া লইয়াছেন, তাঁহার আচার-আচরণের মধ্যে অপ্রকাশের অবগুণ্ঠন অপেক্ষা প্রকাশ-স্বচ্ছতাই অধিক। ঠাকুরদা রহস্য-সঞ্চার না করিয়া রহস্য-ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কার্যকলাপের দ্বারা নাটকের ভাবরস খানিকটা ফিকা হইয়াছে সুনিশ্চিত।

ঠাকুরদার বাহ্য আচরণের উপর রহস্যচ্ছায় তথাপি পড়িত যদি রাজার সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পর্কটি ফুটাইয়া তোলা হইত। ঠাকুরদা যে রাজ-বয়স্য তাহা তাঁহার উক্তিতে অনেকবার জানিয়াছি কিন্তু রাজার সহিত অন্তরঙ্গ মিলনের কোন চিত্র পাই নাই। সুরঙ্গমার সহিত রাজসম্পর্কের কিন্তু পরিচয় আছে। রাজা ও ঠাকুরদার সম্বন্ধ নিছক বিবৃতি মাত্রে রাখা নাটকের একটি মৌলিক ত্রুটি।

৬

রবীন্দ্র-নাটকে গীতিকবিতা বা সঙ্গীতের কার্পণ্যহীনতা একটি সাধারণ সত্য। সাংকেতিক নাটকে তো দূরের কথা সাধারণ নাটকেও তিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত গীতিকবিতা যোজনা করিয়াছেন। জগতের শ্রেষ্ঠ এই লিরিক কবির কথা কেবলই সুরের পক্ষ কামনা করিত। তিনি বলিতে গিয়া বাজিয়া উঠিতেন, কহিতে গিয়া গাহিয়া উঠিতেন। অথচ সাধারণ জীবন-রসাশ্রিত নাটকে সঙ্গীতের স্থান নিতান্ত সংকীর্ণ। শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডিতে গান নাই বলিলেও চলে, কমেডিতে তবু দু-একটি আছে। উচ্ছ্বাসপ্রবণ জাতি হিসাবে আমাদের নাটকে গীতিকবিতার সম্ভাব্য প্রাচুর্যের কথা মনে রাখিয়াও বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের নাটকে সেই প্রাচুর্য প্রায়ই সীমাহারা হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষ সাংকেতিক নাটকে।

সাংকেতিক নাটকে গীতিসংযোগের আত্যন্তিক প্রয়োজন আছে। তাহা নাট্যীয় প্রয়োজন। সাংকেতিক নাটকের উদ্দেশ্য যে অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় ভাবসঞ্চারণ, সে উদ্দেশ্যের সহায়তায় সঙ্গীতকে আহ্বান করিতে হয়। দেহগত সাধারণ উৎকণ্ঠা আবেগই যখন সংলাপের মধ্যে ধরা দিতে চায় না, তখন মনের, আত্মার অস্পষ্ট পদসঞ্চার, লঘু ইঙ্গিত, মৃদুতম কম্পন যে ধরা দিবে না তাহা বলাই বাহুল্য। অথচ সেই অচিনের ভীরু স্পর্শকে দর্শকচিত্তে রোমাঞ্চিত করিয়া তোলাই সাংকেতিক নাটকের প্রধানতম লক্ষ্য। সুতরাং কথা হইতে সুরের আশ্রয় লইতে হয়। কথার অগম্য স্থলে সুরসপ্তকে ভর করিয়া উড়িয়া যাওয়া চলে। "আমার সুরগুলি পায় চরণ আমি পাইনে তোমারে।" সঙ্গীতের মতো আভাসিত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। আত্মার নিগূঢ় চেতনার উৎসমুখ একমাত্র সুরই উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারে।

সুতরাং আত্মশক্তিতেই সঙ্গীত সাংকেতিক নাটকে স্থান করিয়া লইবে। কেবল সে সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রথমত ঐ সকল সঙ্গীত নাটকীয় প্রয়োজন ও সঙ্গতিবোধকে সম্মান করিয়া চলিয়াছে কি না? অর্থাৎ সেগুলি অনিবার্য, না আনীত।

দ্বিতীয়ত গান হিসাবে তাহাদের সার্থকতা। কবিতা গান নয়। কবিতার মুখ্য আধান শব্দ হইতে পারে, কিন্তু গানের ক্ষেত্রে সুর। শ্রেষ্ঠ কবিতা মাত্রই শ্রেষ্ঠ গান নহে। যাহা কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট, তাহাই সঙ্গীত হিসাবে ছাড়পত্র পাইবে না। অনেক সময় অতিরিক্ত শব্দাড়ম্বর, অর্থচাতুর্য গানের পক্ষে ক্ষতিকর। গান অতি সূক্ষ্ম, অতি সুকুমার, প্রজাপতির মতোই নিতান্ত লঘুপক্ষ। কবিত্বের দ্বারা তাহার শ্বাসরোধ ঘটিয়াছে কিনা বিচার করিতে হইবে।

তৃতীয়ত ঐ সকল সঙ্গীতের মধ্যে অধ্যাত্মব্যঞ্জনা যথোপযুক্ত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কি না?

এখন স্বীকার করিয়া লওয়া ভালো, সুর সম্পর্কে বিচার করিবার যোগ্যতা বর্তমান লেখকের নাই। আমরা উপর-উপর আন্দাজ করিয়া কয়েকটি মন্তব্য করিব। ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিয়া গেল।

আমাদের বিশ্বাস, নাটকের কিছু সঙ্গীত মূল উদ্দেশ্যবিচ্যুত। তাহাদের কোনোটি ঋতু-কবিতা, কোনোটি-বা উৎসব-কাব্য। "আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে", "আজি দখিন দুয়ার খোলা, এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার বসন্ত এসো", "আজি কমলমুকুলদল খুলিল", ইত্যাদি তাহার দৃষ্টান্ত।

কিন্তু এই নাটকের অধিকাংশ সঙ্গীতই কী প্রয়োজনাংশে, কী কাব্যাংশে এবং সঙ্গীতাংশে অনবদ্য ও অনিবার্য তাহা স্বীকার্য। কয়েকটি একেবারে তুলনাহীন। অন্যান্য-গুলি নাটকীয় তাৎপর্যের দিক দিয়া অতি মূল্যবান। সেই পরিবেশে ঐসব সঙ্গীতের সাহায্য-বিনা ভাব ফুটাইয়া তোলা সম্ভব ছিল না। যেমন ধরা যাক নাটকের প্রথম সঙ্গীতটি—

"খোলো খোলো দ্বার রাখিও না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও,
এসো দুই বাহু বাড়ায়ে।"

রাজার কণ্ঠে এই গানটির সার্থকতা অল্প নয়। অন্ধকার ঘরে রাণী সুদর্শনা হাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, আর অন্ধকারের রাজা বাহিরে আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন। বাহির হইতে নিবিড় আবেদনের আকুলতায় সুর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—"খোলো খোলো দ্বার রাখিও না আর—।" শত বাক্য ব্যয়েও ইহার অনুরূপ ফলসঞ্চার সম্ভব ছিল না।

অথবা নাটকের পরিণতির দিকে যখন রাণীর অভিমান চূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু রাজা

আসিয়া দেখা দিতেছেন না। ঐ রাজারই মতো কালো, রাজারই মতো শান্তিময় মরণের কূলে ঝাঁপ দিতে রাণী যাইতেছেন, তখন গান ধরিলেন—

"এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবনপারে,
আমার চিত্তে এসো নামি॥"

তখন রাণীর হৃদয়বেদনা, আত্মনিবেদন, নিগূঢ় অভিমান যেভাবে সুরমূর্তি ধারণ করিল, তাহার ব্যাখ্যা অসম্ভব। গ্রন্থের মূল রহস্যকে সঙ্গীতগুলি আরও নানাদিক হইতে স্পর্শ করিয়াছে। যখন বাউল গান ধরিল—

"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল খানে।
আছে সে নয়ন তারায়, আলোক ধারায় তাই না হারায়।"

—তখন গানটির বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করি। কারণ ইতিপূর্বে রাজার অস্তিত্ব লইয়া বিদেশী পথিকগণ প্রচুর বাদানুবাদ করিয়াছে। অতএব বিতর্কের উর্ধ্বে সহজ অনুভূতির প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। পুনরায়, পাগলের এই গানটিও সার্থকতাবিহীন নয়—

"তোরা যে যা বলিস ভাই,
আমার সোনার হরিণ চাই।
সেই মনোহরণ চপল-চরণ
সোনার হরিণ চাই।"

পাগলের সোনার হরিণ চাই। ইতিপূর্বে সোনার লোভে দেশের লোকগুলি সুবর্ণের পশ্চাতে ছুটিয়াছে। কিন্তু সোনা নয়, পাগলের চাই সোনার হরিণ, যাহা কোনদিন মিলিবে না, মিলিতে পারে না, অথচ যাহা কেবলই তৃষ্ণা আর অতৃপ্তি বাড়াইয়া নাগালের বাহিরে ছুটিয়া চলিবে। সুদূরের অনুভূতি জাগাইয়া সঙ্গীত এখানে সার্থক।

রাণী সুদর্শনার মধ্যে দ্বৈত ছিল। তাঁহার রূপমোহ অতি তীব্র সত্য কিন্তু তাহারই সমান্তরাল একটি আধ্যাত্মিক সত্যবোধ—অন্ধকারের রাজার প্রতি একটা নিগূঢ় আকর্ষণ ছিল। একটি গানের মধ্যে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। বসন্তোৎসবের দিনে কিশোর বালকগণ রাণীর নিকট গাহিয়া গেল—

"বিরহ মধুর হল আজি
মধুরাতে।
গভীর রাগিণী উঠে বাজি
বেদনাতে॥"

রাণীর হৃদয়ে তখন রূপ ও লালসার অগ্নি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে অথচ গান শুনিয়া তাঁহার চোখে জল ভরিয়া আসিল—"আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার যো নেই—তাকে হাতে পাবার দরকার নেই। এমনি করে খোঁজার মধ্যেই

সমস্ত পাওয়া যেন স্বধাময় হয়ে আছে।…বুঝতে পেরেছি, যা সকলের বড় পাওয়া তা ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, তেমনি যা সকলের বড় দেওয়া তা হাতে করে দেওয়া যায় না।"

কয়েকটি গানে রাজচরিত্রের ইঙ্গিত আছে। সর্বশেষে তাহারই উল্লেখ করি। তেমন একটি গান ঠাকুরদার মুখে—

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।" ইত্যাদি।

এখানে রাজার নির্বিশেষ সর্বময়তা ব্যঞ্জিত। অবশ্য যাহাকে বিশ্ববিধান বলি তাহারও আভাস এখানে স্বরময়।

ঠাকুরদার আর একটি অপূর্ব সঙ্গীতে রাজার চরিত্রের বহুমুখী দিকগুলি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি শুধু স্বখের প্রভু নহেন ; তিনি স্বখের— দুঃখের— আনন্দের— বেদনার প্রভু। বসন্তের ফোটা ফুলের অধীশ্বর তিনি পরমাসক্ত, ঝরা ফুলের অধীশ্বর তিনি পরম বৈরাগী। তিনিই তো সর্বমূলাধার, সকল ধারার মিলন সাগর—

"বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে।
দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে।
যে ঢেউ ওঠে তারি স্বরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে।
যে ঢেউ পড়ে তাহারো স্বর জাগছে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দেখ্ রে তোরা ঝরা ফুলের খেলা রে।
আমার প্রভুর পায়ের তলে
শুধুই কি রে মানিক জলে।
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে।"

এ সঙ্গীত কেবল অপার্থিব অলৌকিক নয়, একমাত্র এইখানেই স্বষ্ঠুভাবে উৎসব ও উৎসবরাজের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(বঙ্গভারতী পত্রিকায় ১৩৬০-এর আষাঢ়-শ্রাবণ, ভাদ্র-আশ্বিন, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, পৌষ-মাঘ এবং ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যাগুলিতে 'সাংকেতিক নাটক হিসাবে রাজা'—এই নামে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল।)

একটি কবিতা : কয়েকটি প্রয়োগ

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের, নাম গুরুগোবিন্দ। লেখা হয়েছিল ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে, কবির বয়স তখন বছর পঁচিশের মতো। এই কবিতায় একদিকে আছে গুরুগোবিন্দের ভাবী জীবনের স্বপ্ন, অন্যদিকে তাঁর নিভৃত সাধনার কথা। কবিতাটির মূল গৌরব গুরুগোবিন্দের জলন্ত জীবনস্বপ্নের রূপায়ণে। যৌবনদীপ্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ মনের আগুন ঢেলে দিয়েছিলেন কবিতার ছত্রে-ছত্রে।

রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবির গণ্য কবিতার মধ্যে এটি পড়ে। সুতরাং এর আবেদন সর্বজনীন হবে তাতে সন্দেহ নেই। কবিতার সর্বজনীন রস-সংবেদনা সম্বন্ধে জানতে হলে পাঠক সে সম্পর্কিত যে-কোনো প্রবন্ধ পড়ে নিতে পারেন। সেখানে দেখবেন, কবিতা সর্বজনীন এবং বিশিষ্ট দুইই। সর্বজনীন এই অর্থে যে, 'প্রায়' সকলের ভালো লাগে, বিশিষ্ট এই অর্থে যে, সেই ভালো লাগার মধ্যে স্বাদবৈচিত্র্য আছে। শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে আমি আমাকে পাই—যে আমি আছি, ছিলুম, থাকব, থাকতে চাই। এর সঙ্গে যোগ করে দেব, কেবল নিজেকে পাই না, প্রিয়জনদেরও পাই। আসলে সেটা নিজেকেই পাওয়া। আমার বাসনাকে ধারণ ক'রে তবে কেউ আমার প্রিয় হয়।

ভূমিকা করব না করেও ভূমিকা করতে হল একটি কথা বলবার জন্য, রবীন্দ্রনাথের 'গুরুগোবিন্দ' কবিতাটিকে বাংলাদেশের মনস্বী ব্যক্তিরা পরবর্তীকালের বিভিন্ন মহামানবের জীবনকাব্য বলে ঘোষণা করেছেন। কথাটি বিনা ভূমিকায় বললেও ক্ষতি হতো না।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের সদ্য প্রকাশিত 'টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে দেখলাম, তিনি কবিতাটিকে 'গান্ধী-চরিত্রের' পূর্বাভাস বলেছেন। কবিতাটি গান্ধীজীর ভারতীয় কর্মজীবন শুরু হবার পূর্বেই রচিত হয়েছিল। মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় আবার বেশ-কিছু বৎসর পূর্বে এই কবিতাটিকেই অনাগত নেতাজীর জীবনকাব্য বলে ঘোষণা করেছিলেন।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে বাংলাদেশের দুই মনস্বী ব্যক্তি গান্ধীজী ও নেতাজী উভয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন। এ ব্যাপারে দুজনেই দ্বিধাহীন, নিজ বক্তব্যের যথার্থতা সম্বন্ধে তাঁদের কারোরই মনে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রথমে ডঃ শশিভূষণের কথা উদ্ধৃত করে তাঁর নিঃসংশয় বিশ্বাসের চেহারা দেখে নেওয়া যাক। তিনি লিখেছেন—

"কবি মাত্রেই ক্রান্তদর্শী, রাম জন্মিবার পূর্বেই যে, কবি রামায়ণ রচনা করিয়া রাখেন ইহা সর্বকালের সাহিত্যের পক্ষেই একটি মূল সত্য।...সমাজজীবনের রক্তমাংসের মানুষের মধ্য দিয়া যে-সত্য অদূর ভবিষ্যতেই বিষয়ীভূত হইয়া উঠিবে কবি সর্বদাই পূর্বাহ্ণে তাহার আগমনী গাহিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে গান্ধীজীর সহিত পরিচয়ের

বহু পূর্বে এমন কি গান্ধীজীর কর্মজীবন গড়িয়া উঠিবারও বহু পূর্বে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোনো-কোনো কবিতায় এবং নাটকে যে-চরিত্রাঙ্কন করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে গান্ধী চরিত্রের অমন পূর্বাভাস কি করিয়া জাগিল তাহা বিস্ময়াবহই বটে।"

এর পর ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। গান্ধীজীর কর্মকৌশল ও নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বহু বার এই 'গুরুগোবিন্দ' কবিতাটি আবৃত্তি করেছেন এবং দেখেছেন—'প্রতিটি স্তবকের প্রতিটি পঙ্‌ক্তির কথাই অতি গভীর ও ব্যাপকভাবে গান্ধীজীর কর্মাদর্শ ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে প্রযোজ্য।"

কেন প্রযোজ্য তার কিছু কারণ ডঃ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন। আন্দোলন আরম্ভ করে গান্ধীজী যখনি নেতৃত্বের মধ্যে দুর্বলতার সন্ধান পেয়েছেন তখনি নিজেকে সংবরণ ক'রে আত্মশুদ্ধির ব্রত নিয়েছেন। এই সময়ে "প্রবল জনস্রোতের উন্মাদনা", "আকস্মিকভাবে রুদ্ধবীর্য সহকর্মিগণের ক্ষোভ" ইত্যাদি সত্ত্বেও গান্ধীজী সংযম অবলম্বন করে "একাকী দীর্ঘ রজনী" সাধনা ক'রে গেছেন।

এইবার মোহিতলালের বক্তব্য। তিনি বলেছেন, 'গুরুগোবিন্দ' কবিতা বৈদিক পুরুষ-সূক্তের মতো নেতাজীর নব পুরুষ-সূক্ত :

"আর একটি এইরূপ পুরুষ-সূক্ত—খুব নিকটে, আমাদের দেশে, আমাদেরই কবির কণ্ঠে উদ্‌গীত হইয়াছে ; কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের।...এতদিন যাহা ছিল একটি উৎকৃষ্ট কবিতা মাত্র, আজ তাহাই যেন ভারত-ভাগ্যবিধাতার কণ্ঠোচ্চারিত এক দিব্যবাণী বা দৈববাণী। রাম জন্মিবার আগেই যেমন বাল্মীকির মনোভূমিতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, এখানেও তেমনি এক বাঙালী কবির চিত্তে তখনও অনাগত এক আদর্শ বীর নেতার জন্ম হইয়াছিল।...সমগ্র জাতির মুক্তিপিপাসা কবির অন্তরতম চেতনাকে অধিকার করিয়া একটি আকুল কামনার রূপ ধারণ করিয়াছিল—সেই কামনাই যেন একটি পুরুষমূর্তি গড়িয়া লইয়া তাহাতেই বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেই ভাব-মূর্তি যে এমন শরীরী হইয়া উঠিবে, কবিও কি তাহা জানিতেন? ইহাকেই বলে আর্য প্রেরণা।"

মোহিতলাল এর পর অধিক বিস্তারিতভাবে কবিতাটির বিভিন্ন অংশের সঙ্গে নেতাজীর জীবন ও সাধনার ঐক্য দেখিয়েছেন। এবং সেই ঐক্য দেখাবার পরে, ঐক্য বাস্তব জীবনে আক্ষরিক সত্যে পৌঁছনয় 'স্তম্ভিত' হয়ে প্রশ্ন করেছেন—"কবির কণ্ঠে সেদিন এ কোন্ সরস্বতী ভর করিয়াছিল—এ যে একেবারে প্রতি অক্ষরে সত্য?"

বিস্ময়ের কথা এই, কবিতাটির সঙ্গে তাঁদের প্রিয় পুরুষের জীবন ও সাধনার ঐক্য দেখাবার কালে মোহিতলাল ও শশিভূষণ একই জাতীয় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। দু-জনেই রাম জন্মানোর পূর্বে রামায়ণের সাহিত্যিক প্রবাদের উল্লেখ করেছেন, কবিতার সঙ্গে জীবনের ঐক্য যে আক্ষরিক তাও বলেছেন, অবাক হয়ে ভেবেছেন—এমন বস্তু

কিভাবে সম্ভবপর হল, এবং কবিতা থেকে অংশ উদ্ধৃত করার কালে উভয়েই গান্ধীজী ও নেতাজীর 'নীরব সাধনার' দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

তাহলে সমাধান কোথায়? কবিতাটি গান্ধীজী না সুভাষচন্দ্র—কার বিষয়ে অধিকতর সত্য? নিশ্চয় এ-বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয় এবং নিশ্চয় যে-কোনো শেষ সিদ্ধান্ত গান্ধীজী ও নেতাজীর অসংখ্য অনুগামীদের দ্বারা প্রশ্নাক্রান্ত হবে।

বলা বাহুল্য, আমার মতো ক্ষুদ্রবুদ্ধির সাধ্য নেই এ প্রশ্নের মীমাংসা করি। কেবল কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

কবিতাটিকে গান্ধীজীর সম্বন্ধে প্রয়োগ করবার একটি বিশেষ যুক্তি আছে। গান্ধীজী তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অনেকবার আন্দোলন থামিয়ে দিয়েছেন অ-রাজনৈতিক কারণে। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনকালে চৌরিচৌরার ঘটনার পরে গান্ধীজীর আন্দোলন প্রত্যাহার করার কথা অনেকের জানা আছে। উন্মাদনা যখন চূড়ান্তে, তখন আন্দোলনের 'কণ্ঠরোধ' তাঁর অনেক সহকর্মীর মনঃপূত হয় নি, কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন অনমনীয়, কারণ তিনি আন্দোলন আরম্ভ বা শেষ করতেন 'অন্তরের বাণী'র উপর নির্ভর করে। আন্দোলন বন্ধ করে দেবার পরে 'রুদ্ধবীর্য সহকর্মীদের' (ডঃ দাশগুপ্তের প্রয়োগ) ক্ষোভ প্রচণ্ডভাবে তাঁর উপর আছড়ে পড়লেও তিনি বিচলিত হতেন না। 'গুরুগোবিন্দ' কবিতার প্রথমাংশে আছে, গুরুগোবিন্দ—রামদাস, সাহু, লেহারি প্রমুখ অনুগামীদের ফিরে যেতে বলেছেন; কারণ তিনি তখন মানব-সাগরের ঊর্মিনিনাদ থেকে সরে এসে বিজনে আপন গোপন কাজে মগ্ন। গান্ধীজীরও ছিল অনুরূপ আচরণ, আর তার বিপরীত আচরণ সুভাষচন্দ্রের। সুভাষচন্দ্র কখনই, বাধ্য না হলে, জনসমাজ ও তার আন্দোলন থেকে ইচ্ছাপূর্বক দূরে সরে যান নি। যখন দূরে গেছেন, সে সরকারের বেড়ি পরে কিংবা মৃত্যুর বাড়ি খেয়ে। তাই গুরুগোবিন্দ কবিতার প্রথমাংশে গুরুর যে স্বেচ্ছাপূর্বক আত্মসংহরণের কথা আছে তার সঙ্গে গান্ধীজীর সাধনার ঐক্যই বেশী।

এই স্বেচ্ছাসংহরণ ছাড়াও 'কর্মবিহীন 'বিজন সাধনা'র প্রতি গান্ধীজীর সাময়িক আসক্তির কথা আমাদের জানা আছে।

কিন্তু সম্ভবত এই পর্যন্ত কবিতাটিকে গান্ধীজীর সঙ্গে মেলানো যাবে। বাকি আর যে-সব অংশে ঐক্য—যেমন গুরুর ডাক শুনে সকলের দ্বার খুলে বেরিয়ে আসা, বা 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে সকল দেশ' ইত্যাদি বলার সামর্থ্য—প্রথম শ্রেণীর সকল চরিত্রবান দেশনায়কের মধ্যে দেখা যায়ই—না গেলে তাঁরা কদাপি দেশের যথার্থ অধিনেতা নন।

একটি বিশেষ বক্তব্য কবিতাটিকে গান্ধীজী থেকে সুভাষচন্দ্রের জীবনের অধিকতর নিকটবর্তী করেছে—গুরুগোবিন্দ সশস্ত্র সংগ্রামের গুরু ছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সেইভাবেই দেখিয়েছেন। গুরুগোবিন্দ তাঁর শিষ্যদের কাছে তাঁর ভাবী জীবনের যে 'স্বপন' উপস্থিত করেছিলেন সে স্বপ্নের খানিক অংশ এই—

"তোমাদের হেরি চিত্ত চঞ্চল
উদ্দাম ধায় মন।
রক্ত অনল শত শিখা মেলি
সর্প সমান করি ওঠে কেলি,
গঞ্জনা দেয় তরবারি যেন
কোষ মাঝে ঝন্ ঝন্।

হায় সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয়তূরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।" ইত্যাদি

আমার বিশ্বাস, এই জাতীয় বক্তব্যের সঙ্গে গান্ধীজীর জীবনাদর্শের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে না।

অপরপক্ষে এই বক্তব্যকে সহজেই আত্মসাৎ করতে পারেন সুভাষচন্দ্র। তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের সর্বাধিক আদর্শবাদী নেতা। একদিকে ছিল তাঁর অধ্যাত্ম-পিপাসা ও গোপন অধ্যাত্ম-জীবন; অন্যদিকে সেই সাধনার শক্তিকে সংগ্রামে প্রয়োগ করবার বাসনা। 'কোষ মাঝে ঝন্ ঝন্ অসিকে' উন্মোচন ক'রে অত্যাচারের বক্ষে বিঁধিয়ে দেবার স্বপ্ন-কামনা, 'রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে' অধীর উল্লাস—এ সকলই কবিতাটির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের জীবনরূপের সাদৃশ্য দেখিয়ে দেয়।

দৃষ্টান্ত বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই এখানে। আমি সন্তর্পণে এই কথাটি বলতে চাই, গুরুগোবিন্দ কবিতার মধ্যে যে রুদ্রসুর ধ্বনিত হয়েছে, জীবনের প্রচণ্ড গতিশক্তি যেভাবে পাক দিয়ে উঠেছে—তার সঙ্গে গান্ধীজীর শান্তরসাস্পদ শিবমহিমা অপেক্ষা সুভাষচন্দ্রের 'প্রলয় জীবনের' মর্মগত সাদৃশ্যই বেশি।

এ কথার অপর প্রমাণও আছে। রবীন্দ্রনাথ গুরুগোবিন্দকে নিয়ে আর একটি কবিতা লিখেছেন—তার নাম 'শেষ শিক্ষা'। ঐ কবিতার বিষয়বস্তু সুপরিচিত। গুরুগোবিন্দ একদা আকস্মিক রোষে একটি পাঠানকে মেরেছিলেন অন্যায়ভাবে। তারপরে সেই পাঠানের পুত্রকে তিনি পালন করেছিলেন এক বিচিত্র উদ্দেশ্যে—সে যাতে পিতৃহন্তার উপর প্রতিশোধ নিতে পারে। পাঠান বালককে তিনি শিক্ষা দেবার কালে যে-কথা বলেছিলেন তা বিখ্যাত হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যে—'বাঘের বাচ্চারে যদি বাঘ না করিনু, কি শেখানু তারে।' এবং তাঁর শিক্ষাকে তখনই তিনি সফল মনে করেছিলেন যখন সেই 'বাঘের বাচ্চা' তাঁর বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিয়েছিল। মরণাহত গুরু তাকে এই 'শেষ শিক্ষা' দিয়ে গিয়েছিলেন—

"এতদিনে হল তোর বোধ
কী করিয়া অন্যায়ের লয় প্রতিশোধ।"

গুরুগোবিন্দের এই চরিত্রের সঙ্গে গান্ধীজীর চরিত্রের ঐক্য নেই।

সুভাষচন্দ্রের কথা যদি ধরি—তাঁর সংগ্রামী জীবনের একটি দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। তার আগে কবিতায় গুরুর আহ্বানের বিশিষ্ট চিত্রটি উপস্থিত করা যাক কয়েক ছত্রে—

"আয় আয় আয় ডাকিতেছি সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখ সম্পদ মায়া মমতার
বন্ধন যায় টুটে।"

এর সঙ্গে তুলনীয় একটি ঘটনা—যতীন দাস দিবসে নেতাজী বক্তৃতা করছেন সিঙ্গাপুরে—২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪—

"আমার মাতৃভূমি মুক্তি চাইছেন। মুক্তি ছাড়া তিনি বাঁচবেন না। মুক্তির জন্ম চাই বলিদান। তোমার শক্তির, তোমার সম্পদের, তোমার মূল্যবান যা কিছু আছে সে সমস্ত কিছুরই অকুণ্ঠ বলিদান চাই। অতীতের বিপ্লবীদের মতো তোমাদের বলি দিতে হবে তোমাদের সুখকে, স্বাচ্ছন্দ্যকে, আনন্দকে, বিলাসকে, অর্থকে, সম্পদকে। তোমরা তোমাদের সন্তানদের দিয়েছ যুদ্ধের জন্ম ; কিন্তু মুক্তিদেবী তাতেও তৃপ্ত নন ; তাঁকে খুশি করবার রহস্য আমি বলছি : আজ তিনি কেবল যোদ্ধা চাইছেন না, তিনি চাইছেন বিদ্রোহী—নারী-বিদ্রোহী, পুরুষ-বিদ্রোহী—যারা 'মৃত্যুদলে' যোগ দিতে পারে—যাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত—যারা শত্রুকে নিজের দেহের রক্তে স্নান করাবার জন্ম প্রস্তুত থাকবে। 'তুম্ হামকো খুন্ দেও, হাম্ তুমকো আজাদী দুঙ্গা'—তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব—এই হল স্বাধীনতার দাবি।

"শ্রোতাদের মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনি উঠল—আমরা তৈরী—আমরা রক্ত দেব—আমাদের রক্ত নাও।'

"নেতাজী বলে চললেন—শোন, আমি উত্তেজনার সম্মতি চাই না। আমি চাই বিদ্রোহীরা এগিয়ে আসুক—তারা এই 'মৃত্যুদলের' শপথ-পত্রে সই করুক—যার ফলে তারা মুক্তিদেবীর বেদীতে মরণের নিয়োগপত্র পাবে।

"আমরা সই করতে প্রস্তুত—সভার চারিদিক থেকে উত্তর ছুটে এল।

"কিন্তু তোমরা মৃত্যু-পরোয়ানায় সই করতে পারবে না সাধারণ কালিতে। রক্ত দিয়ে তোমাদের লিখতে হবে। যাদের সাহস আছে এগিয়ে

এসো—মাতৃভূমির মুক্তির জন্য তোমরা রক্ত দেবে, তার সাক্ষী থাকব আমি।

"বিরাট জনমণ্ডলী সহসা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য জনমণ্ডলী উদ্বেল হয়ে উঠল।"

"কোথা যাবি ভীরু, গহনে গোপনে
পশিছে কণ্ঠ মোর।
প্রভাতে শুনিয়া আয় আয় আয়
কাজের লোকেরা কাজ ভুলে যায়,
নিশীথে শুনিয়া আয় তোরা আয়
ভেঙে যায় ঘুম ঘোর।"

১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে অস্তগামী রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে দেখতে চেয়েছিলেন দেশনায়করূপে। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে যেন বিধাতার শঙ্খ বেজে উঠেছিল—

"এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।

"হিংস্র দুঃসময়ের পিঠের উপর চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হতে হবে; এই দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পারবে তুমি, এই আশা করে তোমাকে আমাদের যাত্রানেতার পদে আহ্বান করি।"

গুরুগোবিন্দ কবিতায় আছে—

"তুরঙ্গ সম অন্ধ নিয়তি
বন্ধন করি তায়
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন ক'রে
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।"

এতক্ষণ শুধু প্রমাণ দিচ্ছিলাম—দৃষ্টান্তের দ্বারা বোঝাতে চাইছিলাম সুভাষচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে এই কবিতার জীবনের সাদৃশ্য কতখানি। শেষকালে সাদৃশ্যের প্রমাণ দেব অন্যভাবে—এই কবিতার প্রাণকে সুভাষচন্দ্র নিজের প্রাণ রূপে কতখানি অনুভব করেছিলেন—কতখানি করতে চেয়েছিলেন—তারই একটি তথ্যের উল্লেখ ক'রে। এ কবিতা কেবল সুভাষ-জীবনের পূর্বাভাস নয়, তাঁর আত্মদর্শনের কাব্য-দর্পণও বটে। মান্দালয় জেল থেকে বন্দী সুভাষচন্দ্র তাঁর একটি পত্রশেষে লিখছেন—

"অনেক কথা লিখিলাম। এখন শেষ করি। আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কি উত্তর দিব? রবিবাবুর একটি কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। কবির ভাষায় উত্তর দিলে কি ধৃষ্টতা হইবে? কবির এত আদর এইজন্য যে, আমাদের অন্তরের

কথা কবিরা আমাদের অপেক্ষা স্পষ্টতর ও স্ফুটতরভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন। তাই বলি—

'এখনো বিহার কল্পজগতে
জেলখানা (অরণ্য) রাজধানী,
এখনো কেবল নীরব ভাবনা
কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্মবাণী'।"

লক্ষ্য করবার বিষয়, কবির ভাষায় নিজের অন্তরের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র কবিতার ভাষায় হস্তক্ষেপ করেছেন—'অরণ্যের' বদলে করেছেন 'জেলখানা', কাঁটার মুকুট পরে যে-জেলখানার তিনি এখন রাজাধিরাজ। গুরুগোবিন্দ স্বেচ্ছায় সরে গিয়েছিলেন, সুভাষচন্দ্র সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু সেই বাধ্যতামূলক নির্বাসনের 'বাধ্যতা' শব্দটি তিনি এখন ভুলে গিয়েছেন, গুরুগোবিন্দের নির্জন সাধনার পরিবেশ-আশ্রিত মনের সঙ্গে তাঁর পরিবেশ ও মনের এতই ঐক্য। তেমন ঐক্যমূলক দু'একটি ছত্র সুভাষচন্দ্র নিজের মতো করে উদ্ধৃত করেছেন—

"মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে
গড়িতেছি মন আপনার মনে
যোগ্য হতেছি কাজে।"

তাঁর নিজ সাধনার শেষ পরিণতির চিত্র—

"কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব,
'পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগোরে সকল দেশ।"

এই অংশে মোহিতলালও সুভাষচন্দ্রের মতোই রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর নব পুরুষ-সূক্তকে নিখুঁত করবার জন্য 'গুরু' শব্দ বদলে 'নেতা' করে দিয়েছিলেন।

মান্দালয় জেলকে সুভাষচন্দ্র সত্যই যে 'বিজন সাধনার' কাল বলে গ্রহণ করেছিলেন, শুধু তাই নয়, সেই সাধনান্তে বিধাতার ইঙ্গিতে তাঁর কারাদ্বার খুলে যাবে, সেই চেতনার শিখাও যে তাঁর মধ্যে জ্বলছিল, অন্য একটি পত্রাংশে তার প্রমাণ আছে—

" 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি'। যখনই খালাসের কথা কল্পনা করি তখন আনন্দ যত হয়, তার চেয়ে বেশি হয় ভয়। ভয় হয় পাছে প্রস্তুত হতে না হতে কর্তব্যের আহ্বান এসে পৌঁছয়। তখন

মনে হয়, প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত যেন খালাসের কথা না ওঠে। আজ আমি অন্তরে বাহিরে প্রস্তুত নই, তাই কর্তব্যের আহ্বান এসে পৌঁছায় নাই। যেদিন প্রস্তুত হব সেদিন এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে কেহ আটকে রাখতে পারবে না।

"এসব ভাবের কথা ; এর মধ্যে objective truth আছে কিনা জানি না। জেলখানায় থাকতে থাকতে subjective truth এবং objective truth এক হয়ে যায়। ভাব ও স্মৃতি যেন সত্যে পরিণত হয়ে পড়ে।"

জেলখানায় থাকতে থাকতে সুভাষচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের গুরুগোবিন্দ কবিতার বিষয়বস্তু subjective truth হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সুভাষচন্দ্রের স্বীকারোক্তি থেকেই পেলাম। এই subjective truth যে জেলখানার বাইরে objective truth-এ পরিণত হয়েছিল, সুভাষচন্দ্রের জীবনের শেষাংশের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন।

আর বোধ হয় প্রয়োজন নেই—'গুরুগোবিন্দ' কবিতাকে সুভাষচন্দ্রের পুরুষসূক্ত প্রমাণ করার। কিন্তু একই কবিতাকে গান্ধীজীর জীবন সম্বন্ধে এত গভীরভাবে সত্য বলে অনুভব করেছেন কেন ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতো ভাবুক ও পণ্ডিত ব্যক্তি? সহজ উত্তর—জীবনের মহৎ প্রকাশগুলির মধ্যে ঐক্য থাকেই। গান্ধীজীর জীবনাদর্শ ও জীবনরূপের সঙ্গে এই কবিতার বক্তব্যের বস্তুগত অনৈক্য আমরা আগে দেখিয়েছি। তবু ডঃ দাশগুপ্ত যে ঐক্যানুভব করেছেন—তার কারণ আমার মনে হয়—তিনি বস্তুধর্মে নয়, ব্যঞ্জনাধর্মে ঐক্য দেখেছেন। নিজের অসম্পূর্ণ সাধনার ক্ষেত্রে গান্ধীজীর প্রস্থান এবং প্রত্যাবর্তনমাত্রে তাঁর চারিদিকে রোমাঞ্চিত পৃথিবী থেকে সংখ্যাতীত মানবের আবির্ভাবদৃশ্য—ডঃ দাশগুপ্ত এই পরমাশ্চর্য ঘটনার ভিতরের রূপ উদ্‌ঘাটিত দেখেছেন ভিন্ন ভাষায় ও পরিবেশে ঐ কবিতাটির মধ্যে।

সর্বশেষ কথা। স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আমার এই রচনার উদ্দেশ্য। গান্ধীজী বা সুভাষচন্দ্র, কার জীবনের সঙ্গে এই কবিতায় বর্ণিত জীবনের মিল আছে তা দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়। তবু যে বেশ খানিক জায়গা নিয়ে তা করবার চেষ্টা করেছি, তার কারণ, আমি দেখাতে চেয়েছি, বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের দুই শ্রেষ্ঠ মানবকে কিভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রকাশ করেছিল—যখন তাঁরা প্রকাশিত ছিলেন না তখনও। এই হল কবির মহিমা—ঠিক ভাবে বলতে গেলে মহাকবির মহিমা। অনাগত গান্ধীজী বা অনাগত নেতাজীকে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা (এবং অন্য বহু কবিতা) যদি আত্মসাক্ষাতের সুযোগ দিতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে অন্য মহামানবকে সেই সুযোগ দেবে না, এমন কেউ বলতে পারবেন না—বলবেনও না—যদি মানব-অভ্যুদয়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা থাকে।

('শিল্পী সংস্থা' প্রকাশিত স্মারক পত্রিকা, মে, ১৯৬২)

রাজরোষে শান্তিনিকেতন ও অন্য প্রসঙ্গ

॥ ১ ॥

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিরুদ্ধে সরকারী আক্রোশের সমকালীন বিবরণ

দেশ পত্রিকার ৩রা জুলাই, ১৯৬৫, সংখ্যায় শ্রীপুলিনবিহারী সেন টীকাসহ রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠি প্রকাশ করেছেন। তার একটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা—১৩১৮, ২৩ কার্ত্তিক। প্রবাসীর ১৩৪৮ বৈশাখ সংখ্যায় এটি অংশত প্রকাশিত হয়েছিল। এই চিঠির প্রসঙ্গেই আমি আরও কিছু তথ্যযোজনা করছি—রবীন্দ্র-গবেষণায় সেগুলি কাজে লাগবে আশা করে।

আলোচ্য চিঠিটি যে বর্জিত আকারে প্রবাসীতে ১৩৪৮ সালে প্রকাশিত হয়, তার কারণ—রাজনৈতিক। ঐকালে ভারত স্বাধীন নয়, আর রবীন্দ্রনাথের উক্ত পত্রে বিদেশী সরকারের কিছু দৌরাত্ম্যের কথা ছিল। রবীন্দ্রনাথ রীতিমতো কঠোর ভাষাতেই ঐ পত্রে সরকারী আচরণের সমালোচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনার আশু কারণ—চিঠি লেখার সময়ে (১৯১২-র প্রথম দিকে) বঙ্গবিভাগের দ্বারা গঠিত পূর্ববঙ্গ সরকারের ডি-পি-আই-এর একটি সার্কুলার। উক্ত ডি-পি-আই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সরকারী কর্মচারীদের ছেলেদের পাঠাতে কার্যত নিষেধ করে বিজ্ঞপ্তি পাঠান। এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে পড়ে এবং বাংলাদেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ঠিক এই সময়েই রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে আরও কিছু চাঞ্চল্যের কারণ ঘটেছিল। প্রধানত দুটি কারণ যুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর তৎকালীন প্রত্যাহার ও নীরব সাধনার জীবন থেকে পুনশ্চ লোকচক্ষে এসেছেন এবং সরব আলোচনার বিষয় হয়েছেন। প্রথম কারণ, আগেই বলেছি, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সম্বন্ধে সরকারী বিরূপতা, দ্বিতীয় কারণ, রবীন্দ্রনাথের "জুবিলী উৎসব"।

অর্ধশতাব্দীকাল-জীবিত রবীন্দ্রনাথ, এই সময়ে বাংলাদেশের স্বীকৃত প্রধান ব্যক্তিদের অন্যতম। কয়েক বৎসর আগে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ, লেখনীতে ও কণ্ঠে দেশমাতার বন্দনা-সঙ্গীত, তাঁকে জনসাধারণের নিকটবর্তী করে তুলেছিল। অতঃপর, রাজনীতি ত্যাগ করার জন্য তিনি সমালোচিত হয়েছিলেন সত্য, তা হলেও তাঁর অসাধারণ কাব্যখণ্ডগুলি ও বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে কেন্দ্র করে তাঁর নীরব সাধনা—শ্রদ্ধাও সৃষ্টি করেছিল যথেষ্ট। গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হল ১৯১০ সেপ্টেম্বরে। ফলে পূর্বে যিনি ছিলেন কবি, তিনি হয়ে গেলেন কবি-দার্শনিক। নৈবেদ্য রচনা, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সভ্যতার ভাবপূর্ণ ব্যাখ্যা, 'শান্তিনিকেতন উপদেশমালা', এই উপাধির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন ও পরিচালন 'কবি দার্শনিক' কথাটাকে শুধু শব্দে নয়, কর্মেও ঘোষণা করল জনসমাজে।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে একটি 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' স্থাপনের পরিকল্পনা করেন, যা তাঁর অকালমৃত্যুর জন্য (১৩০৬ ভাদ্র) রূপায়িত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ অতঃপর সেখানে "বোর্ডিং-বিদ্যালয়" স্থাপনের ইচ্ছা করেন, যে "বোর্ডিং বিদ্যালয়কে যথার্থ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রূপ দান করিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।" (রবীন্দ্র-জীবনী, ২য়)।

১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠার সময় থেকে আলোচ্য ১৯১১-১৯১২ সাল পর্যন্ত সময়ে এক যুগের ব্যবধান। এই ১২ বৎসরে বহু ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়টি অগ্রসর হয়েছে। "নূতন বিদ্যালয়ে আদর্শের অস্পষ্টতা ও কর্মপ্রণালীর অনির্দিষ্টতার জন্য দৈনন্দিন জীবনে বহু বিরোধ" দেখা যেত। ব্রহ্মবান্ধব অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেছিলেন এবং আরও কেউ-কেউ। রবীন্দ্রনাথকেও ব্যক্তিজীবনে শোকতাপ সহ্য করতে হয়েছিল—তার মধ্যে প্রধান তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু (৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০৯)।

এই এক যুগের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের বড় ঘটনা—স্বদেশী আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ এতে অংশগ্রহণ করেও কিছুদিনের মধ্যে এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদও করেছিলেন, কারণ দেশনেতাদের মত ও পথের দ্বন্দ্ব তাঁর ভাল লাগেনি, এবং তিনি নিতান্ত অপছন্দ করেছিলেন আন্দোলনের বৈপ্লবিক রূপকে। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে তিনি হিংসানীতির উপরে অহিংসনীতির মহিমার কথা ঘোষণা করলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই 'প্রায়শ্চিত্ত' যথেষ্ট মনে হয় নি সরকারের কাছে। তাঁদের পক্ষে নিশ্চয় ভোলা সম্ভব হয়নি—'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের রচয়িতাই বিপ্লব আন্দোলনের স্রষ্টারূপে চিহ্নিত অরবিন্দ ঘোষের উদ্দেশ্যে 'নমস্কার' কবিতা লিখেছিলেন, এবং 'সন্ধ্যা' মেঘের রক্তসূর্য ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর একদা সহকর্মী ছিলেন শান্তিনিকেতনে। কে জানে, সরকারী কর্তৃপক্ষ হয়ত ভেবেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-প্রস্থান ও ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় গঠনের মধ্যে ছদ্মবেশী কোনো বৈপ্লবিক প্রেরণা আছে কি-না! বিশেষত সরকার যখন দেখছিলেন 'ব্রহ্মচর্য' ইত্যাদি ব্যাপারটা বিপ্লবী যুবকদের বোমা-বন্দুকের পিছনে শক্তি যোগাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সত্যই রাজনীতিতে হিংসাত্মক পথ[১] সমর্থন করতেন না। পরবর্তীকালে ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে মতভেদ জানাতে গিয়ে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের ভূমিকায় যা লিখেছিলেন, তাতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে তুমুল আন্দোলন হয়। শুধু ভূমিকায় ব্রহ্মবান্ধব সম্বন্ধে কবি-কৃত কটাক্ষই নয়, উপন্যাসের বিষয়বস্তু পর্যন্ত প্রচণ্ডভাবে সমালোচিত হয়। চার অধ্যায়ের পূর্বে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসেও বিপ্লবী-চরিত্র অঙ্কন নিয়ে নানা কথা ওঠে, এবং এর মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ সম্বন্ধে যে, কোনো কটাক্ষ করা হয়নি, সেকথা কৈফিয়ত রূপে রবীন্দ্রনাথকে জানাতে হয়। [প্রসঙ্গটি 'স্বদেশী আন্দোলন : রবীন্দ্র অরবিন্দ মতদ্বন্দ্ব' প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।]

ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্বন্ধে সরকারী বিরূপতা বাংলা দেশে কী-জাতীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তার আলোচনার পূর্বে এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে শিক্ষিতদের মধ্যে ক্রম-বর্ধমান

সচেতনতার প্রমাণরূপে আমি অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৯১১ সালের ৩০শে নভেম্বরে প্রকাশিত একটি দীর্ঘ বর্ণনা অনুবাদ করে উপস্থিত করছি। বর্ণনাটি 'পত্রিকার জন্য বিশেষভাবে লিখিত'। লেখক—এম-এন-বি। লেখাটি অবশ্যই আদর্শায়িত, এর মধ্যে বিদ্যালয়ের নানা সমস্যার উল্লেখ নেই; কিন্তু একথাও একই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে, আদর্শের রূপায়ণের ক্ষেত্রে সমস্যা বা সংঘাত থাকেই, আর আদর্শ সমস্যার চেয়ে অনেক বড়। রচনাটি এই:

"শহরের কোলাহল ও বিক্ষোভ হইতে দূরে, দিগন্তচুম্বী বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যবর্তী একটি উদ্যানভূমি—সেখানেই শান্তিনিকেতন ও বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম। 'শান্তিনিকেতন' একটি সুন্দর ভবন, পরলোকগত বিখ্যাত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটিকে তাঁহার জীবনসন্ধ্যায় ঈশ্বর-চিন্তার স্থানরূপে নির্মাণ করিয়াছিলেন: আর 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নির্মিত হইয়াছে তাঁহার পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা, যিনি আজ পিতার অপেক্ষা কম খ্যাত নহেন। বাংলাদেশের এই প্রসিদ্ধ কবি-দার্শনিক ও সাহিত্যিক তুরীয় আদর্শবাদী, কিন্তু অবশেষে এখন ইনি নিজের একটি প্রিয় আদর্শ ও তাহার বাস্তব রূপের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছেন। যোগসূত্রটি খুঁজিয়া পাওয়ার পর হইতে তিনি যে-উৎসাহ উদ্যমের সহিত সে-বিষয়ে কাজে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা অত্যন্ত গদ্যস্বভাব কেজো ব্যক্তির পক্ষেও কৃতিত্বের বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যবর্তী প্রাচীরের উপর তাঁহার দৃঢ় অভ্রান্ত হস্তের গাঁইতির আঘাত পড়িয়া তাহাকে চূর্ণ করিয়া আনিয়াছে, এবং ইহার ফলে হয়ত অচিরকালে আমরা কবিদের সম্বন্ধে 'নিষ্কর্মা' 'স্বপ্নবিলাসী' ইত্যাদি যে-সকল 'খ্যাতি' প্রচলিত আছে, তাহার সর্বাত্মক ও স্থায়ী খণ্ডন দেখিতে পাইব।

"প্রতিষ্ঠানটির নাম 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' হইলেও ইহাকে প্রাচীন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও আধুনিক আবাসিক বিদ্যালয়ের যুগোপযোগী সমন্বয় বলা চলে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে, আঙুলে গোনা যায় এমন কয়েকটি ছাত্র লইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা। সূচনার পরীক্ষা-মূলকতার দিন কাটিয়া যাইবার পর স্থির-নিশ্চিত অথচ অনাড়ম্বরভাবে অগ্রসর হইয়া, ইহা এখন এই-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আদর্শ-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। অমার্জিত, অমসৃণ-প্রস্তরখণ্ড এখন মহাশিল্পীর শিক্ষানিপুণ হস্তের ছন্দোময় আঘাতে ক্রমে সংস্কৃত হইয়া নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

"ছাত্রসংখ্যা বর্তমানে ১২৫। সাত হইতে ষোল-র মধ্যে তাহাদের বয়স। তাহাদের শারীরিক, নৈতিক ও জ্ঞানবুদ্ধিগত শিক্ষার কাজে কুড়িজন শিক্ষক নিযুক্ত। এই শিক্ষাদান ব্যাপারে আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে। রাশীকৃত ছাত্রকে একটি খোঁয়াড়ে গাদাগাদি করিয়া ঢুকাইয়া দিয়া তাহাদের উপর শিক্ষাবারি ছিটাইয়া দেওয়া নহে, এখানে (প্রকৃতি প্রতিবন্ধকতা না করিলে) আকাশের নীল ছত্রতলে কিংবা শীতল তরুচ্ছায়াতলে পাঁচ-ছয়জনের

এক-একটি দল লইয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। আত্মনির্ভরতা, চিন্তা ও কার্যে পবিত্রতা, স্বাধীনতাবুদ্ধি, পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি বৃত্তির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই দৈনন্দিন কার্যপ্রণালী নির্ধারিত হইয়াছে। একই সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত চিত্ত-বিকাশের পূর্ণ সুযোগ রহিয়াছে—যেটুকু শাসন রহিয়াছে তাহা অস্বাস্থ্যকর আচরণ রোধ করিবার জন্যই। প্রত্যেক বালককে সকাল পাঁচটায় উঠিয়া প্রথমে বিছানাপত্র ও বাসকক্ষ গোছগাছ করিতে হয়। সাতটার মধ্যে প্রভাতী ব্যায়াম, স্নান, প্রার্থনা ও জলযোগ শেষ। তারপরে তিন ঘণ্টার পাঠ্যানুশীলন। অতঃপর মধ্যাহ্নভোজন ও বিশ্রামের জন্য কয়েক ঘণ্টা সময়। এরপর পুনশ্চ দুই-তিন ঘণ্টা পড়াশোনা। পরে বৈকালী জলযোগ। অতঃপর যথেষ্ট খেলাধুলা ও ব্যায়াম। সন্ধ্যাগমে প্রার্থনা ও ধ্যানাদি। তারপরে ঘরের মধ্যে জুটিয়া অবসরবিনোদন—তৎসহ সঙ্গীত, ম্যাজিক-লণ্ঠনের ছবি দেখা, গল্প বলা ও অভিনয়াদি শিক্ষা—গুরুতর পাঠ ছাড়া সবকিছু। সাড়ে নটা-দশটার মধ্যে নৈশ আহার শেষে শয়ন।

"সারাদিন ও সন্ধ্যার এই সকল কাজের মধ্যে আর যাহাই থাক সামান্যতম চাপ বা শাসন নাই। ফলে বালকেরা যাহা কিছু করে, তাহার মধ্যে উৎসাহ ও ঐকান্তিকতা পূর্ণ থাকে। এ বস্তু, দুঃখের বিষয়, অন্যত্র আমাদের দেশে বিদ্যালয়গামী বালকদের মধ্যে দেখা যায় না।

"শিক্ষকেরা নিষ্ঠাবান, উৎসাহী ও সংস্কৃতিসম্পন্ন। বয়সে তরুণ। ইঁহাদের কেহ-কেহ আমেরিকা ও ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত। শিক্ষাকার্যে ইঁহারা যে কেবল মনপ্রাণ দিয়া খাটিতেছেন, তাই নয়, এই বিদ্যালয়ের মহান আদর্শও ইঁহাদের জীবনে ওতঃপ্রোত।

"এখানকার স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত ও সুসম্পূর্ণ। প্রতিষ্ঠানটি আর্দ্রতাহীন উচ্চ মুক্তভূমিতে অবস্থিত। পয়োনালী-ব্যবস্থা চমৎকার ও স্বাভাবিক। প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্রসহ একটি ঔষধালয়, ও উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসক আছেন। বসবাসের ব্যবস্থাও আশানুরূপ।

"স্বয়ং রবীন্দ্রবাবু মাঝে-মাঝে বালকদের কাছে বিশেষ ভাষণ ও ধর্মোপদেশাদি দেন। তখন ছাত্রগণ মূল উৎসধারা হইতে বারি আহরণের সুযোগ পায়।

"সমস্ত স্থানটি যে, কেবল বিদ্যামন্দিরের পবিত্র সুরভিতে পূর্ণ তাহাই নহে, অধিকন্তু এখানে এমন একটি স্বাভাবিক আলোকময়, প্রাণগন্ধময় আবহাওয়া রহিয়াছে যে, ইহার মধ্যে শ্বাসগ্রহণকারী ও বিচরণকারী সকলেই সতেজ ও উদ্দীপিত হইয়া ওঠে। গ্রন্থকীট বা নিরেট পণ্ডিত সৃষ্টি করা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নয়—ঐরূপ চরিত্র আমাদের দেশে প্রয়োজনের অধিকই রহিয়াছে—তাঁহাদের উদ্দেশ্য বালকদের আভ্যন্তরীণ মনুষ্যত্বের বিকাশ। কর্তৃপক্ষের প্রবর্তিত পদ্ধতিকে যদি সঙ্গত পরিণতির দিকে অগ্রসর করানো যায়, তাহা হইলে নিশ্চিতভাবে 'সুস্থ শরীরে সুস্থ মনের' সৃষ্টি হইবে। এরূপ কয়েকটি 'সৃষ্টির' সহিত বর্তমান পত্রলেখকের ব্যক্তিগত পরিচয় থাকায় উক্ত সিদ্ধান্তের সমীচীনতা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের শহরের বালকদের মধ্যে যে-বস্তুর বৃথা সন্ধান

কৃষি সেই প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনায় এই বালকগণ পরিপূর্ণ। শহরের বালকদের যে অস্বাভাবিক সংকীর্ণ ও বাঁধাধরা পদ্ধতির দাস করা হইয়াছে, তাহাতে ঐরূপ হইবে আর আশ্চর্য কি! সহজ মনস্তাত্ত্বিক নিয়মে ইহা ঘটিতেছে—শিশুশিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলে ইহা স্মরণে রাখিলে ভাল করিবেন। ক্রমোন্মেষমুখী শিশুজীবনকে যদি প্রকৃতির সহিত মুক্ত সংযোগের সুযোগ করিয়া দেওয়া যায়, যদি তাহাদের মনোবেগকে সুস্থ ও সহজ অভিব্যক্তির পথে চালিত করা যায়, তাহাদের নৈতিক ও বুদ্ধিগত বিকাশের উপযোগী করিয়া যদি পরিবেশ রচনা করা যায়, তবেই তাহাদের ভিতরকার সুপ্ত সকল শ্রেষ্ঠ গুণরাশির বিকাশ ঘটানো সম্ভবপর হইবে। অপরপক্ষে যদি তাহাকে কেবল শাসন ও পদ্ধতির বাঁধনে বাঁধিয়া রাখার চেষ্টা করা হয়, সে-ক্ষেত্রে তাহার ব্যক্তিত্বের অঙ্কুরনাশ, তাহার অন্তরস্থ প্রেরণার নমনীয়তানাশ এবং মানবজীবনের সুধা ও সৌরভ-স্বরূপ সকল বস্তুর প্রাণনাশ। এইভাবে মানুষ তৈয়ারী করা যায় না, যদিও এই পদ্ধতিতে অবশ্যই শত-শত চশমাধারী সৃষ্টি করা সম্ভবপর, যাহাদের ভিতর হইতে প্রাণবস্তুকে নিঃশেষে নষ্ট করা হইয়াছে—গর্তে ঢুকিয়া-যাওয়া চক্ষু, হাড়গিলা চেহারা, দৃষ্টিক্ষীণতা, অজীর্ণতা, স্নায়ুদুর্বলতা, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি সহস্রবিধ 'ক্ষীণতা-হীনতা' সহ 'তরুণ বাংলা' নামে আজ যাহারা পরিচিত।...

"অপর পক্ষে শান্তিনিকেতনে আছে প্রাণপ্রদ আদর্শ—ভাবী প্রজন্মের শিক্ষাভার গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের জন্য। তাঁহারা যদি এই আকর্ষণীয় প্রতিষ্ঠানটি দর্শন করেন—তীর্থদর্শন বলাই উচিত—তাহা হইলে নিশ্চিত যথেষ্ট পুরস্কৃত হইবেন। ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলের লুপ লাইনে সুপরিচিত স্টেশন বোলপুর, সেখান হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে শান্তিনিকেতন—কলিকাতা হইতে দূরত্ব একশো মাইলের মতো।

"ইহার প্রতিষ্ঠাতা প্রাচীন পরিত্যক্ত পদ্ধতি এবং বহু-সমালোচিত কৃত্রিম আধুনিক পদ্ধতির মধ্যে (যাহার বিরুদ্ধে আমরা সমালোচনা করি কিন্তু সংস্কারের সাহস বা প্রয়াস দেখাই না) সন্তোষজনক সমন্বয়পন্থা আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি গতানুগতিক পথকে পরিহার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা এমন শ্রী ও সৌন্দর্যের সহিত করিয়াছেন যে, দেখিলে মনে হয়, যথার্থই শিল্পীর কাজ—এবং কে না জানে তিনি যথার্থই শিল্পী। তাঁহার ব্রহ্মচর্যাশ্রম আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়। তিনি স্বপ্ন বা কল্পনার বস্তুকে বাস্তবে রূপ দিতেছেন; নিশ্চয় তাঁহার লক্ষ্য এখনো দূর দিগন্তে; আদর্শকে বাস্তবায়িত করা অপেক্ষা বাস্তবকে আদর্শায়িত করা যে সহজতর তা সহজবোধ্য; কিন্তু ইহাও আমরা জানি—'গতানুগতিকের অতন্দ্র জাগরণ অপেক্ষা প্রতিভার স্বপ্নও অনেক বেশি মূল্যবান।' এই প্রতিষ্ঠান সম্ভাবনায় মহান—আমাদের মধ্যে চিন্তাশীলেরা ইহার অপরিণত স্তরেও সেই বিরাট সম্ভাবনাকে দেখিতে পাইবেন। ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী, ঝির-ঝির করিয়া বহিতে শুরু করে, ক্রমে শক্তিশালী নদীতে পরিণত হয়, যাত্রাপথে আকারে ও বেগে বাড়িতে থাকে, চলিতে-চলিতে দুই পাশের ভূখণ্ডকে উর্বরা ও শস্যশ্যামলা করিয়া তোলে এবং নদীগর্ভের তীক্ষ্ণাগ্র প্রস্তর-

খণ্ডগুলিকে ঘর্ষণবেগে মসৃণ ও উজ্জ্বল আকার দেয়—তেমন পরিণতি এই প্রতিষ্ঠানেরও একদিন ঘটিতে পারে।"

॥ ২ ॥

পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তিতে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা

অমৃতবাজারে এই লেখাটি যখন প্রকাশিত হল (১৯১১ নভেম্বর), তার পূর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ও বন্ধুগোষ্ঠী তাঁর পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় তাঁকে সাধারণ সংবর্ধনা দেবার উদ্যোগ শুরু করেছিলেন। কিছুসংখ্যক রবীন্দ্র-বিরোধী এই অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেন। তাঁদের অশোভন বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ আহত হন। এ ব্যাপারে তিনি সংবর্ধনার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখেন— "আমি আত্মসম্মানের জন্য লোলুপ হইয়াছি···এই নিন্দাটিকেও নতশিরে গ্রহণ করিয়া আমার এক-পঞ্চাশৎ বৎসরের জীবনকে আরম্ভ করিলাম।"

এই সমস্ত নিন্দাই নিমজ্জিত হয়েছিল এক বিপুল বন্দনায়। যদি এক্ষেত্রে আমরা, বাঙালীর নিন্দা করবার শক্তির পাশে শ্রদ্ধা করবার শক্তি না দেখি, তাহলে অযথা আত্মনিন্দা করব। প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষে সাধারণের উৎসাহের যথেষ্ট বর্ণনা করা হয়েছিল এবং 'রবীন্দ্র জীবনী' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে তার সবিস্তার উল্লেখও আছে। আমরা এখন আরও দু'-একটি উল্লেখযোগ্য বর্ণনা উদ্ধৃত করব—তার পূর্বে কবির এই জন্মোৎসবে সাধারণ ভাবাবেগের একটি 'রাজনৈতিক' কারণ জানানোর প্রয়োজন বোধ করি। টাউন হলে জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২৮ জানুয়ারি, ১৯১২। এর ঠিক দুদিন আগে ২৬ জানুয়ারি বেঙ্গলী কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে "The Bolepur Brahmacharyasram and the D.P.I., New Province' নাম দিয়ে যে লেখাটি প্রকাশিত হয়, তার ভিতরেই পুলিনবাবু কর্তৃক উদ্ধৃত পূর্বোক্ত সার্কুলারটি ছিল। বেঙ্গলীতে এই ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করা হয় সবশেষে—

"The circular speaks for itself. It shows that the mortification of the partition has not come a day too soon."

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব এই বৎসর অতীব উৎসাহে সম্পন্ন হত সন্দেহ নেই; কিন্তু যাঁরা তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ও বাঙালীর মনোভাব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তাঁরাই বুঝবেন—সরকারী শাসনের লক্ষ্য হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—এই সংবাদ রবীন্দ্রনাথের প্রতি সাধারণের আবেগকে তৎক্ষণাৎ কী পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে পারে।

বেঙ্গলী কাগজের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উদারনৈতিক, সাহিত্যে অনুরাগী, (স্বভাবতই, কেননা তিনি অধ্যাপক।), তাঁর কাগজে রাজনৈতিক ঘটনার পাশে সাংস্কৃতিক ঘটনাদি সম্মানের ঠাঁই করে নিত। মানসিক উদারতার জন্য, এবং সম্ভবত রাজনৈতিক বিবেচনাবুদ্ধিতে, তিনি সাংস্কৃতিক সংবাদ পরিবেশনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা

করতেন। সে নিরপেক্ষতাকে একালের রাজনৈতিক ভাষায় 'সক্রিয় নিরপেক্ষতা' বলা যায়, অর্থাৎ তিনি উৎসাহযোগ্য বিষয়ে সঙ্গত উৎসাহ দেখাতেন। তাঁর কাগজে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের তিন কলমব্যাপী সুদীর্ঘ রিপোর্ট প্রকাশিত হল (২৯ জানুয়ারি ১৯১২) এবং সম্পাদকীয়ও লিখিত হল কয়েকদিন পরে (৩১ জানুয়ারি)।[২]

বেঙ্গলীর উল্লেখযোগ্য সম্পাদকীয়টি উদ্ধৃত করা যাক—

HONOURING RABINDRANATH

At the instance of the Sahitya Parishad a public meeting was held at the Town Hall on Sunday afternoon to congratulate Babu Rabindranath Tagore on having completed his fiftieth birthday. The meeting was fully representative and included many of our most prominent public men. This was the first time that such a meeting had been held, and the fact that the meeting was an unqualified success from every point of view is evidence not only of the popularity which Babu Rabindranath deservedly enjoys as a poet and a man of letters, but of the growing recognition on the part of our people of the importance of literature as an organ of national life. There is absolutely no doubt that the power of Bengali language has gone on increasing steadily in recent years. The growing power of the language and literature of the Province is in part the result of a wider diffusion of education, but it is also due to the strenuous efforts made by our literary men themselves to render important and valuable service to the country and the cause of progress, through the medium of literature. Bengali, as we know it today, is a very different language to what it was in the days of Iswar Chandra Gupta. It is a matter of common knowledge that some of the earliest products of English education took a delight in making an open exhibition of his contempt for the language of the country. But it is very different with the educated men of the present day. The language in which Bankim wrote is not a language that can be despaired by any son of Bengal, however, great may be his affectation of culture. And Rabindranath is today by common consent the foremost among those who use Bengali as the medium of their thought. In honouring Rabindranath, Calcutta and Bengal

are honouring their mother language and paying a well-deserved homage to its growing power and usefulness in the scheme of national life. In the case of Babu Rabindranath, there is special appropriateness in the honour thus conferred upon him by his countrymen. He has been not only a life-long devotee in the cause of the Bengali language and literature, but has rendered conspicous service, by means of his writings, to the cause of the new movement of national self-help and self-reliance, of which he was undoubtedly one of the pioneers. In honouring such a man modern Bengal honours itself."

বেঙ্গলী এই জন্মোৎসবের যে দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশ করে, তার মধ্যে সভার চেহারা, জনগণের উদ্দীপনা, মানপত্র, সংবর্ধনা-ভাষণ এবং কবির প্রতিভাষণ প্রভৃতি ছিল। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের লম্বা তালিকাও তার মধ্যে দেখা যায়। এই বিবরণটির যে ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তা এর শিরোনামা থেকেই স্পষ্ট :

Rabindranath Honoured

Red Letter Day in Bengali Literature

রবীন্দ্রনাথের সেই প্রথম প্রকাশ্য জন-সংবর্ধনা যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'রেড লেটার ডে' তাতে কে সন্দেহ করবে। আমি বিবরণের প্রথম অংশটি অনুবাদ করে দিচ্ছি :

"গত রবিবার অপরাহ্নে সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে টাউন হলে যে-সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অদ্বিতীয় ঘটনা বলা চলে। শিশু বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, বণিক, দোকানদার, উকিল, সাংবাদিক, স্কুল কলেজের ছাত্র নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর বাঙালী—কবিসাহিত্যিক সমেত লেখকগোষ্ঠী তো আছেনই—কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁহার পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে অভিনন্দন জানাইতে হাজারে-হাজারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সংবর্ধনার মধ্যে সেই মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি মুক্ত শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ঐ শ্রদ্ধা ও ভাবাবেগ তিনি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সামাজিক রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কোনো কিছুর সম্পর্ক ছিল না, যদিও কবির উদ্দেশ্যে যে-প্রেম, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাকে ধর্মীয় ভাবাবেগের সমতুলই বলা চলে—তাহা হইলেও জনসমাগম এমনই বিপুল হইয়াছিল যে, টাউন হলের সভা-সমিতিতে নিয়মিত গতায়াতকারী যে-কেউ সবিস্ময়ে ভাবিতে পারেন—

সা-হি-ত্য-স-ভা-য় এত লোক !! পুরানো দিনের কোনো সাংবাদিক, ধরা যাক স্বর্গত পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, সূক্ষ্ম শরীরে যদি এই সভাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, নিশ্চয় উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ভাবিতেন, এই ধরনের এক সভায় দোকানদার হাজির কেন, যে-দোকানদার তাঁহার কালে হয় একেবারে নিরক্ষর, নয় বানান করিয়া করিয়া তবে বাংলা বই পড়িতে সমর্থ ছিল ! শুধু তাই নয়, প্রচণ্ড ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলিতে প্রায় দমবন্ধ অবস্থায় ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়াও সভার শেষ পর্যন্ত তাহারা অপেক্ষা করিতেছে !!! সত্যই এই অনুষ্ঠান একটি নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিল । এই প্রদেশের 'সাহিত্যানুরাগীরা' আজ আর অঙ্গুলি-গণনীয় রহিলেন না । সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রতি ভালবাসা, মাতৃভাষার প্রতি প্রবল প্রীতি, আজ চটকল, কাপড়ের দোকান, ডাক্তারের ডিসপেনশারি, পণ্ডিতের টোল, এমন কি বাজারের সবজির দোকানের ভিতরে পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে । সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যেখানে অ-সাহিত্যিক সাধারণ মানুষের মনের রাজা, সেখানে যে তিনি কবি সাহিত্যিকদের পরম প্রভু তাহাতে সন্দেহ কি ! বয়সে মধ্যাহ্নগগন অতিক্রম করিলেও প্রতিভার মধ্যাহ্নদীপ্তি এই 'রবি'র এখনো বর্তমান আছে । তাঁহার উজ্জ্বল কিরণরেখা এমন-কি 'পর্দা' পর্যন্ত ভেদ করিয়া অন্তরালবর্তিনীদের আলোকিত করিয়াছে । মনুষ্যজাতির রুক্ষতর অংশের মতোই সুন্দরতর অংশের উপরও তাঁহার নিঃসন্দেহ প্রভাব । এই 'সুন্দরতর' অংশের উপর তাঁহার এমনই আধিপত্য যে, কবিকে শ্রদ্ধা জানাইতে নারীগণ বহু সংখ্যায় সভায় হাজির হইয়াছিলেন ।"

কবি-সংবর্ধনার এই ভাবোচ্ছ্বাসময় বর্ণনা হাজির করার পরে আমি বিনীতভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, একথা সত্য, বাংলা দেশে রবীন্দ্র-বিরোধিতা যথেষ্ট ছিল[৩], কিন্তু একথাও সত্য, রবীন্দ্রনাথ জনগণের শ্রদ্ধাভক্তি অল্প পান নি । এই কথাটি পরোক্ষে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন জন্মোৎসব-সভার সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় :

"বাবু সারদাচরণ মিত্র, যিনি সভায় সভাপতিত্ব করেন, একটি ক্ষুদ্র অথচ পরিচ্ছন্ন ভাষণে সেই সন্ধ্যার মান্য অতিথিকে উপস্থিত করেন । তিনি বলেন, প্রাচীনকালে কবিরা স্বদেশে কখনই সম্মান পান নাই । অন্ধ হোমারকে ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল, মিল্টনের দিন দুঃখে কাটিয়াছে, দান্তে নির্বাসিত হন । ইংলণ্ডে কবিদের একই ভাগ্য । কিন্তু ভারতে কবিরা কখনই অবজ্ঞাত হন নাই । দুঃখের বিষয়, হেমচন্দ্রের ব্যাপারে এদেশে যথাযথ কর্তব্যপালন করা হয় নাই ।"

জন্মোৎসব সভার ব্যাপারে জনগণের এই উৎসাহ অন্যান্য সংবাদপত্রকেও স্পর্শ করে । অমৃতবাজার পত্রিকায় ৫ ফেব্রুয়ারি সাহিত্য পরিষদ ভবনে রবীন্দ্রনাথের সান্ধ্য সংবর্ধনার একটি চমৎকার নাতিদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয় । সেটি উদ্ধৃতির আর প্রয়োজন নেই ।

॥ ৩ ॥

সরকারী আক্রোশ সম্বন্ধে বিদেশী পর্যটকের সাক্ষ্য

আদি প্রসঙ্গে ফেরা যাক। রবীন্দ্রনাথ যখন জনগণের দ্বারা এইভাবে সংবর্ধিত হচ্ছেন, তখনি তাঁর বিদ্যালয়ের উপর সরকারী সতর্কবাণী উচিয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি সাধারণের প্রীতি সরকারী রোষকে নিশ্চয় কমায় নি, হয়ত বাড়িয়েছিল। এ ব্যাপারে অমৃতবাজারেই ২১ ফেব্রুয়ারি মায়রন ফেলপস্ নামক জনৈক বিদেশীর একটি দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়। ইনি জাতিতে আমেরিকান, ভারত-প্রেমিক, এবং আমার যতদূর স্মরণ হয়, ইনি আমেরিকায় একবার স্বামী বিবেকানন্দকে আতিথ্য দিয়েছিলেন।[৪] 'রবীন্দ্র জীবনীতে' আছে, মায়রন ফেলপস্ "আশ্রমের একটি বর্ণনা সমসাময়িক বিলাতী কাগজে প্রকাশ করেন।" সে কথা সত্য হতে পারে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তিনি অমৃত-বাজারেও শান্তিনিকেতনের বর্ণনাসহ একটি দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করেছিলেন।

পত্রটির গুরুত্ব যথেষ্ট। এর মধ্যে সমকালে শিক্ষার ব্যাপারে সরকারী খবরদারির চেহারা ফুটেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতবাসী যেখানেই আত্মনির্ভরতা ও মর্যাদাবোধ দেখিয়েছে, সেখানেই সরকারের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ধাওয়া করেছিল। পত্রের প্রথম দিকে পত্র-লেখক বিশেষ নম্রতা ও সাবধানতার সঙ্গে শিক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন :

"কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আমি যখন পূর্ববঙ্গে ছিলাম, তখন শুনি, ঐ প্রদেশের শিক্ষাধিকারিক, মিঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদ্যালয়কে 'সরকারী কর্মচারীদের শিক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই সংবাদে বিশেষ উদ্বেগ বোধ করিতেছি। আমার বিশ্বাস, অন্তত আমি বিশ্বাস করিতে চাই যে, শিক্ষাধিকারিকের এইরূপ কার্য ভুল বোঝাবুঝির ফলেই ঘটিয়াছে। এই বিশ্বাসের জন্যই, আমি আপনাদের দেশে কেবল একজন পর্যটক হওয়া সত্বেও, নিতান্ত স্থানীয় একটি ব্যাপারে নাক গলাইতেছি। মাত্র একমাস পূর্বে আমি বোলপুর বিদ্যালয়টি দর্শন করি। সেই দর্শনের ফলে আমি বিদ্যালয়টির মধ্যে সমাদরের এত কিছু জিনিস দেখিয়াছি যে, ইহার ক্রমোন্নতি দর্শনে আমার প্রভূত আগ্রহ জন্মিয়াছে এবং এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনে আমার পক্ষে যদি কিছু করা সম্ভব হয়, তাহা করিতে ঔৎসুক্যবোধ করিতেছি। গত দেড় বৎসরে আমি ভারতের নানা স্থানে প্রধান বিদ্যালয়গুলি দেখিতে সচেষ্ট ছিলাম, এবং আমি বলিতে পারি, এই বিদ্যালয়টি সুন্দরতম প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম।

"বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে অনুসন্ধানকালে অন্য একটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে মোটামুটি ভালভাবে পরিচিত হই। শুনিলাম, সেখানেও শান্তিনিকেতনের তুল্য ব্যাপার ঘটিয়াছে। উক্ত বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ঈর্ষাপ্রণোদিত মিথ্যা সংবাদ পাঠানো হয়, এবং সরকারী কর্তারা (তাঁহাদের সদভিপ্রায়ে সন্দেহের কারণ নাই) সত্য নির্ণয়ের বিশ্বস্তসূত্রের অভাবে ঐ বিবরণকেই যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করেন। অল্পদিন পূর্বে আমি হরিদ্বারে ছিলাম। সেখানেও শুনি, 'গুরুকুল' বিদ্যাশ্রমের চরিত্রকে মিথ্যা কলঙ্কিত করার

চেষ্টায় ক্রীশ্চান মিশনারীরা ও মুসলমান গোয়েন্দারা যথেষ্ট সাফল্যলাভ করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে ওই জেলার জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিষ্ঠানটি দর্শন করিবার কালে বিষয়টি সম্বন্ধে খোলাখুলি কথাবার্তা বলেন। তিনি বলেন, তাঁহাকে বোঝান হইয়াছিল যে, স্কুল-ব্যাপারটা বাহিরের ছল, সামরিক কুচকাওয়াজেই অধিকাংশ সময় ও মনোযোগ ব্যয়িত হয়। কতকগুলি বালকের মাংসপেশী টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া সেগুলি অস্বাভাবিক-ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত নয় দেখিবার পরেই তিনি এই কথা স্বীকার করেন।

"উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট যে-জাতীয় সংবাদসূত্র হইতে সংবাদ পাইয়াছিলেন, নিশ্চয় সেইরূপ সূত্র হইতেই সংবাদ পাইয়া জনৈক ইংরাজ রাজকর্মচারী অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া গুরুকুলের দাবির বিরুদ্ধে বিশেষ জোরের সঙ্গে তাঁহার বক্তব্য আমাকে বলেন। তিনি জানান যে, রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরূপে সুপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও অজিত সিংকে এই প্রতিষ্ঠানে বারবার আসিতে দেওয়া হইয়াছে। এই বক্তব্যের সত্যতা বিষয়ে আমি বিশেষ অনুসন্ধান করি। দেখিতে পাই, অজিত সিং মাত্র একবার গুরুকুলে গিয়াছেন, তাও যখন সহস্র-সহস্র দর্শনার্থীর আগমন হয় এমন এক সাধারণ উৎসবানুষ্ঠানের সময়ে। অনুষ্ঠানে তিনি বক্তৃতা করার চেষ্টা করেন; ফলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সে স্থান ত্যাগ করিতে বলা হয়। নিঃসন্দেহে এই বিবরণ সত্য, সরকারী ও বেসরকারী উভয় মহল হইতেই আমি জানিয়াছি। আমি ইহাও বিশ্বাস করি, যে-ইংরাজ ভদ্রলোক আমার কাছে ভুল কথা বলিয়াছিলেন, গুরুকুলের সম্বন্ধে অবিচার করার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মনোভাবও তাই। তিনি সত্যের খাতিরে ব্যাপারটি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই দুইটি দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরার কারণ, আমি দেখাইতে চাই, সদভিপ্রায় থাকিলেও এসব ক্ষেত্রে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া কতই সহজ, এবং ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ তদন্ত কতই প্রয়োজন। ব্যক্তিগত তদন্ত ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য সিদ্ধান্ত অসম্ভব।

"নিঃসন্দেহে অনুরূপ চক্র বোলপুর বিদ্যালয়কে ধ্বংস করিতে সক্রিয়। বোলপুরে অবস্থানকালে আমাকে সত্যই জানানো হয়, বেশ কয়েকবার পুলিসের চর ছদ্মপরিচয়ে বিদ্যালয়ের ভিতরের ব্যবস্থা জানিবার চেষ্টা করিয়াছে; একজন গুপ্তচর শিক্ষকরূপে বিদ্যালয়ে প্রবেশ পর্যন্ত করে, যদিও অল্পকালের মধ্যে তা ধরা পড়ে ও তাহাকে বিদায় দেওয়া হয়। পুলিসের গুপ্ত সন্ধান এখানে নিয়মিত ব্যাপার, তাহাও শুনিয়াছি।"

ম্যাগ্নরন ফেলপস্ অতঃপর তাঁর বোলপুর পরিদর্শন ও অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। সে বিবরণ অমৃতবাজারের অপর পত্রলেখকের বিবরণের অনুরূপ। মিঃ ফেলপস্-এর লেখায় একটি চমৎকার জিনিস আছে—রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার মনোহর কথাচিত্র :

"কলিকাতায় থাকাকালে প্রেসিডেন্সি কলেজের এম-এস-সি ক্লাসের জনৈক ছাত্রের মুখে বিদ্যালয়টির বর্ণনা শুনিয়া আমার বোলপুরে যাওয়ার ইচ্ছা হয়। উক্ত ছাত্রটি বোলপুরে কয়েক বৎসর ছিলেন। তিনি বলেন, সেখানে ছাত্রগণ শিক্ষকদের অতি ঘনিষ্ঠ

সাহচর্যের সুযোগ পায়। এই শিক্ষকসঙ্গের দ্বারা তাহারা কীভাবে উপকৃত হয় তাহা বলিয়া বোঝানো যায় না। বিদ্যালয়, তাহার শিক্ষকগণ, এবং মিঃ ঠাকুরের প্রতি বালকদের আকর্ষণের কথাও তিনি জানান। মিঃ ঠাকুর অধিকাংশ সময় বিদ্যালয়েই কাটান। তিনি ছাত্রদের কাছে আধ্যাত্মিক প্রেরণার বৃহৎ উৎস। এক কথায় সেখানে ছাত্র ও শিক্ষক সকলেরই মূল উদ্দেশ্য, উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবে নিয়ন্ত্রিত আদর্শজীবন যাপন করা।

"বোলপুর বিদ্যালয়ের যে-সকল ব্যবস্থার কথা শুনিলাম, সেগুলি যথার্থ উপযোগী বিদ্যালয় গঠনের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় কয়েকটি শর্ত। এইসব জিনিস ভারতবর্ষে আমার দেখা বিদ্যালয়সমূহে শোচনীয়ভাবে অনুপস্থিত বলিয়া—যে-ত্রুটির কথা তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে আমার কাছে স্বীকার করিয়াছেন—আমি বোলপুর বিদ্যালয়ের বিবরণে বিশেষ প্রভাবিত হইলাম ও শীঘ্রই যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলাম।

"বিদ্যালয়ে এখন ছাত্রসংখ্যা ১৮৬, পাঁচ বৎসর পূর্বে ছিল ৩০, এগারো বৎসর পূর্বে মাত্র ৫। পৌঁছিবার পরদিন সকাল সাতটার সময় আমি প্রথম যে-কার্যে যোগ দিলাম তাহা মন্দিরে প্রার্থনাসভা। মন্দিরটি সাদা ও রঙিন কাঁচে নির্মিত, বিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ বৃক্ষরাজির মধ্যে অবস্থিত। নানা রঙের জামা-পরা বালকগণ ভিতরের মর্মর মেঝে পূর্ণ করিয়া দরজা পর্যন্ত ভিড় করিয়া আছে। উজ্জ্বল সূর্যালোক মন্দিরের স্বচ্ছ প্রাচীর এবং ঘনরঞ্জিত প্যানেল ভেদ করিয়া ভিতরে বিচ্ছুরিত। এক প্রান্তে মিঃ ঠাকুর দণ্ডায়মান। গভীর সুরে যখন তিনি ছাত্রদের নিকট ভাষণ দিতেছিলেন, তখন সেই আলোকে তাঁহার সুন্দর মুখচ্ছবি প্রদীপ্ত ও প্রেরণাপূর্ণ বোধ হইতেছিল।

"তাঁহার ভাষণের পূর্বে ছাত্রগণ সমবেত কণ্ঠে উপনিষদ হইতে কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করিল। তাহার একটিতে তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদের পিতা, তাহা আমাদের জানিতে দাও; তোমাকে যেন নমস্কার করিতে পারি।'

"এই মন্ত্রটিকে মিঃ ঠাকুর তাঁহার আলোচনার বিষয় করিলেন। 'ঈশ্বরকে পিতারূপে দেখিতে হইবে, বাহির হইতে ভাসাভাসা দেখিলে চলিবে না। আমাদের মর্ত্যের পিতার নিকট যেরূপ যাই, সেই ভাবেই সেই যথার্থ পিতার নিকট যাইতে হইবে।' এই বক্তব্যটি দৃষ্টান্তসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিলেন।

"মিঃ ঠাকুর যখন বলিতেছিলেন, আমি ভাবিলাম, তিনি বুঝি কোনো প্রার্থনা উচ্চারণ করিতেছেন, কারণ তিনি নিমীলিত নেত্রে বলিতেছিলেন। পরে শুনিলাম, ইহাই তাঁহার অভ্যাস—নিশ্চয়ই তিনি মনঃসংযোগ দৃঢ় করিবার জন্যই এমন করেন। বিনা প্রস্তুতিতে তিনি ভাষণ দেন—তৎকালীন প্রেরণা অনুযায়ী। তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল বাণীপ্রবাহ বহিতে থাকে। এত দ্রুত তিনি বলিতেছিলেন যে, বাংলা না বোঝার জন্য তখন আমার মনে হইয়াছিল, তিনি বুঝি পরিচিত কোনো স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। প্রায়শ কোনো শব্দ বা বাক্য গানের ধুয়ার মত পুনরুচ্চারিত হইতেছিল।"

এর পরেই এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে রাজনীতি-সম্পর্কের কথা এসে পড়ল এবং মিঃ ফেলপস্ সে বিষয়টি নিয়ে আরও অনেকখানি লিখলেন। আমি সেই অংশটি তুলে ধরে এই প্রবন্ধ শেষ করছি :

"প্রথম দিন সকালেই একটি ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—একটি বালকের ক্রন্দন। ক্রন্দনের কারণ, তাহার পিতা পূর্ববঙ্গের জনৈক রাজকর্মচারী, সদ্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, বালকটিকে চলিয়া যাইতে হইবে। শুনিলাম, উক্ত প্রদেশের কিছু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি কোনো কারণে এই বিদ্যালয়ের কুৎসা করিতেছেন, এবং কিছু ছাত্রকে সরাইয়া লওয়াও হইয়াছে। কিন্তু কি কারণে? আমি অনুসন্ধানের চেষ্টা করিয়াও কোনো কারণের কথা জানিতে পারিলাম না। মিঃ ঠাকুর আমাকে বলিলেন, 'রাজনৈতিক কারণে আমাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোনো হেতুই থাকিতে পারে না, যেহেতু আমরা রাজনীতিকে সম্পূর্ণ দূরে সরাইয়া রাখিয়াছি।'

"যাঁহারা মিঃ ঠাকুরকে জানেন, তাঁহাদের কাছে তাঁহার মুখের কথাই শেষ কথা, এবং আমি ধরিয়া লইতে পারি, বাংলা দেশে তাঁহার অপেক্ষা অধিক পরিচিত মানুষ আর কেহ নাই। এমন-কি তাঁহাকে জানেন না, এমন কেহ যদি বিদ্যালয়ে গমন করিয়া শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিত হন, এবং সেখানকার আবহাওয়া অনুভব করেন, তিনিই বুঝিবেন, উক্ত অভিযোগ কিরূপ উদ্ভট। শিক্ষকগণ যথার্থই শিক্ষাব্রতী, তাঁহাদের দায়িত্বজ্ঞান সুগভীর, ছাত্রদের মধ্যে আদর্শ-জীবন সঞ্চারিত করিতে তাঁহারা আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক, অন্য কোনো বিষয়ে তাঁহাদের চিন্তা নাই। অনেকেই এই কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। বিনিময়ে এখানে তাঁহারা যাহা পাইতেছেন, তাহা তাঁহাদের যথার্থ প্রাপ্যের অংশ মাত্র। ইঁহাদের রাজনৈতিক আন্দোলনকারী বলার অর্থ সহজ বুদ্ধির উপর অত্যাচার করা, বিশেষত বর্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক কার্যকলাপ যখন তাঁহাদের জীবনের অবলম্বনস্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানটিকে সুনিশ্চিত নষ্ট করিয়া দিবে।

"বোলপুর পরিদর্শনের পরে নিতান্ত ঘোলাটে বুদ্ধিই ঐ প্রতিষ্ঠানের উপর রাজনৈতিক অভিসন্ধি আরোপ করিতে পারে। আমি চমৎকৃত হইয়া ভাবিতেছি, কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত না করিয়া এইরূপ গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর! যদি তিনি ব্যক্তিগতভাবে তদন্তে আসিতেন, তবে তাঁহার সন্দেহ নিশ্চয় মুহূর্তমধ্যে উড়িয়া যাইত। হরিদ্বার ও অন্যান্য স্থানের মতোই এখানকার ব্যাপারেও দেখিলাম, পদস্থ মহলে বিনা তদন্তে যথেষ্ট অভিযোগ ও হৃদয়দহন বর্তমান। এইসকল বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যে-কোনো সংখ্যায় রাজকর্মচারীকে অভ্যর্থনা জানাইয়া তাঁহাদের সামনে বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় সবকিছুকে হাজির করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহার সুযোগ না লইয়া কয়েকশত মাইল দূর হইতে ধারণা করা বা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

"মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝির এই জাতীয় দৃষ্টান্ত এই দেশে সাধারণ ব্যাপার, ইহার

ফল অতীব মন্দ হয়। অপরপক্ষে প্রত্যক্ষভাবে সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করিলে অনেক জিনিসই তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার হইয়া যায় :

"আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। সেটি আরও চমকপ্রদ। পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্ত ঘটনাটি প্রকাশিত হওয়া উচিত। ঘটনাটি আমাকে যিনি বলেন তিনি আমার দেখা মহত্তম মানুষের একজন। তাঁহার আত্মত্যাগ অতুলনীয়, এবং তিনি শিক্ষাপ্রসারের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া অনন্যমন হইয়া পরিশ্রম করিতেছেন—তাই তাঁহার বক্তব্য বড়ই বেদনাদায়ক। সরকার যে তাঁহার প্রতিষ্ঠানটিকে সুচক্ষে দেখেন না তাহা তিনি জানেন। তিনি নিশ্চিত সূত্র হইতে শুনিয়াছেন যে, দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতিষ্ঠানকে রাজদ্রোহ ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপের শিক্ষাকেন্দ্র মনে করেন। অথচ এখানে কিছুমাত্র অন্যায় কর্ম ঘটে নাই। সুতরাং তিনি সরকারের প্রধান দপ্তরে হাজির হইলেন—যদি ভুল বোঝার অবসান ঘটাইতে পারেন। যখন তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, তখন তাঁহারা সকলেই বলিলেন, তাঁহার বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কোনই অভিযোগ নাই, সেখানে সব কিছুই সন্তোষজনক।

"আমি আর যাইব না,' তিনি আমাকে বলিলেন, 'বৃথা যাতায়াত। উহারা আমাদের কাছে মন খুলিবে না। আমাদের কাছে সোজা কথা বলায় উহাদের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই। উহারা আমাদের কোনো সুযোগ দিবে না। যদি উহাদের কাছে কিছু বলিতে যাই, উহারা মনে করে, আমাদের পেটে কিছু মতলব আছে, তাই ঠকাইতে গিয়াছি, এবং কোনোমতেই কিছু পরিষ্কার করিয়া বলিতে দিবে না। আর যদি আমরা না যাই, উহারা বলে, আমরা গর্বিত ও উদ্ধত। না, আর যাইব না।'

"অপরপক্ষে [পূর্বোক্ত শান্তিনিকেতন] বিদ্যালয় ত্যাগের সম্ভাবনায় বালকের অশ্রুপাতের ঘটনাটি ওই বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠত্বের সামান্য ঘোষণা নহে। শুনিলাম, ইহা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। অনেক ছাত্র ছুটির সময়ে বাড়ি যাওয়া অপেক্ষা বোলপুরে থাকাই পছন্দ করে। আর যদি তাহারা বাড়ি যায়, ছুটি শেষ হইবার পূর্বে ফিরিয়া আসে। প্রাক্তন ছাত্ররা সাধারণত ছুটি কাটাইতে এখানে আসেন। আমি তেমন জন-ছয়েক প্রাক্তন ছাত্রকে সেখানে দেখিয়াছি।

"মিঃ ঠাকুর আমাকে বলিলেন, 'ছাত্ররা অবিলম্বে এই বিদ্যালয়কে ভালবাসিতে শুরু করে। তাহারা এখানে সুখী। তাহাদের যে সুখী করিতে পারিয়াছি, তাহাই আমার জীবনের সর্বোত্তম কীর্তি। সারা দেশে এই একটিমাত্র বিদ্যালয়েই তাহারা সুখ বোধ করে। বিদ্যালয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বোধ হয় সারা দেশে ছাত্রদের সুখের স্থান মাত্র এখানেই। তাহারা গৃহে সুখ পায় না, একেবারেই নয়। তাহারা এখানে সুখী, কারণ তাহারা এখানে স্বাধীন।"

"ভারতবর্ষে আমার দেখা যথার্থ প্রশংসনীয় বিদ্যালয়সমূহের অন্যতম এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে জনৈক বিদ্যালয়-পরিদর্শকের লিখিত মন্তব্য আমার মনে পড়িতেছে : 'ছাত্রগণ

তাহাদের শিক্ষকদের ভালবাসে। তাহারা প্রভাতে সাগ্রহে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, সন্ধ্যায় বিদ্যালয় ত্যাগ করে অনিচ্ছায়।'

"কোনো বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার উৎকর্ষের পক্ষে ছাত্রদের বিদ্যালয়প্রীতি অপেক্ষা আর কোন্ প্রশংসাপত্র সম্ভবপর? এই প্রীতি না থাকিলে চরিত্রের উপর শিক্ষার কোনো প্রভাবই থাকে না, এবং মন শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ কার্যে উদ্দীপনা বোধ করে না।" [অনূদিত]

(দেশ পত্রিকায় ৭ আগস্ট ১৯৬৫ সংখ্যায় 'শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ' নামে প্রকাশিত)

পাদটীকা

১. স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপারে 'হিংসাত্মক পন্থা' কথাটি বর্তমান লেখকের বিশেষ অপছন্দ। প্রচলিত শব্দ হিসেবেই ওটি ব্যবহৃত হয়েছে। হওয়া উচিত 'সশস্ত্র পন্থা', যা সময় বা সুযোগ অনুযায়ী কখনো প্রকাশ্য, কখনো গোপন।

২. অমৃতবাজার পত্রিকা ২৯ জানুয়ারি তারিখে জন্মোৎসব সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করে।

৩. কিছু বিরোধিতা সঙ্গত না হোক, স্বাভাবিক। রবীন্দ্র-বিরোধিতার অন্যান্য কারণের কথা বাদ দিয়ে একটি কারণের উল্লেখ করা যায়। বাংলা দেশে তখন বিপ্লবীদের প্রতি বিপুল আবেগপূর্ণ ভালবাসা। পরাধীন দেশের ভীরু মানুষেরা স্বজাতির মধ্যে অভাবিত বীর্যের সহসা প্রকাশে আনন্দবিহ্বল হয়ে তাকে স্বভাবতই নমস্কার করেছিল। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিপ্লব-পন্থা বিরোধিতা তাঁর নীতি বা আদর্শের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক এই ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণের বিরাগ। ব্যাপারটি আমি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেখতে চাইছি।

৪. আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের আশ্রয়দানের জন্য 'ইণ্ডিয়া হাউস' পরিচালনায় কেলগস্-এর অংশ ছিল। তবে এঁর রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধির উপরে নিবেদিতার ভরসা ছিল না। এ-বিষয়ে আরও তথ্য আছে লেখককৃত 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে, পৃ. ৮২-৮৩।

সাংবাদিক-সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পঁচিশ বৎসর ধরে বাংলার চিন্তাজগতে অত্যন্ত-জীবিত মানুষ ছিলেন (তাঁর মৃত্যুর পরে চল্লিশ বছরের কিছু বেশী সময় কেটেছে)—আজ তিনি এতই 'মৃত' যে বিস্মৃত সাহিত্যসেবীরূপে তাঁকে স্মরণ ক'রে আমরা কর্তব্যপালন করছি, এবং তিনি যে সত্যই সাহিত্যসেবী ছিলেন তার প্রায় কোনো প্রমাণই থাকত না, যদি-না তাঁর মৃত্যুর প্রায় তিরিশ বছর পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সাময়িকপত্র থেকে প্রবন্ধ সংগ্রহ ক'রে 'পাঁচকড়ি রচনাবলী' (দুই খণ্ডে) প্রকাশ করতেন এবং যদি-না 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র এক পুস্তকায় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁকে কয়েক পৃষ্ঠার ঠাঁই দেওয়া হত।

"পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থায়ী সাহিত্যকীর্তি যৎকিঞ্চিৎ, দুই একখানি উপন্যাস বা দুই চারিটি কথাচিত্র"—পাঁচকড়ি রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের সম্পাদকীয় ভূমিকার প্রথম বাক্য এই। যদি একথা সত্য হয় তাহলে সাহিত্যসেবীরূপে তাঁকে স্মরণেরই বা প্রয়োজন কি? সম্পাদকেরা এ ক্ষেত্রে স্থায়ী সাহিত্যকীর্তি বলতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনার কথাই বুঝেছিলেন। কিন্তু বাংলা সংবাদপত্রের ত্বরিত-ভঙ্গুর পৃষ্ঠায় একান্ত সাময়িক প্রয়োজনে তিনি সাহিত্যের যে বিপুল সম্ভার সঞ্চিত রেখে গেছেন- সেগুলির মূল্যও কি যৎকিঞ্চিৎ? পাঁচকড়িকে সাহিত্যিকরূপে গ্রহণ করতে হলে ঐ প্রবন্ধগুলির বিচার করার দরকার হবে।

সাময়িকপত্র থেকে পাঁচকড়ির তাত্ত্বিক-দার্শনিক প্রবন্ধ সংকলন করে তাঁর রচনার স্থায়ী মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা সাধু সন্দেহ নেই- কিন্তু সাময়িকতা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করলে তাঁর ব্যক্তিত্বের মূল সূত্রই হারিয়ে যায়। সূচনায় তাঁকে তাঁর জীবনকালের এক অত্যন্ত জীবিত মানুষ বলেছি, তা এই সাময়িক সাহিত্যের নায়করূপেই। 'নায়ক' সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সাময়িকপত্রের ইতিহাসে দীর্ঘদিনের অন্যতম নায়ক, আর যদি পেশাদার নায়কের কথা বলতে হয়—তিনি শ্রেষ্ঠ নায়ক। কথাটা আরও পরিষ্কারভাবে বললে দাঁড়ায়, বাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাসে পাঁচকড়ি এক নম্বর পেশাদার সাংবাদিক। তিনি আগে সাংবাদিক, না আগে সাহিত্যিক, এই প্রশ্নের উত্তরে বলব, অবশ্যই আগে সাংবাদিক; কিন্তু সাংবাদিকরূপে যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা কখনই দিতে পারতেন না যদি-না মূলে সাহিত্যিক হতেন। সাংবাদিক পাঁচকড়ির বুকে বাসা বেঁধেছিলেন সাহিত্যিক পাঁচকড়ি এবং বঞ্চিত সাহিত্যিকের দীর্ঘশ্বাসে সফল সাংবাদিকের হৃদয় মথিত থাকত সর্বসময়। 'পাঁচকড়ি রচনাবলী'র সম্পাদকগণ সাহিত্যিক পাঁচকড়ির আবিষ্কার-চেষ্টায় সাংবাদিক পাঁচকড়িকে উপেক্ষা করেছেন। আমরা তাঁর উভয় পরিচয় যুক্ত-রূপে উপস্থিত করার চেষ্টা করব।

পাঁচকড়ি যে পণ্ডিত ছিলেন সে বিষয়ে তাঁর জীবনকালে, মৃত্যুর পরেও, কারো সন্দেহ হয়নি। তাঁর জন্ম ভাগলপুরে, ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর। প্রথম থেকেই মেধাবী ছাত্র, ভাগলপুর জিলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃতে অনার্সসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করেন। তারপরে কাশীতে সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'সাহিত্যাচার্য' উপাধিলাভ। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ চর্চা করেছিলেন—কালীপ্রসন্ন সেন বা শশধর তর্কচূড়ামণির মতো পণ্ডিতের সাহচর্য এবিষয়ে সহায়ক হয়। ভাগলপুরে জন্ম ও সেখানে প্রথমবয়স কাটানোর জন্য হিন্দী ও উর্দু প্রচুর পড়েছিলেন; ফার্সী জানতেন, এবং যথেষ্ট ইংরেজী—ইংরেজী সাহিত্যের বিশেষ অনুশীলন তিনি করেছিলেন। জীবনের নানা ওঠাপড়ার মধ্যেও জ্ঞানার্জনে আগ্রহ শিথিল হয়নি কদাপি। আর অর্জিত জ্ঞানকে অক্লেশে অবহেলায় নিজ প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে পারতেন। এই সমস্ত কারণের জন্য তাঁর মৃত্যুর পরে স্টেটসম্যান অত্যুচ্চ প্রশংসা করে লিখতে পেরেছিল—

'Panchcowri Babu was probably the most well informed and well read of Bengali journalists' (Nov. 17, 1923).

সাংবাদিক হিসাবে বিশেষ একদিক থেকে বাঙালীদের মধ্যে পাঁচকড়ি অতুলনীয়—তাঁর মতো সংখ্যায় নানা ধরনের সংবাদপত্রে আর কেউ কাজ করেন নি। ব্রজেন্দ্রনাথ-কৃত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে পাই, তিনি শুরু করেছিলেন 'বঙ্গবাসী' কাগজে ১৮৯২ (?) খ্রীস্টাব্দে, ১৮৯৫ থেকে ঐ কাগজের প্রধান সম্পাদক।' বঙ্গবাসী থেকে চলে যান 'সাপ্তাহিক বসুমতীতে' (সম্পাদক হয়ে) ১৮৯৯-এর ফেব্রুয়ারিতে। দু' বৎসর পরে বসুমতী ছেড়ে 'রঙ্গালয়'-এ। ১৯০৮-এ দৈনিক 'হিতবাদী'র সম্পাদক। 'বাঙ্গালী' পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন। 'স্বরাজ' পত্রিকায় 'প্রতিদিন অন্যূন এক পাটি' লিখতেন এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। শেষোক্ত বিষয়ে অমৃতবাজারের মন্তব্য এই :

"He was a close friend and co-adjutor of the late Upadhyaya Brahma Bandhav, and the 'Sandhya', the first Bengali evening paper that lent such inspiration and strength to the last Swadeshi movement, owed not a little of its power to the genius of Panchcowri Banerjee". (অমৃতবাজার—১৭ নভেম্বর, ১৯২০)

পাঁচকড়ি কিন্তু এই সব পত্রিকার সঙ্গে বেশিদিন যুক্ত থাকেন নি। একমাত্র 'নায়ক'-এরই তিনি দীর্ঘকালের সম্পাদক।

অন্য আরও পত্রিকার মধ্যে 'প্রবাহিণী' নামক সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন, সুরেশ সমাজপতির মৃত্যুর পরে মাসিক 'সাহিত্য' পত্রিকারও।

কেবল বাংলা পত্রিকা নয়, ব্রজেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, তিনি হিন্দী দৈনিক 'ভারত মিত্র'-এরও সম্পাদক ছিলেন।

এই বিস্ময়করভাবে পুষ্ট তালিকায় যোগ করবার মতো আরও কয়েকটি নাম আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। পাঁচকড়ি 'বঙ্গবাসী' গোষ্ঠীর ইংরাজী দৈনিক 'টেলিগ্রাফ'-এর সম্পাদনা করেছেন ; সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সান্ধ্য সম্পাদকীয় বিভাগেও যুক্ত ছিলেন।

পাঁচকড়ি স্বয়ং কৌতুকের সঙ্গে আরও সংবাদ দিয়েছেন—

"একখানা দৈনিক কাগজে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে ত্রিপদ বামন সাজাইয়াছে। কারণ 'কলিকাতা সমাচার' (হিন্দী), 'দৈনিক চন্দ্রিকা' (বাংলা), এবং 'প্রবাহিনী'—এই তিনখানা কাগজের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ। বামন বটে, কিন্তু ত্রেধা নিদধে পদম্—বলী কই ? কাহার মাথায় পা দিব ? কিন্তু আসল কথা, পাঁচু ভায়া ষট্‌পদ। উপরের তিনখানা ছাড়া মাসিক তিনখানা আছে 'সাহিত্য', 'নারায়ণ', এবং 'বিজয়া'। ষট্‌পদ বলিয়া নূতন মাসিক ফুটিয়া উঠিলে, পাঁচু যাইয়া নূতন ফুলে একবার বসেন। প্রমাণ—'সংকল্প'।" (প্রবাহিনী—১৩ পৌষ, ১৩২১)

এছাড়াও লেখকরূপে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল জীবনের নানা সময়ে—'বেদব্যাস', 'ধর্ম-প্রচারক', 'জন্মভূমি', 'অনুসন্ধান', 'বঙ্গবাণী' ও 'ধ্রুব' পত্রিকার সঙ্গে। এখানে মনে রাখতে হবে, পাঁচকড়ি দীর্ঘজীবী হননি, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর ৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

যে তালিকা দিলাম, তা সম্পূর্ণ নয় বলেই আমাদের বিশ্বাস। বাংলা দেশের আর কোনো সাংবাদিক নিশ্চয় এত বিচিত্র ও বিভিন্ন সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রের সঙ্গে সংযোগের দাবি করতে পারেন না। সাংবাদিকরূপে তাঁর শক্তির খ্যাতি এতই ছিল যে, নূতন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা প্রায়শই তাঁর দ্বারস্থ না হয়ে পারতেন না।

সন্দেহ নেই অসাধারণ খ্যাতি। বঙ্গবাসী-গোষ্ঠীর বিখ্যাত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন লিখেছেন : "তাঁহার লেখনী ও মেসিন-প্রেসের ক্ষমতা সমান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দুটি বিরুদ্ধ ভাবের প্রবন্ধ যুক্তিযুক্ত করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে লিখিতে পাঁচকড়ি-বাবুর যেরূপ দক্ষতা ছিল, সেরূপ দক্ষতা অন্যত্র দুর্লভ।" পাঁচকড়ির দ্বারা নিয়মিত আক্রান্ত 'প্রবাসী' তাঁর মৃত্যুর পরে কঠোর সংযমের সঙ্গে লিখেছিল : "সংবাদপত্র লেখক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব লিপিদক্ষতা ছিল।" 'Prominent Bengali Journalist' পাঁচকড়ি সম্বন্ধে স্টেটসম্যানের উচ্চপ্রশংসার কিছু অংশ আগেই উদ্ধৃত করেছি, যে-জাতীয় কথা 'ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ' প্রমুখ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাতেও লেখা হয়েছিল। উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি করেছিল অমৃতবাজার তাঁর রচনাশক্তির। এবং যে-আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে পাঁচকড়ির সম্পর্ক আর যাই হোক প্রীতির ছিল না, তারই মুখপত্র তত্ত্ববোধিনীতে মন্তব্য করা হয়েছিল—

"...এই কলিকাতা শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন ভাবের সংবাদপত্রের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনি

উর্দু ও হিন্দী সাহিত্যেও তাঁহার পাণ্ডিত্য বড় কম ছিল না। এই বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সহিত পরিচয় তাঁহার সংবাদপত্র সেবার পথে সহায় হয়েছিল। তাঁহার রচনাভঙ্গিও বড় বিচিত্র ছিল। তিনি যে কেবল তীব্র শ্লেষ ও রসিকতার সঙ্গে হালকা লেখাই কেবল লিখিতেন, তাহা নহে—আবশ্যক হইলে তাঁহার লেখনীমুখ হইতে গুরুগম্ভীর রচনাও অবলীলাক্রমে বাহির হইয়া আসিত। তিনি বাংলার সমাজ ও ধর্মের একটা নবতর প্রচ্ছন্ন ইতিহাসের ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন।…" (তত্ত্ববোধিনী, ১৮৪৫ শক, অগ্রহায়ণ)

অমৃতলাল বসু সাক্ষ্য দিয়েছেন: "সম্পাদকরূপে পাঁচকড়ি যে অতীব ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, একথা আমি বহু সম্পাদকের মুখে শুনিয়াছি। বঙ্গবাসীর স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ, বসুমতীর স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ, আমার পরম স্নেহভাজন সুরেশ সমাজপতি, বিহারীলাল সরকার প্রভৃতি অনেকেই পাঁচকড়িবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি 'টেলিগ্রাফিক' সংবাদ সম্পাদনে পাঁচকড়ি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দেখিয়াছি, তাঁহার লেখনী-ক্ষিপ্রতা, তাঁহার লিখার রসমাধুর্য, ওজস্বিতা, ও তেজস্বিতা। তিনি বহু স্থানের, বহু লোকের, বহু সমাজের তত্ত্ব সম্যকরূপে জ্ঞাত ছিলেন।" (মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩)

পূর্বোক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন—একদা পাঁচকড়ির শ্রদ্ধাভাজন, পরে বিদ্রূপের লক্ষ্য—আরও লিখেছেন: "আমি তাঁহার রচনায় সুপ্রীত হইতাম। আমাকে গালি দিয়া লিখিলেও অনেক সময়ে রচনাকৌশলে প্রীতিলাভ করিতাম।" সে কোন্ রচনাশক্তি, যা নিন্দা-পাত্রের কাছে নিন্দাকে স্বাদু করে তুলতে পারে? 'বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ' পঞ্চানন তা ব্যাখ্যা করেছেন:

"ইন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ও ব্রহ্মবান্ধবে যে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ছিল—পাঁচকড়ি তাঁহাদের সাহচর্যে সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই নিজস্ব করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। একে যে বৈশিষ্ট্য তাহা প্রগাঢ়তর হইতে পারে, কিন্তু সকলের ভাব এক হৃদয়ে সম্যক আয়ত্ত করা অসাধারণ প্রতিভার লক্ষণ। ইন্দ্রনাথের রসিকতাপূর্ণ তীব্র ব্যঙ্গপটুতা ও প্রতিভাসমুজ্জ্বল বাগ্মিতা, অক্ষয়চন্দ্রের সরস ভাষা ও ভাবগাম্ভীর্য, যোগেন্দ্রচন্দ্রের বচন-পটুতা ও রচনামাধুর্য, ব্রহ্মবান্ধবের প্রচলিত ভাষায় সরসভাবে বক্তব্যের বিন্যাস, ইহারা তাঁহাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য। এই চতুর্বিধ বৈশিষ্ট্যের বিশেষ পরিচয় পাঁচকড়িবাবুর রচনাতে পাইয়াছি।"[১] (বঙ্গবাণী, পৌষ, ১৩৩০)

পঞ্চানন তর্করত্নের এই উক্তি, অত্যুক্তি কিনা, তার পক্ষে বা বিপক্ষে বলবার মতো উপযুক্ত উপাদান আমরা সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি, কারণ পাঁচকড়ির ক্ষমতার সর্বাধিক বিকাশ যে-সব সংবাদপত্রে ঘটেছিল, তাদের কোনোটির ফাইল দেখবার সুযোগ পাইনি। বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয়, 'বঙ্গবাসী,' 'সাপ্তাহিক বসুমতী', 'হিতবাদী,' 'সন্ধ্যা' বা 'নায়ক'-এর ফাইল পাওয়া যায় না। (না-কি পাওয়া যায়? সে ক্ষেত্রে যদি কেউ সন্ধান দেন!)। ঐ সমস্ত পত্রিকার নানা রচনায় পাঁচকড়ির রাজনৈতিক বুদ্ধি, সামাজিক প্রজ্ঞা, এবং সরস দুষ্ট বিদ্রূপ-ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। সুতরাং পাঁচকড়ি রচনাবলীর সম্পাদকগণ তাঁকে গভীর ভাবুকরূপে উপস্থিত করতে গিয়ে

তাঁর শ্লেষ বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলিকে যে প্রায় একেবারেই বাদ দিয়েছেন (সম্পাদকদের অন্যতম সজনীকান্ত দাস—তবুও !!). তার দ্বারা তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় মিলবে না। উপরের সংবাদপত্রগুলি না পেলেও, অন্য সূত্র থেকে পাঁচকড়ির কিছু সরস টিপ্পনী যোগাড় করেছি (যেগুলি তাঁর এ-জাতীয় রচনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ না হওয়াই সম্ভব)—তার দু'একটি হাজির করব।

॥ ২ ॥

তার আগে যিনি রসিকতা করতেন, সেই মানুষটির ব্যক্তিরূপের কাছে যাওয়া দরকার। একেবারে বাল্যকালের একটি ছবি : সবে ফিফথ্ ক্লাসে পড়েন ভাগলপুরের এক স্কুলে ; পৈতে হয়েছে, দুই কানে "দুই সোনার মাকড়ি, মাথা নেড়া, পায়ে কালীর জরির জুতা, পরনে গেরুয়া রঙের এক ভাগলপুরী বাপ্তার কোট"—সেই সময়ে বিদ্যালয় পরিদর্শনে এলেন স্বনামখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায়। পাঁচকড়ি ক্লাসের ফার্স্ট বয় ; নিতান্ত বালক, তবুও চোটপাট কথা চালাতে লাগলেন উক্ত বিখ্যাত পুরুষের সঙ্গে। হেডমাস্টার মহাশয়ের নাম ছিল বেণীমাধব দে, পাঁচকড়ির পিতার নাম বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ; এই নাম-সাম্য নিয়ে রসিক হেডমাস্টার বালক পাঁচকড়িকে ক্ষেপাতেন :

"এই সময়ে হেডমাস্টার বেণীবাবু ভূদেববাবুকে বলিলেন—'জিজ্ঞাসা করুন তো ওর বাপের নাম কি ?' ভূদেববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন- 'তোমার বাবার নাম কি ?' আমি রাগ করিয়া বলিলাম—'যাঃ'। কথা এই যে, আমার পিতৃদেবের নাম বেণীমাধব, আমাদের হেডমাস্টারের নামও বেণীমাধব। আমি পিতার নাম বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলে, হেডমাস্টার বেণীবাবু—'একটু ভুল হইয়াছে'—বলিয়া আমাকে লইয়া রঙ্গ করিতেন। ভূদেববাবুও সে রঙ্গের লোভ ছাড়িতে পারেন নাই। আমার মহা রাগ হইল। শেষে ভূদেববাবু কাছে ডাকিয়া আমাকে একটু আদর করিলেন।"

অতঃপর ভূদেব-পাঁচকড়ি সংলাপ আর একটু :

"শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার মাতামহের নাম কি ?' আমি মাতামহকুলের কোনো পরিচয় জানিতাম না। আমি বলিলাম, 'মা'র আবার বাবা আছেন না কি ?' আমার কথা শুনিয়া বেজায় একটা হাসি পড়িয়া গেল। তাহার পর ভূদেববাবু আমাকে লেখাপড়ার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সকল প্রশ্নের উত্তর করিয়া বলিলাম, 'আমাকেই খালি খালি জিজ্ঞাসা করিলেন—অন্য ছেলেদের জিজ্ঞাসা করুন না!' উত্তরে ভূদেববাবু বলিলেন, 'বটেই ত। আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব না। এখন তুমি কি করিতে চাও ?' আমি বলিলাম, 'খেলা করিতে'।"[২]

এই সপ্রতিভ সাহস পাঁচকড়ির জীবন-সঙ্গী। কেশবচন্দ্র সেন ভাগলপুরে গিয়ে 'Band of Hope' স্থাপন করলেন ; এগারো বৎসরের পাঁচকড়ি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে তার সম্পাদক হলেন। সভা প্রতিষ্ঠার সময় কেশবচন্দ্র বালকদের ভোজ দেন, যাতে মাটির

হাফ-গ্লাসে, যাকে হিন্দীতে 'চুক্কড' বলে, সুপেয় সরবৎ খেতে দিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র জানতেন না যে, এই চুক্কড় বেহারে খেনো মদের ডিকাণ্টার। ছেলেরা চুক্কড়ে সরবৎ পান করলে পাঁচকড়িদের পণ্ডিত মশায় তামাশা করে বললেন, 'আরে খায়ো, খায়ো—চুক্কড়মে খায়ো।' ঠাট্টা শুনে রাগে লজ্জায় অস্থির হয়ে, ছেলের পাল নিয়ে পাঁচকড়ি ছুটলেন কেশবের কাছে; সেখানে গিয়ে চোস্ত, হিন্দীতে বললেন—'চুক্কড়মে পানি পিয়াবা? এইসি গোস্তাকি?' কেশবচন্দ্র ব্যাপারটা জেনে নিয়ে সস্নেহে বালকটিকে ঠাণ্ডা করলেন।

একদিকে এই সতেজ রুক্ষ সাহস, অন্যদিকে নিগূঢ় অভিমান। বঙ্কিম-স্মৃতিতে পাঁচকড়ি লিখেছেন:

'আমার তখন পাঁচ কি ছয় বৎসর বয়স, বঙ্কিমচন্দ্র তখন প্রথম আমাদের হালি-শহরের বাড়িতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ৺যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়।...ইহারা উভয়েই আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিলেন।...চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে অনেকগুলি বাঁশ ছিল। আমি তাহার একটার উপর বসিয়া ঘোড়া ঘোড়া খেলিতেছিলাম। সহসা আমার একটা পা নীচের স্তূপীকৃত বাঁশের মধ্যে এমনভাবে আটকাইয়া গেল যে, আমি আর টানিয়া পা বাহির করিতে পারিলাম না। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ক্ষণেক পরে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, 'দেখ হে, পাঁচু এমন শান্ত হয়ে বসে আছে কেন?' মেজদাদা আমার কাছে আসিয়া দেখেন, আমার বাঁ পা-টা বাঁশের ভিতর আটকাইয়া গিয়াছে। বাঁশের কচায় পায়ের পাতা কাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। আমি কিন্তু নীরব, নিস্পন্দ-ভাবে বসিয়া আছি। মেজদাদা একা আমার পা খুলিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র নামিয়া আসিলেন। উভয়ে মিলিয়া এক-একটি করিয়া বাঁশ সরাইয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তখন আমি মেজদাদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, এ ছেলে বড় অভিমানী হইবে।" (পাঁচকড়ি রচনাবলী, ২য়, পৃ. ৯-১৩)

সুতরাং বাল্যবয়স থেকেই এক পিঠে প্রগল্‌ভতা, অন্য পিঠে নীরব অভিমান। ঝানু রসিকও সেই সঙ্গে, সেই বয়সেই, জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। নয় বৎসর বয়সে চোখের ব্যায়রামের জন্য কলকাতায় নিয়ে আসা হল তাঁকে, উদ্দেশ্য চোখে অস্ত্র করানো হবে। কলকাতা তখন কিন্তু সরগরম, প্রিন্স অব ওয়েলস এসেছেন;—সুতরাং 'তামাশা না দেখিয়া চোখ কাটাইব না স্থির করিলাম।' এমন যাঁর রসদৃষ্টি তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র 'প্রচারে' লিখবার জন্য অনুরোধ করলেন—তখন বি-এ পড়েন তিনি। অতঃপর, পাঁচকড়ি লিখছেন—

"আমি পনের দিন পরিশ্রম করিয়া ছত্রিশ পাতাব্যাপী এক সন্দর্ভ লিখিলাম। তাহার বিষয়—'প্রেম।' ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসী, আরবী, সংস্কৃত ও চীন সাহিত্য হইতে প্রেমের যত প্রকারের বিবৃতি আছে লিখিয়া দিলাম। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির সভ্য-

অসভ্য বর্বর-রাক্ষস—সকল জাতির চুম্বন ও আলিঙ্গন প্রথার বিবরণ দিলাম। প্রেমের এইরূপ এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়া নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের মারফত রাখালদাদাকে পাঠাইয়া দিলাম। দুইদিন পরে, রাখালদা আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই এক চপেটাঘাত লাভ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, 'হতভাগা, আর কিছু লেখবার পাও নি ? শুনেছ, কর্তা (বঙ্কিমচন্দ্র) কি বলেছেন ?' আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি ?' রাখালদা বলিলেন, 'পাঁচুর আর বিয়ে না দিলে চলে না !' রাখালদা আমাকে প্রবন্ধটি ফিরাইয়া দিলেন। আমি উহার সহিত বৈষ্ণব-প্রেমের—ঈশ্বর-প্রেমের—বিবৃতি জুড়িয়া দিয়া, প্রবন্ধটিকে ধর্ম-সন্দর্ভে পরিণত করিয়া, 'ধর্মপ্রচারকে' পাঠাইয়া দিলাম। 'ধর্মপ্রচারকে' উহা ছাপা হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা পাঠ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, 'ছেলেটা ভারী দুষ্ট !—কিন্তু অসাধারণ মেধাবী।"

বঙ্কিমপ্রসঙ্গে পাঁচকড়ি নিজের যৌবনের চালাকি ও পরিপক্কতার আরও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন : আমি আর একটিকে নির্বাচন করছি, পাঁচকড়ির ব্যক্তিচরিত্র ও চিন্তাপ্রকৃতি বোঝাবার প্রয়োজনে। এখানে স্মরণ করিয়ে দেব পাঁচকড়ি বঙ্কিম সাহিত্যের যেমন সমাদর করেছেন, তেমনি সমালোচনাও :

" 'কৃষ্ণচরিত্র' বাহির হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ শ্যামবাবুর ছোট জামাই কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে করিয়া আমি বঙ্কিমবাবুর বাড়ি গিয়াছিলাম। আহারাদির পর কৃষ্ণধন কৃষ্ণকথা লইয়া শ্বশুরের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিল। আমি নীরবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলাম ও পান চিবাইতে লাগিলাম। কতক্ষণ পরে বঙ্কিমচন্দ্র আমার পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'তুমি পড়িয়া কি বুঝিয়াছ ?' আমি মস্তক অবনত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, 'পায়োনীয়ারে লেখেছেন ত, কান্দাহারে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি আছে, সে কৃষ্ণ পোষাকে-পরিচ্ছদে খাঁটি পাঠান—পাঠানের আব্বা-জোব্বা পরা, পাঠানী পাগড়ির উপর ময়ূরপাখা আঁটা ; যেমন জন্ম, যেমন কর্ম, যেমন সংস্কার, কৃষ্ণও তেমনি ফুটিয়াছে।' এইটুকু বলিয়া আমি নীরব হইলাম। বঙ্কিমচন্দ্র আমার কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, আর এক বাটি ক্ষীর খা, আর দুটো রসগোল্লা খা—বাপান্ত করেছিস বটে।' রাখালদাদা তাড়াতাড়ি বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতেই বাড়ির ভিতর হইতে ক্ষীর ও রসগোল্লা আনিয়া দিলেন। আমার তখন আহারে অরুচি ছিল না।"
(ঐ, ২য়, পৃ. ৯-১৩)

॥ ৩ ॥

এই মানুষ। যে-কোনো স্থানে, যে-কোনো সমাজ বা সংস্রবে—সবেগ, সতেজ, বুদ্ধিদীপ্ত ও পরিহাসপটু—সংবাদিকতায় এঁর সাফল্য অবধারিত। আদি, করুণ ও হাস্য—তিন প্রধান রসকে যথেচ্ছ আকর্ষণ করতে ইনি সমর্থ। টিপ্পনীর ক্ষেত্রে আদি ও হাস্যের জড়াজড়ি লীলা। সাময়িক প্রয়োজনে অবশ্য আদি রসে বাধ্যাহিক খেলা এবং

হাস্যরসে রৌদ্রের ঝাঁঝ দেখা যেত। ব্যক্তিবিশেষের লক্ষ্যেই তাঁর অধিকাংশ টিপ্পনী রচিত। যথা—

"মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, 'নারায়ণ' মাসিক পত্রের পৌষ সংখ্যায় বৌদ্ধ শাস্ত্রের নির্বাণ তত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া একেবারে নিরাত্মদেবীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। অভিজ্ঞ পাঠক যদি মজা বুঝিতে চান, তাহা হইলে পৌষের 'নারায়ণ' পড়িয়া দেখিবেন। মনে থাকে যেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় বিপত্নীক।"
(প্রবাহিণী পৌষ ১৩, ১৩২১)

বৃদ্ধ অমৃতলাল সম্বন্ধে :

"পূর্বে বড়দিনের সময়ে রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর একখানা প্রহসন বাহির হইতই। 'বছুর বিউনী' যেমন বৎসরান্তে একটি করিয়া পুত্র প্রসব করিবেই, অমৃতলালের মনীষা তেমনই বৎসরান্তে একখানা করিয়া প্রহসন প্রসব করিতই। বসুজ এখন বৃদ্ধের দলভুক্ত হইয়াছেন, আর সে পূর্বেকার রীতি বজায় রাখিতে পারেন না। 'সাবাশ আটাশ'ই রসরাজের বড়দিনের শেষ সওগাদ। তাহার পর দুই একখানা যাহা বাহির হইয়াছে, সে কেবল বুড়া মুর্গীর ডিম পাড়ার মতন ; ডিম না দিলে গৃহস্থ খাইতে দেয় না যে।" (ঐ)

এই রসিকতা শারীরিক এবং স্থূল, কিন্তু নিশ্চয়ই সাহিত্যিক—কারণ পুরুষ সাহিত্যিকেরা একালেও নিজেদের সৃষ্টিপ্রেরণার সঙ্গে গর্ভযন্ত্রণার তুলনা দিতে বড়ই ভালবাসেন।

প্রমথ চৌধুরীর এক মন্তব্যের সূত্রে পাঁচকড়ি একবার সচিত্র টিপ্পনী করেন—'নিরাকার ভারতী পূজা।" নোবেল পুরস্কারকে লক্ষ্য করে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, "এখন থেকে আমরা প্রতি ছত্র Swedish Academi-র মুখ চেয়ে লিখতে বাধ্য।" পাঁচকড়ি লিখলেন, তার মানে, আমাদের বিলেতী সরস্বতী পূজা করতে হবেই ; তবে সাকার করলে পৌত্তলিকতা দোষ ঘটবে, তাই নিরাকার সরস্বতীর পূজাই বিধেয়। ব্যাপারটা বোঝাতে একটা ছবিও দিলেন, যাতে দেখা গেল, ভক্তবৃন্দ একটি প্রতিমার কাঠামোর সামনে উপাসনা করছে, যদিও দেবীর আসন শূন্য। উপাসনার গদ্য-মন্ত্রও পাঁচকড়ি সরবরাহ করলেন—

"হে নিরাকারা, নির্বিকারা, নিরক্ষরা, সারাৎসারা, তুমি যখন শ্বেতাঙ্গী তখন নিশ্চয় তুমি ইউরোপবাসিনী। দক্ষিণ ইউরোপের ত নিশ্চয়ই নহ কারণ, সে দেশে একটু কাঁচা সোনার আমেজ আছে! তুমি যখন তুষারধবলা, তখন তুমি নিশ্চয়ই সুইডেন, নরওয়ের অধিবাসিনী। 'নোবেল প্রাইজ' তোমারই শ্রীচরণ প্রসাদাৎ। দাও দেবি! আমাদের সেই প্রাইজ দাও, আমাদের মসীজীবীর জীবন সার্থক হউক।" (প্রবাহিণী, মাঘ ১৭, ১৩২০)

পাঁচকড়ি পদ্যে রসিকতা করতেন। যখন বানান সংস্কারের প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন প্রবাহিণীতে 'বানানবধ কাব্য' নামে যে লেখকের নামহীন রচনাটি প্রকাশিত হয়, তা

নিঃসন্দেহে পাঁচকড়ির রচনা। বানান ব্যাপারে প্রগতিশীলদের কাছে আহার ও ঔষধরূপ এই রচনাটির কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া উচিত। কাব্যের সকরুণ সূচনা :

একদিন প্রাতে উঠি বঙ্গভাষা
দেখিলা নয়ন মেলি,
অক্ষর সকল করিয়া চীৎকার
করিতেছে ঠেলাঠেলি।
ই ঈ দুইজন হয়ে আলুথালু
অশ্রুধারা বরষয়,
উ ঊ দুই ভায়ে দেখিয়া ভাবিছে
গতিক সুবিধা নয়।

সত্যই গতিক সুবিধা নয়, যেহেতু—

'য'-এ 'ঞ'-এ 'জড়াযড়ি' 'ব' দিতেছে গড়াগড়ি
এ ত বড় বিষম রহস্য!
'কোন' হল কোন্ ঠাসা দেখিয়া বিবর্ণ ভাষা
ভস্ম বুঝি হয়ে গেল 'ভঁশ্‌শো'!
মোক্ষ পড়ে খাবি খায় 'মোক্‌খ' বসে দেখে তায়
মত্ত এসে কহে 'কত্তো' 'মত্তো'!

পরিস্থিতি দেখে নিজ নাম বাঁচাতে ব্যাকুল পুরনো সাহিত্যিকদের যন্ত্রণার চেহারা:

বিদ্যাপতি সেথা ছিল 'গংআ' জল পরশিল
'ভ'য়' 'গেলো' 'বিদ্‌দাপোত্তি' নাম!
'চোণ্ডীদাস' দেখে শুনে 'শ'-কে ধরিলেন টেনে
'প্রোশাদ' 'জোপিলা' 'রাম নাম্‌'!
বাঙ্গালা 'বাঙলা' 'হোলো' 'সবে' 'ভোল' 'তেয়াগিলো'
'শাহীত্তের' সম্রাট আদেশে।
'দীবা হোলো অবোসান' হেরিয়া 'আস্‌সন্তো' প্রাণ
কিন্তু হায় 'জোছনা য়াকাশে।'...
ভারত 'ভারোতে' আসি গলেতে পরিলা ফাঁসী
কৃত্তিবাস হল 'ক্রীত্তিবাস'।
'কাসীদাশ' 'হতোভম্বো' লক্ষকে হেরিয়া 'লখ্যো'
'বড়ো লয্যা' পান 'গ্যানদাশ'।

ভাষাজননী ভাবলেন এই ধর্মের গ্লানি থেকে উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র—কৃষ্ণচরিত্রের স্রষ্টা—বঙ্কিমচন্দ্র! কিন্তু অহো ভাগ্য! বঙ্কিমও ভড়কালেন!—

'বাংলা ভাষা' দেখে শুনে না জানি কি ভেবে 'মোনে'
ছুটিলেন বঙ্কিমের ঠাঁই।
কহিলেন কাঁদি 'যোরে' রক্ষা এবে কর মোরে
তোমা ভিন্ন কারো 'সাধ্যো' নাই।
বঙ্কিম জুড়িয়া কর কহিলেন ক্ষমা কর
'বোংকিম' কি হব শেষে আমি?
তোমারে করিতে রক্ষা রক্ষার হইবে 'ঝঁকথা'
সোজা পথে যাও বাছা তুমি।

(ঐ, ১৩ চৈত্র, ১৩২০)

পাঁচকড়ির আর একটি 'চুটকী' উপহার দিই, যার মধ্যে সাহিত্যিকদের অন্দরমহলে শ্যেনদৃষ্টি পাঠিয়ে গুরুতর গবেষণা করা হয়েছে:

"সৌভাগ্যই বল, আর দুর্ভাগ্যই বল, বাংলার বড় বড় সাহিত্যসেবী কেহই এক-পত্নীক হইয়া জীবন অতিবাহন করিতে পারেন নাই। কেবল ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, নবীনচন্দ্র সেন, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চন্দ্রনাথ বসুকে এই দল হইতে বাদ দিতে হইবে।

"পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একপত্নীক ছিলেন বটে কিন্তু উভয়ে পিঠোপিঠির মত কেবল ঝগড়াই করিতেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একপত্নীক ছিলেন, কিন্তু পত্নী পাগল ছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঐ দলভুক্ত। পত্নী বিষয়ে মাইকেল মধুসূদনের কথা নাই বলিলাম।

"বঙ্কিমচন্দ্রের দুই পত্নী, বঙ্গবাসীর যোগেন্দ্রচন্দ্রের দুই পত্নী, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের দুই পত্নী, গিরিশচন্দ্র ঘোষের দুই পত্নী, বিপিনচন্দ্র পালের দুই পত্নী, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের দুই পত্নী, রাজকৃষ্ণ রায়ের দুই পত্নী, চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদের দুই পত্নী। এমন দ্বিপত্নীক অনেকেই আছেন। এমনকি সরস্বতীর ভাণ্ডারী শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ও দ্বিপত্নীক। পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের পাঁচ পত্নী। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নের তিন পত্নী। আমাদের পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়েরও তিন পত্নী।

"আচার্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিপত্নীক। ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিপত্নীক। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল বিপত্নীক। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিপত্নীক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিপত্নীক। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী বিপত্নীক এবং দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী বিপত্নীক। মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিপত্নীক। হারাণচন্দ্র রক্ষিত বিপত্নীক। আর চূড়ার উপর ময়ূরপাখা—রাজা রামমোহন রায় বহুবল্লভ।

"আর বিধবা রাখিয়া গিয়াছেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, শিশিরকুমার ঘোষ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রভৃতি।

"অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, বাংলায় যাহারা দাম্পত্য-সুখে সুখী তাহারা অভিবড় লেখক ও কবি হইলেও খাঁটি সাহিত্যসেবী নহে। যথা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি সাহিত্য-সেবী নন। বিশেষত বঙ্গবাসীর বিহারীলাল সরকার তাঁহাকে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশাধিকার দেওয়া ঠিক নহে।" (ঐ, ১১ মাঘ ১৩২০)

একালের পাঠকদের অনেকেই জেনে মর্মাহত হবেন, পাঁচকড়ির শ্লেষ বিদ্রূপের অন্যতম সাধারণ পাত্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কারণ প্রথমত তিনি বিখ্যাত—আর বিখ্যাত-দের নিয়ে তামাশা 'বিকায় যে।' দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টির সঙ্গে পাঁচকড়ির জীবনদৃষ্টির পার্থক্য সমূহ। পাঁচকড়ির রবীন্দ্র-ব্যঙ্গের অল্প কিছু অংশ তুলব, পাঠকদের রসবোধের উপর ভরসা রেখে। রবীন্দ্রনাথের আসন এত উঁচুতে নির্ধারিত হয়ে গেছে যে, তাঁর বিষয়ে এইসব রচনা অনুকম্পামিশ্রিত কৌতুকের সৃষ্টি করবে আজ। যেমন ধরা যাক, পাঁচকড়ি একবার লেখেন, "ঠাকুরবাড়ির লেখকগণ সবাই পিরালী; হিন্দুর পরমান্নে পেঁয়াজের রস দিতে তাঁহারা খুব পটু।" (ঐ, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১)। কিংবা তিনি পাঠকদের আহ্বান করেছিলেন একাদশ রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসার সমাধান করতে। শ্রেষ্ঠ উত্তর প্রকাশিত হবে ও উত্তরদাতা পুরস্কার পাবেন—এই প্রতিশ্রুতিও সেইসঙ্গে ছিল। একাদশ প্রশ্নের মধ্যে সপ্তম ও অষ্টম প্রশ্নের চেহারা এই :

"(৭) তোমরা কেহ রবীন্দ্রনাথকে কাঁদিতে দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ? তাঁহার হাসি দেখিয়াছ—কিন্তু শুনিয়াছ কি? যদি শুনিয়া থাক, তাহা হইলে তাঁহার হাসিতে ছায়ানটের সুর আলাপ হয় না কি?

(৮) তাঁহার রোদন ব্রহ্মস্বরূপ কি না? ব্রহ্ম—অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়। রবীন্দ্রনাথের রোদন—অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ; তিনি যখন সংসারী ও বিপত্নীক, তখন সে রোদন অব্যয় তো বটেই, এ জীবনে তাহার আর ব্যয় সম্ভাবনা নাই। 'দেখা না দিলে কি দেখতে পায় হে',— ইহা ব্রহ্মপক্ষে এবং রোদনপক্ষে সমভাবে প্রযুজ্য। ব্রহ্ম ক্লীব, রোদনও ক্লীব। অতএব তাঁহার রোদন কোন্ সমাজভুক্ত? আদি, সাধারণ কিংবা ভারতবর্ষীয়?" (ঐ, ১৮ মাঘ, ১৩২১)।

আর একটি নমুনা :

"ভাসল তরী দরিয়ায়। ডাক্তার কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বিলাতের কোনো বন্ধুকে লিখিয়াছেন যে, তিনি এবার জলবিহারে বহির্গত হইবেন। নৌকা করিয়া ভাসিয়া-ভাসিয়া বেড়াইবেন। কোথায় কখন থাকিবেন, তাহার খবর কাহাকেও দিবেন না। কাহারও প্রশংসাপূর্ণ পত্র গ্রহণ করিবেন না। কাহাকেও কোনও পত্র লিখিবেন না। কবির উপযুক্ত সাধ বটে। এই নব বসন্তে নব কিশলয়শোভাপ্রফুল্ল বাঙ্গালার নদী-তটিনী বাহিয়া রবীন্দ্রনাথ ভাসিয়া যাইবেন। আর দূর আম্রকাননের লোহিতাভ পত্রসমাচ্ছন্ন কোকিল মহাশয়ের পঞ্চম তানে তাঁহার নদীশীকরসম্পৃক্ত বসনাবৃত দেহ-

বস্তিখানিও থাকিয়া-থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিবে। প্রথম প্রদোষে দূর পল্লীর নোনা বন হইতে যখন ফেরুপাল হাহারবে দিঙ্‌মণ্ডল মুখর করিয়া তুলিবে, তখন কি রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলির' সুধারাশি অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া পান করিবেন ? কে জানে !" (প্রবাহিনী, ১ ফাল্গুন, ১৩২০)

কিন্তু কেবল চুটকি নেড়েই এই বিদূষক-ব্রাহ্মণ লোকরঞ্জনে নিয়োজিত ছিলেন না, অনেক সময়ে গম্ভীর সুরে বাজতেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তামাশা ক'রে তিনি আসর জমিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর আপাত আক্রমণগুলির পিছনে ওই মহাপ্রতিভা সম্বন্ধে গভীর এক ক্ষোভ বর্তমান ছিল, যা কেবল তাঁর একারই নয়, সমকালের অনেক বিশিষ্ট বাঙালীরও, যাঁদের মধ্যে আছেন দ্বিজেন্দ্রলাল, বিপিন পাল প্রমুখরা। এখনকার বাঙালী পাঠক ওই কালের যে-কোনো রবীন্দ্র-সমালোচনাকে অনুচিত বলে প্রত্যাখ্যান করছেন, কিন্তু সেকালের রবীন্দ্র-বিরোধী মনোভাবের পেছনে জীবনদর্শনগত যে-আপত্তি সক্রিয় ছিল, তার রূপ ইতিহাসের প্রয়োজনে জেনে নেওয়া উচিত। শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম, বেদনা ও অভিমান মিশিয়ে পাঁচকড়ি এ-সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার বেশখানিক উদ্ধৃত করছি :

"রবীন্দ্রনাথের উপর মধ্যে-মধ্যে এত কঠোর মনোভাব প্রকাশ করি কেন, তাহার একটা কৈফিয়ত দিব। যাহাকে বড় মনে করি, যোগ্য মনে করি, তাহার কার্যাকার্যেরই সমালোচনা করিতে হয়। উদাসীন থাকি তাহারই প্রতি, যাহার যোগ্যতার প্রতি কোনো শ্রদ্ধাভক্তি থাকে না, বা রাখিবার কোনো প্রয়োজন বুঝি না।

"রবীন্দ্রনাথ সুকবি, সুলেখক, ভাবুক, রসিক—প্রতিভাশালী পুরুষ। রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণীশক্তি প্রচুর পরিমাণে আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করিতে পারেন। এই মোহিনী বা আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ যৌবনে কলিকাতায় ফ্যাসানের নেতা হইয়াছিলেন। তিনি মানুষকে মাতাইতে—মুগ্ধ করিতে পারেন। তাঁহার মধ্যে নেতৃত্বশক্তি যথেষ্ট আছে।

"রবীন্দ্রনাথ বনিয়াদী ঘরের ছেলে, ধনীর পুত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজ। কলিকাতার বাঙালী সমাজে রবীন্দ্রনাথের বাঁধা মজলিশ ছিল। গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিতেন, যাহা বলিতেন, যাহা করিতেন, আমরা শতমুখে তাহারই প্রশংসা করিতাম। আমাদের প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথের নিন্দা মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহার পর সংসারের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া আমরা কত শিখিলাম, কত কি দেখিলাম, কত কি বুঝিলাম। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সংসার-নাট্যশালায় কেবল অভিনয় করিয়া জীবন কাটাইলেন। ইহাই আমাদের প্রথম দুঃখ।

"রবীন্দ্রনাথ যেন টলটলে পদ্মপত্রের জল ; উহার উপর যখন যে-রঙের সূর্যরশ্মি পড়িতেছে, তখন সেই রঙই ফুটিয়া উঠিতেছে। 'সাধনায়' রবীন্দ্রনাথের যে-রূপ দেখিয়াছিলাম, 'বঙ্গদর্শনের' নবপর্যায়ে সে-রূপ দেখি নাই। কিন্তু সেটাও একটা শ্লাঘার রূপ। বঙ্গদর্শনের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ যে-ভাব ছড়াইয়াছিলেন, বঙ্গভঙ্গের গোড়ায় যে-উন্মাদ কবিত্বে বাঙালীকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এখন সে ধারা রবীন্দ্রনাথে নাই।

কেবল ধারাই বদলায় নাই, মতটাও বদলাইয়া গিয়াছে। তাঁহার এখনকার অভিনয়ের ভূমিকা সাধনা এবং বঙ্গদর্শনের যুগের ভূমিকার বিরোধী। মত লইয়া রবীন্দ্রনাথ একটা ডিগ্‌বাজি খাইয়াছেন।

"আমাদের দ্বিতীয় দুঃখ, রবীন্দ্রনাথ কখনই বাঙালী সাজিতে পারিলেন না। তিনি আজীবন টবের বসরাই গোলাপ হইয়া রহিলেন। বাংলার সুখ, বাংলার দুঃখ, বাংলার আশা তিনি কখনই ভালো করিয়া ধরিতে পারেন নাই। তিনি বাংলার হিন্দুসমাজ ও ধর্মের উপর যত তীব্র ও বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন, সবই সে অ-বাঙালীভাবেই করিয়াছেন। তাঁহার লেখায় সমাজের প্রতি মমত্ববোধ তিলমাত্র প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার লেখা পাঠ করিলে মনে হয় যেন বাংলার হিন্দুসমাজ তাঁহার পরের সামগ্রী, উহার প্রতি তাঁহার কোনোপ্রকারের সমবেদনার ভাব থাকিতে নাই। হিন্দুসমাজের প্রতি তাঁহার এই অনাত্মীয় ভাবটাই আমাদের ভালো লাগে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত কথা কহিয়া দেখিয়াছি, তিনি হিন্দুকে কখনই পর বলিয়া ভাবিতেন না।

"হিন্দুসমাজে যে দোষ নাই, পাপ নাই, এমন বলি না। হিন্দুসমাজের মজ্জায়-মজ্জায় পাপ প্রবেশ করিয়া আছে বলিয়াই আমাদের এত দুর্দশা, আমরা ত্রিশকোটি নরনারী ভেড়ার পালেরও অধম হইয়াছি। এই হিন্দুসমাজের দোষ সংবরণ করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব। সেই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান একজন হইয়া তুমি রবীন্দ্রনাথ কেমন-ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছ? তুমিও বাঙালীকে কেবল বিলাস শিখাইয়াছ, কেবল রিরংসার ভাবকে বিলাতী পাউডারে মার্জিত করিয়া যুবকদের সম্মুখে ধরিয়াছ। কেবল আদিরসের কবি হইয়া তুমি প্রশংসা অর্জন করিয়াছ। তোমার রচিত একটা গান বিলাতী সভ্যতার সোনার তবকে মোড়া নিধুর টপ্পামাত্র। তোমার গালাগালি হিন্দুতে সহিবে কেন? কেবল ভোগে-সুখে জীবন কাটাইলে, বাঙালীর দুঃখ ও ব্যথা কখনও বুঝিলে না, বাঙালীর জন্য একটা এমন-কিছু আজ পর্যন্ত করিতে পারো নাই যাহাতে তোমার ত্যাগবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। দেবতার আসনে বসিয়া বাঙালীর নিকট হইতে কেবল প্রশংসার পুষ্পাঞ্জলি পাইয়াছ এবং লইতেছ, এবং প্রতিদানস্বরূপ বাঙালীকে কেবল গালাগালি করিতেছ।..." (প্রবাহিণী, ১৭ ফাল্গুন, ১৩২১)।

অত্যন্ত অনুচিত এই লেখা, কিন্তু পাঁচকড়ির পক্ষে আন্তরিক।

পাঁচকড়িকে কিন্তু গভীর বিষণ্ণ মুহূর্তে নয়, লঘু চপল ক্ষণেই দেখতে সাধারণ বাঙালী পাঠক অভ্যস্ত এবং আমোদিত। বছরের পর বছর তামাশা চালিয়ে গেছেন। তবে যেখানে সুরেশ সমাজপতির লেখায় জ্বালা ও দংশন অত্যধিক, সেখানে পাঁচকড়ি সরস কৌতুকে জোর দিতেন বেশি। এ-ধরনের লেখা বেরুত, আর পরচর্চায় আমোদী বাঙালী পাঠক খুশি হয়ে উঠত যৎপরোনাস্তি।—" 'নায়ক—বাবু, নায়ক! পাঁচকড়িবাবু ভারি গাল দিয়েছেন'—কলিকাতার পথে ট্রামের ধারে কাগজওয়ালারা হাঁকিতেছে, আর ট্রামের যত লোক হাসিয়া ঢলিয়া অমনি কাগজ কিনিয়া গালি পড়িয়া আনন্দে লুটি-কাটি

হইতেছে"—এই দুঃখদায়ক দৃশ্যের কথা 'ভারতী' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল পাঁচকড়ির মৃত্যুতে শোক-নিবন্ধে।৩

॥ ৪ ॥

পাঠকের এই 'হাসিয়া ঢলিয়া' পড়াতে স্বয়ং পাঁচকড়ি কতখানি খুশি হতেন? অবশ্যই খুশি কারণ হাসির অধিকারকে তিনি ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন না এবং হাসি যদি মূল্যে বিকায়, সেই মূল্যকেও। কিন্তু পাঁচকড়ির গোটা মন এতে সাড়া দিত না। একটা ব্যথা ফেনিয়ে উঠত কণ্ঠে, যখন দেখতেন, দিনের পর দিন টাকার বিনিময়ে তাঁকে বিদূষকবৃত্তি করতে হচ্ছে (নিজের সম্বন্ধে আরও কঠিন কথা ব্যবহার করেছেন—'গণিকাবৃত্তি')—কিন্তু হায়, বিদূষকের হাসির তলায় চাপা কান্না কেউ দেখছে না স্থূল উত্তেজনায়। সেইখানেই পাঁচকড়ির জীবনের ট্রাজেডি। মর্মান্তিক আত্মদংশন করে লিখেছেন :

"আমরা তো কলিকাতার সকল বড় সমাচারপত্রের দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া এঁটোপাত চাটিয়া বেড়াইয়াছি। আমরা জানি, আজকাল খবরের কাগজ ব্যবসায় হিসেবেই লোকে চালাইয়া থাকে। অধিকারী মহাশয়গণ মনে করেন, আমি তো দেশছাড়া নহি, আমার উপকারে দেশের উপকার হইবেই।...

"স্কুল মাস্টারী ছাড়িয়া যখন কলিকাতায় প্রথম খবরের কাগজের চাকরী করিতে আসি, তখন সত্যই মনে করিয়াছিলাম যে, দেশের ও দশের কাজ করিতেছি। কিন্তু আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন। তিনি তখন 'দৈনিক' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ধীরে-ধীরে কলিকাতার ব্যাপার যত দেখিতে লাগিলাম, ততই হাড়ে-হাড়ে বুঝিতে পারিলাম যে, এ-সব দেশের কাজ নহে, পেটের কাজ ; পেটের দায়ে খবরের কাগজ চালানো হইতেছে। সেই অবধি ধুয়া ধরিয়াছি—পেটের দায়। যদিচ প্রকৃতপক্ষে গোড়ায় পেটের দায়ে আমি একাজে আসি নাই।

"ইহারা—খবরের কাগজের ব্যবসাদারগণ—উচ্চাঙ্গের ব্যবসাদার নহেন। সবাই বামুন ব্যবসাদার—গরু পুষিব, সে গরু খাইবে কম, দুধ দিবে অত্যধিক, নাদিবেও তাল—ইহাই হইল অধিকারীদের রীতি। উঁহারা বেতন দিয়া সম্পাদক রাখিবেন বটে, কিন্তু বেতন দিবেন কম ; তাহাদের উৎসাহ দিবেন না, কাজ শিখিবার পথ দেখাইয়া দিবেন না। কাজেই যেমন দক্ষিণা, তেমনই পূজা।...

"'বিকায় যে—!' কথাটা রঙ্গের নহে, তীব্র বেদনার, বড়ই ক্ষোভের ও লজ্জার। ব্রাহ্মণ আমি, আমাকে বিক্রয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাগজে কলমে এক করিতে হয়। আজ এই কুড়ি বৎসরকাল কলিকাতায় খবরের কাগজে ভাঁড়ামী করিলাম ; ভাঁড়ামী বিকায় বলিয়া সকলে আমাকে রাখে ; আমাকে দেখিয়া, আমার আমিত্বের পরিচয় লইয়া, কেহ আমার প্রতিপালন করিল না। বিকায় যে—তাই আমার আদর। কাজেই

বলিতে হয়, আমার ক্ষুধার অন্ন আমাকে নিজে অর্জন করিয়া লইতে হইতেছে। তোমাদের কাছে বিকায় যে, তাই পাঁটার ঘুগ্‌নী, হাঁসের ডিমের ডালনা, মাছের কাঁকিল-ভাজা বেচিয়া উদরান্নের সংস্থান করিয়া থাকি। দেশ কই?—দেশের ভাবনা ভাবেই বা কে? দেশকে ও দশকে চিনেই বা-কে! দেশ ত আমি, আমি উদ্ধার করিলে দেশ উদ্ধার হইবে, আমাকে পোষণ করিলে দেশের মঙ্গল হইবে।···দেশের দোহাই দিয়া কতজনে কোটা বালাখানা গড়িল, দশ পাঁচ লাখ জমাইল, কাঠকুড়ানীর বেটা চন্দনবিলাসী হইয়া দাঁড়াইল। তাই ক্ষুব্ধ চিত্তে বলিতে হয়—এ তো দেশসেবা নহে, সাফ পেটের দায়। শ্লেষের অন্তরালে যেমন পাথর-চাপা কাতর ক্রন্দন লুকান আছে, ব্যঙ্গের পার্শ্বে দীর্ঘশ্বাস ফুটিতেছে—হে রসহীন, বোধহীন, রোগাতুর, তাহা তুমি বুঝিবে কি?···কাঁদিলে কেহ শুনে না, বুঝে না, তাই হাসিতে হয়। হায় বিধি। হাসিও যে কত ব্যথার হাসি, তাহাও ইহারা বুঝিল না!" (প্রবাহিণী—২৭ পৌষ, ১৩২১)

যাদের হাসিয়ে পাঁচকড়ি রোজগার করতেন, তাদের বিকট হাসিতে তিনি স্বয়ং ঘৃণায় শিউরে উঠতেন অনেক সময়। তাঁর তিক্ততম রচনার একটু অংশ—জুগুপ্সায় রি-রি করা তাঁর কণ্ঠের স্বর—

"কিসের আমোদই তেমন আছে যে, বড়দিনের আমোদ নাই বলিয়া ক্ষোভ করিব? সামাজিকতা কমিলেই আমোদ-প্রমোদ কমিয়া যায়। দশজনকে সঙ্গে না লইলে তো আমোদ হয় না। এখন দশজনের সহিত মিলিয়া চলিতেই কেহ ভালবাসে না। আমার মোটর হউক, আমার কোঠা বালাখানা হউক, আমি বিলাসের পাঁকে হাঁসের মতো কেবল থাঁক-থাঁক করিয়া বেড়াই, লোকে দূর হইতে তাহাই দেখুক। ইহাই হইল আজকালকার চূড়ান্ত বাবুয়ানা। আগেকার বাবুরা কামপন্থী রাখিত, বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে লইয়া আমোদ করিবে বলিয়া। বাগানবাড়ি, নাচগান, খানাপিনা হইত, দশজনে আনন্দ পাইত। এখন বেশ্যা রাখা বন্ধ হয় নাই, বরং বাড়িয়াছে, কিন্তু এখন বেশ্যাকে স্ত্রীর মতন করিয়া রাখে, লুকাইয়া যায়, লুকাইয়া থাকে—আর লুকাইয়া শূকর-জীবনের সুখ অনুভব করে। বলিব কি লজ্জার কথা, চাঁদা করিয়া, লিমিটেড কোম্পানী করিয়া, বাবুরা এখন বেশ্যা রাখে। এমন শূকরী প্রবৃত্তি যে-সমাজে বাড়িয়াছে, সে সমাজে কি আর আমোদ থাকে—না আমোদ থাকিতে পারে?

"আমোদ নাই কিন্তু চাতুরী আছে, কাপট্য শাঠ্য বেজায় বাড়িয়াছে। সবাই সাধু, সবাই যীশুখ্রীস্ট বা বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য বা রামকৃষ্ণ সাজিতে চায়।···

"হাসিব কাহাকে লইয়া, হাসির কথা আর নাই। বিধি নিষেধের গণ্ডী কাটিবার ব্যর্থ চেষ্টা লইয়া শ্লেষ বিদ্রূপের হাসি হাসিতে হয়। কিন্তু যে-সমাজে বিধি-নিষেধ নাই, যাহার যেমন ইচ্ছা সে তেমনই করিতেছে, সঙ্কোচ নাই, কর্তব্যাকর্তব্যের বিচার নাই, সে সমাজে হাসির কি আছে? যেখানে কোনো বালাই নাই, সেখানে হাসিও নাই, কান্নাও নাই—আছে কেবল পৈশাচ তাণ্ডব—টাকা-টাকা করিয়া ফেরুপালের হাহারব, বিলাস-

ব্যথায় পাগল হইয়া বিলাসীর চীৎকার। এখানে কি হাসিতে আছে ! এ যে মহাশ্মশান ! হাসিতে নাই বলিয়া অমৃতলাল নীরব, হাসিতে নাই বলিয়া গিরিশচন্দ্র ও ইন্দ্রনাথ স্বর্গে, অক্ষয়চন্দ্র কেবল তীর্থযাত্রায় যাইয়া মহাযাত্রার জোগাড় করিতেছেন। হাসিতে নাই বলিয়া বাংলায়, কলিকাতায়, আমোদ-প্রমোদ নাই, দেখাসাক্ষাৎ নাই, রাগরোষ নাই, মানাভিমান নাই।—ছিঃ হাসে কি !" (ঐ ১৩ পৌষ, ১৩২১)

পাঁচকড়ি তাই মুক্তি চেয়েছেন বারবার—ঘৃণার অন্ন খুঁটে জীবনযাপনের গ্লানি থেকে। পিতৃভক্ত পুত্র,[৪] সংসারী মানুষ, বৃহৎ পরিবারের দায় ঘাড়ের উপর—ক্লান্ত পদে পৃথিবীর পথে বোঝা বয়ে যখন চলেছেন—আত্মনাশ করতে হয়েছে বারবার—নিজের শ্রদ্ধার পাত্রদের নিন্দার বিনিময়ে আহার্য সংগ্রহ করতে হয়েছে তাঁকে, বাংলা দেশের সবচেয়ে অস্থির নীতির আদর্শহীন সাংবাদিকরূপে নিন্দিত হয়েছেন অবিরত। তাঁর জীবনের সেই সুগভীর দুর্ভাগ্যকে ফুটিয়েছেন অমৃতলাল বসু :

"সম্পাদকের জীবন অনেকটাই মোসাহেবের জীবন। মোসাহেব যখন যে বাবুর কাছে বসে, তখন সে সেই বাবুর প্রশংসা করে ও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর নিন্দা করে। একজন প্রত্যক্ষ তাহার প্রশংসা শুনিয়া পারিতোষিক দেন, প্রতিপক্ষও পরোক্ষে নিন্দা শুনিয়া, তাহার উদ্দেশে তিরস্কার করেন।··

"পাঁচু ছিল একে সম্পাদক, তাহার উপর সবেমাত্র পাঁচকড়ি। প্রাচীন পিতামাতা জীবিত, পুত্র কলত্রও ছিল, সুতরাং পাঁচকড়ি থেকে সাতকড়ি বা ন'কড়ি হইবার চেষ্টা বেচারাকে অহোরাত্র করিতে হইত। এই অবস্থায় পায়ের পেশী খুব শক্ত না হইলে বরাবর সোজা খাড়া থাকা সব সময় তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। একে সোনায় একটু খাদ না মিশাইলে গড়ন হয় না, তাহার উপর যে-পিতাকে তাঁহার তৃতীয়া তনয়ার বিবাহের অলংকার ত্রাসন দ্বিতীয় দফা বাঁধা রাখিয়া গড়াইতে দিতে হয়, তাঁহাকে একটু ইশারা ইঙ্গিতে মিস্ত্রী মহাশয়কে বলিয়া দিতেই হয়, 'সোনাটা উরির ভিতর একটু—বুঝেছ ত—যাতে অল্প খয়ে—বুঝেছ ত' ?"

পাঁচকড়ির আত্মঘাতী প্রতিভার সামনে দাঁড়িয়ে 'দুঃখ' করেছেন অনেকে—'হাহাকার' করেছেন তিনি স্বয়ং। 'প্রবাহিণী' পত্রিকার ভার যখন পেলেন, স্থির করলেন, এই পত্রিকার মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় রূপ—গভীর রূপকে—উন্মোচন করবেন। "নিবেদনে" লিখলেন : "প্রবাহিণীকে বিদ্বজ্জন সমাজের চিত্তবিনোদনী করিবার আমাদের অভিলাষ। ধর্মকথা, সমাজকথা, কাব্যশাস্ত্রের কথা—চিত্তবিনোদনের জন্ত যে-সকল বিষয় সভাসমাজে চিরকালই নির্দিষ্ট রহিয়াছে, সেইসকল কথা কহিবার জন্তই আমরা কৃতসংকল্প হইয়াছি। রাজনীতির পাঁক ঘাঁটিয়া তো এতদিন কাটাইলাম। তাহাতে লাভ তো কিছু হইল না। ···এখন সে পঙ্কশায় হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতেছি। আশা আছে, প্রবাহিণী এ পঙ্কাশয় হইতে অধমকে উদ্ধার করিতে পারিবে।" (মাঘ ১৭, ১৩২০)

কিন্তু 'আশার ছলনে ভুলি !' কিংবা 'সকলি গরল ভেল।' কয়েক সপ্তাহ প্রবাহিণী

চালিয়ে, তার অভূতপূর্ব সমাদরে উল্লসিত পাঁচকড়ি লিখেছিলেন : "এই কয় সপ্তাহ প্রবাহিণী চালাইয়া বুঝিয়াছি যে, দেশের লোকের, বিষজ্জন সমাজের রুচি অনেকটা পরিবর্তিত হইয়াছে।...অনেকে বলেন, রঙ্গভঙ্গ না করিলে, গালাগালি না দিলে, কাগজ বিকায় না।...কথাটা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।" অথচ কিছুদিনের মধ্যে জানানো হল, এই পত্রিকায় রঙ্গব্যঙ্গের পরিমাণ বাড়ানো হবে!! কিন্তু কেন? পত্রিকার আর্থিক প্রয়োজনে—নাকি পাঁচকড়ির পক্ষে 'রঙ্গব্যঙ্গ' বাদ দিয়ে চলা সম্ভব ছিল না বলে? ঠিক উত্তর জানি না, সম্ভবত দুটোই সত্য। এবং এই পত্রিকার ক্ষেত্রেও, অন্য পত্রিকার মতোই, পাঁচকড়ির ভাগ্যের পরিহাস তীব্রাকারে দেখা গেল। কয়েক মাসের মধ্যে পাঁচকড়ি মালিকের সঙ্গে মতভেদের ফলে কর্মচ্যুত হলেন। তারপরে উভয় পক্ষে কদর্য খেউড়।[৫] কিন্তু পাঁচকড়ি ছাড়া 'প্রবাহিণী' গতিহীন, অতএব তাঁকে ফেরাতেই হল অল্পদিনের মধ্যে। প্রবাহিণীতে পাঁচকড়ির একটি রচনা বেরুল (২১ অগ্রহায়ণ, ১৩২১) —'আবার আসিলাম'—যেমন গভীর, তেমনি ভাবাবেগপূর্ণ, সমস্ত নিন্দা গ্লানির উপরে বিষাদ মধুর ছায়াপাত

"আমি আবার আসিলাম। ছিলাম না বলিয়া তোমরা কেহ রাগ করিও না, আমার দশাই ঐ। আমি কখনও থাকি, কখনও লুকাই, কখনও হাসি, কখনো-বা কাঁদিয়া পালাই। বড় সাধ করিয়া প্রবাহিণীকে আনিয়াছিলাম।...

"আমি আবার আসিলাম, হাসিতে, নাচিতে, আনন্দের নয়নধারায় পরিপ্লাত হইতে, যশোদার দুলালকে কোলে করিয়া খেলাইতে, হাসাইতে, আমার মানবজন্ম সার্থক করিতে—আবার আসিলাম। আমার মান নাই, অপমান নাই, রাগ নাই, রোষ নাই, স্মৃতি নাই, বিস্মৃতি নাই।"

॥ ৫ ॥

বেশ কিছু তথ্য দিয়েছি সাময়িক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে, সংগৃহীত হয়ে আছে আরও সংবাদ যা দেওয়া বর্তমানে সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস, এইসব তথ্য থেকে পাঁচকড়ির রচনারীতি ও ব্যক্তিচরিত্রের একটা আভাস পেয়েছেন পাঠক। নিশ্চয় তাঁরা দেখেছেন, আপাত বিপরীত গুণের সমন্বয় তিনি। কিংবা বলা চলে, তাঁর মতো জীবন্ত মানুষ নানা বিরোধী শক্তির সমাহার না হয়ে পারেন না। অত্যন্ত মজলিসী, সদালাপী, সুরসিক মানুষ ছিলেন, বচনপটুতা বৈঠকখানা থেকে সভাস্থল পর্যন্ত প্রবাহিত হত সবেগে, স্বচ্ছন্দে। তিনি প্রথম শ্রেণীর বক্তা ছিলেন, যে-কোনো বিষয়কে মনোহারী করে প্রকাশ করায় তাঁর বিরল দক্ষতা ছিল, বাংলার মতো ইংরেজী ভাষাতেও স্বচ্ছন্দ ভাষণ দিতে পারতেন।[৬] ইংরেজী ও বাংলায় বিপিনচন্দ্র পাল আরও বড় বাগ্মী, কিন্তু পাঁচকড়ির সরস সহাস্য জীবনদৃষ্টি তাঁর ছিল না—বক্তৃতাতে তা ফুটত না। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনেছি, পাঁচকড়ির বক্তৃতার পর আর কারও বক্তৃতা জমত না। বক্তৃতাকালে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের, জাতীয়তার জয়ধ্বনি দিতেন। কিন্তু একথাও শুনেছি,

তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ ব্যক্তিরাও তাঁকে গম্ভীররূপে নিতে চাইতেন না। কারণ নিশ্চয়ই—পাঁচকড়ির সাংবাদিক জীবনের পেশাদারী রূপ—লেখকরূপে তাঁর মতের নীতিহীনতা। সকলে জানত, তিনিও কখনো সেকথা গোপন করেন নি—তিনি পেটের দায়ে লেখেন; পেটের দায়ে দুই বিপরীত মতকে প্রবলভাবে উপস্থিত করেন একই কালে ভিন্ন স্থানে। বাংলা দেশের আদর্শবাদ, তাঁর এই নির্বিচার মক্কেল-সেবাবৃত্তিকে তৃপ্ত মনে নিতে পারেনি। অপরদিকে পাঁচকড়ি হয়ত তাঁর অর্থনীতিবাদের প্রতি নিষ্ঠা বজায় রেখে ভাবতেন—আমার মক্কেল আমার কাছে তার উক্তি অনুযায়ী সাধু—সুতরাং তার পক্ষ সমর্থনে দোষ কোথায়? পাঁচকড়ি আরও জানতেন, প্রতি জিনিসেরই নানা দিক থাকে; সেই বিভিন্ন ও বিচিত্র দিককে উন্মোচন করার মধ্যে বুদ্ধির লক্ষণ আছে। বাংলা দেশের প্রখর 'ন্যায়' বুদ্ধিতে প্রদীপ্ত থাকত তাঁর প্রতিভা। সেই সঙ্গে তাঁর বংশমর্যাদা ও আত্মমর্যাদা জন্মগত ব্রহ্মণ্যগৌরবের প্রাপ্য বুঝে নিতে সতর্ক ছিল, যদিও একই সঙ্গে বলা যায়, তিনি অতিরিক্ত আচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন না—এ কথা তাঁর নাতি অধ্যাপক বিষ্ণুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যে তাঁর অধিকার যথেষ্ট ছিল এবং পাশ্চাত্য যুক্তিবাদে তাঁর মনের দ্বার বেড়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে, চণ্ডীমণ্ডপের ঘোঁট, বৈঠকখানার আমোদ, ভট্টপল্লীর 'ন্যায়', টোলের পণ্ডিতী, ইউরোপীয় যুক্তি ও সংশয়বোধ—সেই সঙ্গে মুক্তিকাজ্ঞাত আদর্শবাদ—সব জড়ানো বিচিত্র মানুষ ছিলেন।

পাঁচকড়ির ব্যক্তিত্বকে সহজতর করে বুঝতে চাইলে—তিনি তাঁর "সাহিত্যগুরু" ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ে যা লিখেছিলেন—তার মধ্যেই সূত্র পাব। পাঁচকড়ি ইন্দ্রনাথের কাছে ঋণ স্বীকারে অকুণ্ঠ, সাহিত্যপন্থায় তিনি ইন্দ্রনাথের অনুগামী। ইন্দ্রনাথের উপর লেখা তাঁর দুটি প্রবন্ধ আমরা দেখেছি। তার একটিতে তিনি ইন্দ্রনাথের ব্যক্তিচরিত্র ও লেখকচরিত্রের যে-সকল দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেগুলি আসলে তাঁর নিজেরই আত্মউন্মোচন। পাঁচকড়ির মতে, ইন্দ্রনাথ ইংরেজী-শিক্ষিত কিন্তু খাঁটি বাঙালী; তিনি স্যাটায়ার-এর রাজা, তাঁর ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যমূলক, যার ভিতরে বহমান আছে করুণাধারা; তিনি সমাজতত্ত্ব ব্যাখ্যায় ও হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী; তিনি ভারতবর্ষকে ভালবেসেও বিশেষভাবে বাংলা-প্রেমিক, এবং তার সমস্যা বিষয়ে সচেতন; বাংলা ভাষার চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর বহু চিন্তা ছিল এবং এই ভাষার tone ও instinct সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা ছিল, ইত্যাদি। এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটি ইন্দ্রনাথের মাধ্যমে পাঁচকড়ির আত্ম-আবিষ্কার। তথাপি মনে রাখতে হবে, ইন্দ্রনাথের ব্রাহ্মণ-গোঁড়ামি পাঁচকড়ির ছিল না। বিচিত্র হল, পাঁচকড়ির সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত রক্ষণশীল বঙ্গবাসী থেকেই হয় এবং যতদিন তিনি বঙ্গবাসীতে ছিলেন, বঙ্গবাসীর নীতিকে অবশ্যই সমর্থন করে চলেছিলেন, কিন্তু বেশি দিন টিকতে পারেন নি। বঙ্গবাসীর গোঁড়ামিকে শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পারাই তার কারণ কিনা কে জানে। এবিষয়ে অমৃতবাজারের মন্তব্যের মর্মানুবাদ দিচ্ছি:

"কলকাতায় এসে বঙ্গবাসী কাগজে প্রথম যোগদান করলেও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার যোগ্য প্রকাশক্ষেত্র ঐ পত্রিকা ছিল না। বঙ্গবাসী শেষ পর্যায়ে যেরকম দারুণ গোঁড়া হয়ে উঠেছিল—পাঁচকড়ি ঠিক তেমন আপসহীন গোঁড়া ছিলেন না। 'সন্ধ্যা'-র জন্ম ও নূতন জাতীয়তার উদয়ের সময় থেকে তাঁর অপূর্ব লেখনীর মুক্তি ঘটল—'সন্ধ্যা'র মধ্যে তাঁর চিত্তপ্রোথিত রক্ষণশীলতার সঙ্গে যুগপ্রয়োজনের সমন্বয় ঘটল। 'সন্ধ্যা'—স্বাস্থ্যকর ও সাধু রক্ষণশীলতার বাহক, আর এই নব জাতীয়তা ও নবরক্ষণশীলতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক পাঁচকড়ি।"

॥ ৬ ॥

পাঁচকড়ির কর্মের সঙ্গে ধর্মের বিরোধের একটি আকর্ষক দৃষ্টান্ত দেব। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান ও পরবর্তী প্রচারকার্য শেষ করে দেশে ফেরেন, তখন বঙ্গবাসী পত্রিকা, তিনি আর হিন্দু নন বলে প্রচণ্ড কোলাহল তুলেছিল—কেন-না তিনি কালাপানির পারে গিয়ে জাত হারিয়েছেন, এবং 'শূদ্র' হয়েও সন্ন্যাসী হয়েছেন। বঙ্গবাসীর ঐ চেঁচামেচির ফলেই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বিবেকানন্দের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। এই সমস্ত ব্যাপার যখন ঘটেছে, তখন পাঁচকড়িই ছিলেন বঙ্গবাসীর প্রধান সম্পাদক। অথচ পাঁচকড়ি বিবেকানন্দের নিতান্ত গুণমুগ্ধ, তাঁর শোকসভায় দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগত স্মৃতিসহ তাঁর গুণকীর্তন করেছেন, 'শুকদেব' নামক এক রচনায় শুকদেবের মতো আশ্চর্য পৌরাণিক চরিত্রের একমাত্র আধুনিক তুলনা বিবেকানন্দ, একথা জানিয়েছেন। মজার কথা, বঙ্গবাসী ছাড়ার পরে পাঁচকড়িই আবার সমুদ্রযাত্রার সমর্থক এবং সমুদ্রযাত্রাবিরোধী ব্রাহ্মণসভার কঠোর সমালোচক। ব্যাপারটা এখনেই শেষ নয়। সুরেশ সমাজপতির দেহান্তের পরে পাঁচকড়ি ১৩২৭ সনে যখন 'সাহিত্য' পত্রিকার ভার নিলেন, তখন ঐ পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য নামক এক মূর্তিমান রূঢ় রক্ষণশীলতার দ্বারা রচিত অতিশয় বিদ্বেষপূর্ণ কতকগুলি লেখা বেরুল। (পাঁচকড়ি স্বয়ং স্বীকার করেছেন, লেখাগুলিতে 'রীষ্'-এর বিষ যথেষ্ট)। যে-পাঁচকড়ি সম্পাদকরূপে এই রচনাগুলি প্রকাশ করেছিলেন, তিনি কয়েক বৎসর পূর্বে 'ভগবান রামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বের মহিমা প্রচার করেছেন, এবং সাক্ষাৎ স্মৃতি থেকে জানিয়েছিলেন, বিবেকানন্দের মহাভাবের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে পাঁচকড়ি প্রত্যক্ষে জানতেন।—

"তাহার [বিবেকানন্দের] ইংরাজি বিদ্যার বহর জানিতাম।···বিবেকানন্দে ইয়োরোপের তেজস্বিতা, মানবতা এবং ভারতের ভক্তি, বিশ্বাস, একনিষ্ঠা, সংযম ও সাধনা পুরামাত্রায় ছিল।···ধর্ম ও সাধনার উপর জাতীয়তার পালিশ চড়াইয়া, সেবাব্রতকে জাতীয় ধর্মে পরিণত করিয়া, বিবেকানন্দ—সব্যসাচী অর্জুনের ন্যায়—ভোগবতীর জল টানিয়া শুষ্ক তৃষ্ণার্ত সমাজের উপরের স্তরগুলিকে স্নিগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গরীব-দুঃখী, মূর্খ-পণ্ডিত সবাই এখন একসূত্রে বাঁধা হইয়াছে; সবাই এক আদর্শের

দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন। যে মন্ত্রের প্রভাবে বিলাসী বাবু সন্ন্যাসী হইতে পারে, রোগীর রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া অহর্নিশ সেবা করিতে পারে, প্লেগে ভয় পায় না, বসন্তরোগী দেখিলে সংকুচিত হয় না, উত্তাল তরঙ্গসংকুল সাগরসঙ্গমে ঝম্পপ্রদান করিতে ইতস্তত করে না—সে মন্ত্রই বা কেমন, সে মন্ত্রীই বা কেমন—একবার ভাবিয়া দেখো দেখি।...

"তেমন সরল হাস্যময় মিত্র, তেমন তেজস্বী সত্যসন্ধ সহচর আর কখনও দেখি নাই। তাহাকে ফাঁকি দিবার জো-টি ছিল না, মনের কথাটি টানিয়া বাহির করিত। তাহার কখনও অভিমান ছিল না। আমি একজন পণ্ডিত, আমি একজন বড় বক্তা—মিত্র-সংসর্গে এ-ভাবটা তাহার কখনই ফুটিয়া উঠিত না। বিবেকানন্দ একজন বড়দরের ভক্ত ছিলেন। গোপনে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিতে-করিতে অনেক সময় তাঁহাতে মহাভাবের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু তিনি সে-ভাব চাপিয়া রাখিতেন। একবার ভক্তি-সূত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন—'না ভাই, আমায় মজাইও না। আমি তাল সামলাইতে পারিব না। আমার যে-কাজ সে-কাজ এখনও তো শেষ হয় নাই। আমার ও-দিকটা ফুটাইও না—আমি পাগল হইব।' গান গাহিতে-গাহিতে বিবেকানন্দ এক-এক সময় সত্যই মূর্ছিত হইয়া পড়িতেন। একদিন আমার কন্যাকে লইয়া—'তেমনি —তেমনি—তেমনি ক'রে নাচো দেখি শ্যামা'—এই গানটি গাহিতে-গাহিতে, চারি বৎসরের কন্যাটিকে নাচাইতে-নাচাইতে, বিবেকানন্দ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর মেয়েটিও তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া, তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, স্থির নিস্পন্দবৎ তাঁহার বুকের উপর শুইয়াছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ এ-ভাব প্রায়ই চাপিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'ভাখ, এই ভাবের বাড়াবাড়ি হওয়াতেই আমরা কলা খেয়ে বসেছি। পৃথিবীতে এমন মদ নেই যাকে ভক্তিরসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সকল মদের সেরা ভক্তি-মদ। সেই মদ খেয়ে বাঙালী চার-শো বছর মাতাল হ'য়ে ছিল। আর ও-মদ চালানো ঠিক নয়।' তাই বিবেকানন্দ কর্ম-জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়া বক্তৃতা করিতেন।" [প্রবাহিণী, ২৩ ফাল্গুন ১৩২০]

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর এমন অত্যুচ্চ শ্রদ্ধা যেখানে, সেখানে ঐ ধরনের বিদ্বিষ্ট রচনা প্রকাশের কারণ কি? পাঁচকড়ির কৈফিয়ত—তিনি বুদ্ধির মুক্তি চান: দার্শনিক আলোচনা চলুক দেশে, বিচার চলুক, সকলে যুক্তিসহ নিজ মত প্রকাশ করুক। পাঁচকড়ি জানিয়েছিলেন, সাহিত্য পত্রিকার প্রাণ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যদিও বিবেকানন্দের পরম ভক্ত, (এবং রামকৃষ্ণের অবতারত্বে আস্থাবান), তিনিও যুক্তিপূর্ণ, বিরোধী রচনা প্রকাশের বিরোধী ছিলেন না। বুদ্ধের বিরুদ্ধে কি শঙ্কর লেখেন নি, কিংবা শঙ্করের বিরুদ্ধে রামানুজ?—পাঁচকড়ি বলতে চেয়েছিলেন।

পাঠকদের কাছে, বৃহত্তর বাঙালী সমাজের বড়ো অংশের কাছে, এই কৈফিয়ত যথেষ্ট মনে হয়নি। তাঁরা ঐ রচনা প্রকাশের মধ্যে পাঁচকড়ির কুৎসা-বিক্রীর ফন্দী দেখেছিলেন, এবং 'সাহিত্য' বয়কটের আয়োজন হয়েছিল। পাঁচকড়ি এইখানে হিসাবে

কিছু ভুল করেছিলেন। স্বাধীন বিচারের সুযোগ-দানের জন্য, কিংবা শশধর তর্কচূড়ামণির ভক্ত পদ্মনাথের প্রতি দুর্বলতার জন্য, (পাঁচকড়িও শশধরের প্রতি অনুরক্ত) কিংবা কাগজ বিক্রী বাড়ানোর জন্য, কিংবা মঙ্গলকাব্যের কবি যেমন স্বীয় দেবতাকে মাঝে মাঝে ডুবিয়ে আমোদ পান সেই সুখের জন্য—যে কারণের জন্যই তিনি ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করে থাকুন, বাংলা দেশের সমাজজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি দেশের নাড়ি বুঝতে পারেন নি। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে যে-বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে বঙ্গবাসী পত্রিকায় যথেচ্ছ লেখা যায়, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বিষয়ে তা করা যায় না, কারণ বাংলা দেশের সংগ্রামী মন ইতিমধ্যে বিবেকানন্দের প্রাণ-শক্তির ঐশ্বর্যে লড়ায়ে নেমেছে, তাঁর পবিত্র স্মৃতি সম্বন্ধে বুদ্ধির চালাকি সহ্য করতে তারা প্রস্তুত নয়।

অথচ আমার বিশ্বাস, পাঁচকড়ি রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দকে অপমান করবার জন্য সত্যই ঐ রচনাগুলি ছাপেন নি। যদি কারো প্রতি তাঁর স্থায়ী শ্রদ্ধা থাকে—এঁদেরই প্রতি। তিনি স্বয়ং এঁদের জীবনের তাৎপর্য নির্ণয়ে অংশ নিতে চাইছিলেন, বিতর্কের আবর্ত ঘুলিয়ে ওঠার ফলে তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন। গোঁড়া পদ্মনাথ যেখানে কোনো বিশেষ সময়ের স্মৃতিশাস্ত্রের চকমকি ঠুকে ফিনকি আলোয় ব্যক্তির আচরণের ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের বিচারে স্বর্গমর্ত্য তোলপাড় করেছেন, সেখানে সমুদ্রলঙ্ঘনকারী, খাদ্যাখাদ্য বিচারে উদাসীন, ভারতীয় ও ইউরোপীয় জ্ঞানে ভূষিত 'কায়েত সাধু' বিবেকানন্দের মধ্যে নূতন শাস্ত্রের জন্ম হয়েছে যা ব্যষ্টিকে গ্রাস করে সমষ্টির জাগরণ ঘটাচ্ছে—এই কথাই পাঁচকড়ি বলতে চেয়েছিলেন। "শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব সমাজের শাসন রঘুনন্দন করিতে পারেন নাই; তেমনি রামকৃষ্ণের শিষ্য-শাখার কর্মের পরিমাণ রঘুনন্দনী গজে হইবে না"—তিনি লিখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের সঙ্গে কথোপকথনের কিছু বিবরণ তিনি নিজের নোটবই থেকে তুলে দিয়েছেন, যার মধ্যে স্বামীজীর সমাজ ও বিশ্বভাবনার এক গভীর-বিশাল রূপ দেখতে পাই :

"গিরিশচন্দ্র ঘোষের গৃহে বসিয়া আলোচনা হয়। স্বামী জিজ্ঞাসিলেন—'পাঁচু, এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে?' উত্তরে আমরা বলিলাম—শ্রীভগবান্। স্বামী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন—'দূর; খাঁটি বামুনের মতো উত্তর দিলি। তোদের বামুনের দোষই এই, তোরা কিছুতেই বামনাই ভুলিতে পারিস নে! ওরে হনুমান, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্কার ছাড়িবি কেমন করিয়া? Iconoclasm-এর ঠেলায় যে, ভগবানের বিশ্বাস টলিয়া গিয়াছে; ভগবান যে মৌখিক আলাপের বিষয় হয়েছে।'

"পাঁচু—তবে তোমরা ধর্মপ্রচারক হয়েছ কিসের জন্য? গেরুয়া পরা কেন? ধর্মে, কর্মে, চিন্তায়, ব্যসনে সজীব ভগবানকে যদি আমদানী করিয়া বসাইতে না পারো, তবে আর করিলে কি? বাংলায় বা ভারতবর্ষে ভগবান ছাড়া কাজ হয়?

"স্বামী—কথাটা খুলিয়া বলিব? এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে—জানিস? আমি—

আমি বিবেকানন্দ কেবল নহি। এই আমরা যে ছয় সাতজন এখানে বসে আছি, আমাদের পরমাত্মা আমিটা জাগিয়া উঠিলে তবে তরঙ্গ রুদ্ধ হইবে। আমি জাগিয়া উঠিব, আমি কর্মময় হইব। কর্ম করিতে করিতে যখন আমাদের হৃদয়গত সকল আমি অন্তরে বুঝিতে পারিবে যে, আমি ছাড়া আর একটা বড় আমি আছে, সে বড় আমির শক্তি অসীম, সে অসীম শক্তির আনুগত্য করিতে না পারিলে কোনো কর্ম ঠিকমত করা চলে না, তখনই শ্রীভগবান্ আসিয়া প্রকট হইবেন। জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে চাই আমিটাকে প্রকট করিতে। বেদান্ত ছাড়া এ কর্ম সিদ্ধ হইবে না। যাহাকে হেয় বলিয়া আমরা বামুন-কায়েত এতদিন দূরে রাখিয়াছি, তাহাদিগকে কোলে তুলিতে হইলে চাই বেদান্ত। আর সবটাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে না পারিলে—প্রত্যেক আমি জাতীয় বিশাল 'আমিতে' পরিণত হইতে না পারিলে--কোনো কাজই হইবে না। তোমার তন্ত্রের বা বৈষ্ণব ধর্মের যুক্তিতর্ক এই ইউরোপীয় সভ্যতা-বিদগ্ধ সমাজে চলিবে না। তাই বেদান্ত—উহার সনাতন সত্য বাণীর প্রচার। কি বলিস ?

"পাঁচু—তা বটে। বেদান্তটাকে, বৌদ্ধ ফিলজফির উপর উপনিষদের মহাবাক্যের সমন্বয় মনে করি। রামানুজ, শঙ্করের মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত বা শূন্যবাদ বলিয়াছেন। তা বেদান্তের সহিত বৌদ্ধ সেবাধর্মটা জড়াইয়া দিলে সকল শঙ্কা দূর হয়। ইংরাজী লেখাপড়া-জানা বুদ্ধিতে এ বেদান্ত লাগছে ভাল। পরন্তু 'আমি' জাগিবে কি ? দেবীসূক্তের 'আমি' ফুটাইতে পারিবে কি ? তা যদি পারো—শিষ্যস্তেঽহং।"

॥ ৭ ॥

পাঁচকড়ি ব্রাহ্মণ হয়েও নিজস্ব-ভাবে বিবেকানন্দের সমষ্টিচৈতন্যের অংশীদার ছিলেন। বাংলার সমাজ ও ধর্মবিষয়ক তাঁর রচনাগুলির মধ্যে ('রচনাবলী' দ্রষ্টব্য) তা যথেষ্ট দেখা যায়। পাঁচকড়ির শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক রচনা তন্ত্রকে কেন্দ্র করে। রচনার সরলতায় অথচ গাঢ়তায়, প্রাণোদ্দীপ্ত নূতন ব্যাখ্যায়, সেগুলি অনবদ্য। পরবর্তীকালে মোহিতলাল মজুমদার এ-বিষয়ে পাঁচকড়ির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত সন্দেহ নেই। ব্রাহ্মণ পাঁচকড়ি ঐসব রচনায় বাংলার সমাজধর্মের মূলে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির মুখ্যত্ব মোটেই স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, ব্রাহ্মণ্যসংস্কার বাংলা দেশে দৃঢ়মূল নয়; বহু চেষ্টাতেও (বহু অপচেষ্টাতেও, পাঁচকড়ি জানিয়েছেন) তাকে গভীরে প্রবেশ করানো যায়নি। সেজন্য বারবার 'ব্রাহ্মণের চাষ' (কিংবা 'আর্যামির চাষ') করতে হয়েছে বাংলা দেশে। বাংলার জাতীয় ধর্ম, এঁর মতে, তন্ত্র। এই তন্ত্র আছে বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তিত রূপে, শাক্ত ও শৈব মতের মধ্যে, এবং বৈষ্ণব মতেও।

তন্ত্র সম্বন্ধে পাঁচকড়ির যথেষ্ট সংখ্যক উৎকৃষ্ট রচনার বিশেষ আলোচনা করা উচিত, বর্তমান প্রসঙ্গে তা সম্ভব নয়। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে তিনি তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় ব্যাখ্যাতা। তন্ত্রকে কেন্দ্রে রেখে তিনি শিব ও শক্তিতত্ত্ব বুঝিয়েছেন—সেই সঙ্গে রাধা ও কৃষ্ণতত্ত্ব এবং মদনতত্ত্ব। তন্ত্রের ইতিহাস

সন্ধান করেছেন ('বাংলাতন্ত্র' প্রবন্ধ); তন্ত্রের মূর্তিপূজা যে জড়োপাসনা নয়, তা প্রতীক উপাসনা এবং সাধকের সাধনার চরিত্রানুসারে 'নিরাকারা কালজননী মহাদ্যুতি কালিকার' রূপবিকাশ ঘটে থাকে—তার ব্যাখ্যা করেছেন ('তন্ত্রে মূর্তিপূজা'); নিজেকে বহুর মধ্যে প্রকাশিত করাই মদনতত্ত্ব বা সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে, সেই তত্ত্বের মূল-সন্ধান করলে তন্ত্রের মধ্যেই পৌঁছতে হবে, সেকথা জানিয়েছেন ('কাম ও মদন'); আর সর্বত্র, সকল প্রবন্ধেই, তন্ত্রের সুগভীর সত্যকে মোচন করেছেন নানা ভাবে: "যাহা আছে দেহভাণ্ডে, তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে", সুতরাং "যত জীব তত শিব, যত নারী, তত শক্তি"। অদ্বৈত বেদান্ত যেখানে বলে সোঽহং, অর্থাৎ তিনিই আমি, তন্ত্র সেখানে নিজের আত্মাকেই ইষ্টদেবতা ক'রে বলে হংসঃ, অর্থাৎ আমিই তিনি। তাই তন্ত্রসাধনার মূল আছে দেহতত্ত্বে ('তন্ত্রের দেহতত্ত্ব')। তন্ত্রের এই উদার সাহসিক সিদ্ধান্তের জন্য সাধনার ক্ষেত্রে যে-কোনো ধর্মের বা বর্ণের বা জাতির নারীকে সাধন-সঙ্গিনী করা চলে; ফলে তন্ত্রপ্রধান বাংলায় অবাধ রক্তমিশ্রণ হতে পেরেছে: "চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত বাংলায় ছত্রিশ জাতিকে এক সূত্রে সমভাবে বন্ধন করিতে তন্ত্র যতটা সহায়তা করিয়াছিল, এত আর কোনো ধর্মই করে নাই।" ('তন্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য')। তন্ত্রের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক বিশ্বাসের বলে তিনি ভাবের ঘরে চুরিকে প্রচণ্ড মার দিতে পেরেছেন, পঞ্চ ম'কারের মতো তথাকথিত ঘৃণ্য বস্তুরও সত্য ঘোষণা করতে পেরেছিলেন সদর্পে। গুপ্তকামকে বিদ্রূপে বিদ্ধ করে লিখেছিলেন:

"খ্রীস্টানী বুদ্ধিতে এখন তন্ত্রের পঞ্চ ম'কারের নিন্দা করিলে চলিবে কেন? আবার মজা এই, যাঁহারা প্রকাশ্যে পঞ্চ ম'কারের নিন্দা করেন, তাঁহাদের অনেকে ভিতরে-ভিতরে এক একজন মিথুন-মাস্টার। কাহারও পত্নী প্রতি-একাদশ মাসের শেষে এক-একটি নব-কুমার বা কুমারী স্বামিচরণে উপঢৌকন দিতেছেন এবং বর্ষে-বর্ষে এমনই উপঢৌকন দিতে শেষে ক্ষয়রোগে তনুত্যাগ করিতেছেন। কেহ-বা গুপ্তভাবে দুই-তিনটি কামপত্নী রাখিয়াছেন। কেহ-বা পরনারী দেখিলে নয়নপথে তাহাদের আড়ে গিলিতে চাহেন। তন্ত্রের দৃষ্টিতে এবম্প্রকারের লাম্পট্য অতি পাতক, মহাপাতক বলিয়া বিবেচিত।" ("পঞ্চ ম'কার")।

বাংলা দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবগুলি সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর লেখা আছে। সেগুলির মধ্যে এ-দেশ ও জাতির জীবনতরঙ্গের ওঠাপড়াকে প্রত্যক্ষ করি। সামাজিক উৎসবের পুরাতন অর্থ ও নূতন তাৎপর্য আবিষ্কারে তাঁর দক্ষতার সীমা ছিল না। ভগিনী নিবেদিতা 'Studies from an Eastern Home' এবং 'Web of Indian life'-এর মধ্যে ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে আরও উন্নত কল্পনায় এবং শ্রেষ্ঠতর রচনাশৈলীতে যে-কাজ করেছেন, পাঁচকড়ি সহজতর ভাবে, অধিকতর শাস্ত্রনিষ্ঠ হয়ে, সেই কাজই করেছেন বাঙালী জীবন বিষয়ে। মহালয়া, দুর্গাপূজা, বসন্ত পঞ্চমী, শিবরাত্রি, জগদ্ধাত্রী পূজা, বাসন্তী পূজা, গন্ধেশ্বরী পূজা, জামাই-ষষ্ঠী প্রভৃতি রচনা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বাংলার

সমাজ ও ধর্মাচরণের মূল্যানুস্কানের, এবং তার ভাবচিত্র আবিষ্কারচেষ্টার পিছনে ছিল পাঁচকড়ির গভীর বাঙালীপ্রীতি। বাঙালীর বিশিষ্টতা, বাঙালীর জাতিপরিচয়, বাংলার উপাসক সম্প্রদায়, বাঙালীর সমাজবিন্যাস সম্বন্ধীয় তাঁর এই সকল রচনা—সমাজতত্ত্ব ও ভাবাবেগের মিশ্রণের ফলে একদা অতিশয় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।—"মনে নাই কি, সন্ন্যাসীর সেই কথাটা। তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভারতের ভাবনা সন্ন্যাসী, যতিসজ্জনে ভাবিবে; স্বদেশের ভাবনা গৃহস্থে ও সামাজিকগণেই ভাবিবেন।' আমি সন্ন্যাসীর এই কথাটা বেদবাক্যের স্থায় মান্ত করি"—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তিকেও পাঁচকড়ি বেদবাক্যের মতো মান্ত করেছিলেন।

বাংলার ধর্মীয় উৎসবই শুধু নয়, জীবনাচরণ সম্বন্ধেও পাঁচকড়ির রচনা উপাদেয়। বাংলায় গ্রামজীবনের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য তিনি অকৃপণচিত্তে বর্ণনা করেছেন, যার বিপরীত দিকে আছে বর্তমান জীবনের দৈন্তের ছবি। একান্নবর্তী পরিবারভঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গে পণপ্রথার উদ্ভব কি করে হল, তার চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন 'বিবাহে পণ' রচনায়। একালের বাঙালীর দেহমনের অসুস্থতার কথা বলেছেন নানা স্থানে—কি করে চাকুরীর লালসা আর ম্যালেরিয়া তার চরিত্র ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে দিল—ইংরেজী সভ্যতার উচ্ছিষ্টভোজী হয়ে সে কিভাবে গ্লানির জীবন যাপন করতে লাগল—সেই কথা ('গোড়ার কথা', 'না এদিক, না ওদিক', 'যায় রে!')। এর উল্টো দিকে—সুখময়, রূপময় দেশ। 'সেকাল আর একাল' তাঁর পরিচিত রচনা; পুরনো বাংলার জীবনযাত্রার তথ্যবহুল আদর্শ এক ছবি তিনি এঁকেছেন ঐ উপভোগ্য লেখায়। ইতিহাসের মধ্যে স্বপ্ন-বিচারণার কালে (কারণ তিনি সুন্দর অংশটুকুতেই দৃষ্টি রেখেছেন) তিনি বাঙালী নারীকে শক্তিতে ও সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যময়ী দেখেছেন,[৭] বাঙালী পুরুষকে কর্মঠ ও আত্মবিশ্বাসী,[৮] আর সামগ্রিক জীবনকে অন্নময় ও প্রাণময়। ধান ছিল লক্ষ্মী, সকলেরই জমিজমা, মরাইভরা ধান থাকত—"গ্রামস্থ কেহই লক্ষ্মী কিনিয়া খাইতেন না।"

সমাজজীবনের অজস্র তথ্য তাঁর লেখা থেকে পাই। সেগুলি এখানে পরিবেশন করা নিশ্চয় সম্ভব নয়, সুতরাং পাঁচকড়ির রচনাবলীর দিকে অগত্যা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ করতে হয়—আপনারা অনুগ্রহ করে লেখাগুলি পাঠ করলে সুখ-বই দুঃখ পাবেন না। হাঁ অন্তত সুখ, কারণ পাঁচকড়ি সরস ভিন্ন প্রায় লিখতেন না। 'রসালতত্ত্ব' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে "রসাল বা আম বা আম্র বা ম্যাঙ্গো'র" ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়ার পর যে-উপদেশবাক্য উচ্চারণ করেছেন, তার চেয়ে কান্তাসম্মিত উপদেশ আমরা অল্পই পড়েছি:

"আম একা খাইতে নাই; ইষ্টদেবতাকে দিয়া, ব্রাহ্মণসজ্জন, পল্লীর প্রতিবেশী সকলকে এবং কাঙ্গাল ফকির সকলকে পরিতোষপূর্বক খাওয়াইয়া তবে নিজ পরিবার-বর্গসহ আম খাইতে হয়।"

লেখক এখানেই থামেননি। কোন্-কোন্ বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁদের উইলে পাড়া-প্রতিবেশী কাঙালীকে আম খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে গেছেন, তার একটা নির্বাচিত তালিকাও দিয়েছেন এবং যেখানে উইলের ব্যবস্থায় ব্যত্যয় হয়েছে, দুঃখ জানিয়েছেন : "মহারাজ বাহাদুর স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের এমনই ব্যবস্থা ছিল এবং বোধ-হয় উইলেও সে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে আজ পর্যন্ত বার্ষিক প্রাপ্য আমের ঝুড়ি পাই না।"

ধর্মঘটে আমাদের এখন যে-পরিমাণ আকর্ষণ তাতে পাঁচকড়ি ধর্মঘটের যে-ইতিকথা জানিয়েছেন, তা উৎসাহী পাঠক সন্ধান করে পড়ে নেবেন বলেই আমার বিশ্বাস,[৯] কিন্তু প্রাচীন বাংলার কুসুম-শিল্প সম্বন্ধে পাঁচকড়ি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যে সংবাদ দিয়েছেন তার অল্প অংশ না তুলে পারছি না :

"রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের হ্যারিংটন স্ট্রীটের ভবনে আমাদিগকে একবার ফুল-দোলের উৎসবে হাজির থাকিতে হইয়াছিল। বৈঠকখানায় প্রবেশ করিবার পূর্বে খানসামা আসিয়া বলিল—'সুতার কাপড় পরিয়া ভিতরে যাইতে পারিবেন না, আমি কাপড় চাদর দিতেছি।' এই বলিয়া সে যূথিকার টানা-পড়েনে তৈয়ারি একখানা ফুলের কাপড় দিল এবং বেলের চাদর দিল। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, সকলেরই এক সাজ—ফুলের ধুতি, ফুলের চাদর, ফুলের উষ্ণীষ, ফুলের আভরণ অলঙ্কার, আর দুই ইঞ্চি মোটা নানা রঙের ফুলের কার্পেট বিছাইয়া তাহারই উপর কীর্তনীয়া কীর্তনের মহাজনপদ গান করিতেছে।"

॥ ৮ ॥

পাঁচকড়ির মননশীল রচনাগুলি যাঁরা পড়বেন, তাঁরা সহজেই লক্ষ্য করবেন—তিনি 'সম্ভাবনায়' বাংলার প্রধান প্রাবন্ধিকদের অন্যতম। আদর্শ গদ্যের বহু গুণ তাঁর রচনায় ছিল—যুক্তির শৃঙ্খলা, ভাষার স্বচ্ছতা, বিষয়নিষ্ঠা, লক্ষ্যমুখে দৃঢ়গতি। আবেগের সঙ্গে জ্ঞানের সহজ সমন্বয় করতে পারতেন, বাংলা ভাষার প্রাণধর্মও বুঝেছিলেন—চলিত বাংলার জীবনীশক্তিকে ধরাতে পেরেছেন সাধু বাংলার কাঠামোর মধ্যে। (বাংলা ভাষার কুলচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর প্রচুর লেখা আছে)। ভাষায় তিনি হেঁয়ালীর বিরোধী ছিলেন, (হেঁয়ালী আমদানির জন্য মুখ্যত দায়ী করেছেন রবীন্দ্রনাথকে);[১০] বিচারবোধ কখনই ত্যাগ করতেন না। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, বিখ্যাত ব্যক্তিদের লোকান্তরের পরে লেখা প্রবন্ধে অযথা শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে, তাঁদের জীবন ও কর্মের সুবিন্যস্ত উপস্থাপন করতেন, যার ফলে তৎক্ষণাৎ-লিখিত সেরকম কয়েকটি লেখা উক্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে পড়ে। এ সকলই সত্য, তবু পাঁচকড়ি সৃষ্টি-মূল্যে প্রথম থাকের গদ্যলেখক নন, এই কারণে যে, গদ্যের সবটাই স্বচ্ছতা বা প্রত্যক্ষতা বা যুক্তিশৃঙ্খলা নয়, সরল ভাবাবেগও নয়—কিছুটা রীতিকৌশল চাই, ভাষার অর্থবহনের ক্ষমতার মতো ব্যঞ্জনার ক্ষমতাও দরকার। রসিকতার ক্ষেত্রে পাঁচকড়ি ইঙ্গিতময় রেখে

পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু অন্তবিধ রচনায় সে পরিচয় থাকত না, কিংবা তাকে ইচ্ছা করে পরিহার করতেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্ততাকে বহুমান দিয়েছেন—কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততা তাঁর রচনার পারিপাট্যের শত্রুতাও করেছে। তিনি অবলীলায় লিখবার সময়ে লীলাটুকুকে অবহেলা করেছেন অনেক সময়। ফলে পাঁচকড়ির লেখায় বক্তব্য পাই, অধিক বক্তব্য পাই না। সাময়িক পত্রের নিত্যদাস হওয়ার জন্ত সন্ত-সেবা করে তুষ্ট করেছেন, কিন্তু ধৈর্য-শান্ত সাধনার সেবায় ভরে দিতে পারেন নি বাণীর মন্দির।

॥ ৯ ॥

পাঁচকড়ির সমাজজিজ্ঞাসা ও জাতীয়তার মুখ ঘোরানো ছিল অতীতের দিকে। বর্তমানে তাঁর আস্থা ছিল না। দেশপ্রেমের তিনি প্রবক্তা, (তাঁর সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস সরকার বাজেয়াপ্ত করে),[১১] কিন্তু পেট্রিয়টিজমের ইউরোপীয় চেহারায় স্বস্তিবোধ করেননি। মৃত্তিকাজাত দেহাত্মবোধ ও দেশাত্মবোধকে এক করে দেখেছিল তাঁর মন।[১২] এ তত্ত্ব তিনি জাতির পুরাতন জীবনচর্যা ও সাধনার মধ্যেই পেয়েছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলকের তিনি ভক্ত ছিলেন, গান্ধীজীকে দেশপ্রেমের অবতার বলেছেন, আশ্বস্ত হয়েছেন গান্ধী-প্রেরণায় ভারতের উত্তাল চেহারা দেখে—কিন্তু পরক্ষণে বিষণ্নতা ছেয়েছে অন্তর—হতাশ শ্রান্ত কণ্ঠে বলেছেন, কোথায় 'মুশকিল আসান'—রাত্রির আঁধারে দীপ ধরে যে পথ দেখাবে! এই অত্যন্ত মজ্‌লিসী মানুষটি নিঃসঙ্গ ছিলেন জীবনের একাংশে। সমসাময়িক দেশহিত-চেষ্টার মধ্যে যখন দেশের মুক্তির সম্ভাবনা দেখতে পেলেন না, তখন তাঁর আশ্বাসকামী মন ভারত ও বিশ্বের মুক্তির উপায় সন্ধান করেছে সন্ন্যাসীদের সাধনার মধ্যে। 'সাধের বউ' ও 'দরিয়া' নামক দুটি উপন্যাসে তাঁর এই আশা-ভরসার কথা তিনি নিবেদন করেছেন। উপন্যাস দুটিকে পাঁচকড়ি উপন্যাস বলেন নি; এর মধ্যে তিনি কতকগুলি 'সিদ্ধান্ত ও কর্মপদ্ধতির' কথা 'কাহিনীর ফলে' ফেলে পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে চেয়েছেন; শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার কয়েকটি ক্রম ফোটানোও এখানে তাঁর অন্যতর উদ্দেশ্য; সেই সঙ্গে ভারতীয় সন্ন্যাসী সমাজের 'বিরাট বিশাল দুর্বোধ্য ব্যাপারের কথা' বলা। যে কাহিনী পাঁচকড়ি বলেছেন, তার মধ্যে আর যাই থাক সংলগ্নতা নেই, ঘটনার উদ্ভট রূপে কল্পনা লজ্জায় অধোমুখ হবে।[১৩] উপন্যাসগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল—উপন্যাস-সাহিত্যের অতিবড় দুর্দিনেই তা হওয়া সম্ভব (যদিও তাত্ত্বিক বক্তব্যের প্রতি বাঙালী পাঠকের আকর্ষণ অন্য সুদিনের ইঙ্গিত করে), কিন্তু এ সকলের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করব, নৈরাশ্য থেকে পাঁচকড়ির পরিত্রাণ-কামনা। সামাজিকের প্রকাশ্য চেষ্টায় যে-মুক্তি হল না তা হবে—পাঁচকড়ির এই সতৃষ্ণ কল্পনা—সন্ন্যাসীর গোপন সাধনায়। বাস্তব ও কল্পনার পুরাতন বিবাদ তাঁর জীবনে, ফলে এই অতি বাস্তববোধসম্পন্ন মানুষটির জীবনের স্থায়ী সুর—'হায় রে!' "আশা মিটে না, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, গগনোপান্ত রেখার মতো যত ধরিতে যাইবে, তত ছুটিয়া পলাইবে।" ('প্রবাহিনী')। তিনি ভাবতে চান, "আমার নাই কি? যুগযুগান্তরের

গৌরবগাথা আছে, বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র আছে, দর্শন উপনিষদ আছে, আমার নাই কি।" ('আমার কথা')। সহর্ষে বলেন: "আমার যাহা নাই, জগতে তাহা নাই, আমার যাহা আছে, বিশ্বের কোনো স্থানে সে সকলের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইবে না।" (ঐ)। কিন্তু এ-সকলই আচ্ছন্ন হয়ে যায় একটি 'হাসির' কথায়—"বলিব কি হাসির কথা, দুঃখই আমার সাধ।" তিনি দেখেন, আশার নদী কখনো সাগরসঙ্গম পায় না, মরুহারা আশা অসহায় কণ্ঠে আর্তনাদ করে:

"কোথায় যাই মা! অন্ধের মতন কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছি? বিদ্যুল্লতার কিরণ-লেখার মতন একবার অঙ্গুলি হেলাইয়া এই অন্ধকার পথ দেখাইয়া দাও! আমি স্থির হই, নির্বাক হইয়া কেবল দেখিতে থাকি। কত বকিতেছি, কত কথা কহিতেছি, কত অতীতের আলোচনা কবিতেছি। শোকাতুরা জননী পুত্রের শব কোলে করিয়া যেমন বিনাইয়া-বিনাইয়া নানা ছাঁদে কাঁদে, তেমনি অতীত স্মৃতির শব ক্রোড়ে করিয়া কত শোকগাথা গান করিলাম! শোকেরও নিবৃত্তি হইল না, গাথারও পরিসমাপ্তি হইল না। আমি যাহা চাই, তাহা পাইলাম না। যাহা ছিল তাহা দেখিলাম না। কে জানে কি ছিল? কিন্তু প্রাণ জানে—কেমন থাকিলে কত সুখ হইত।" ('আশা পথে')

পাঁচকড়ি পেলেন না, কিন্তু পেতে চাইলেন প্রাণপণে, সমাজের উল্টোরথের দড়ি ধরে বললেন, 'ফিরে চল আপন গৃহে'—অথচ সেই আপন ঘর দূরবর্তী রইল চিরদিন; মধ্যবর্তীকালে তাঁর জন্য রইল জীবনের অভিনয়। পাঁচকড়ির ভূমিকার গভীর নাটকীয় রূপকে চিত্রিত করেছেন এক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও নাট্যকার, অমৃতলাল বসু:

"গত তিরিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গের সাধারণ জীবন-নাট্যশালার সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে যে নাটক অভিনয় চলিতেছে, তাহার মধ্যে যে-সকল নটনক্ষত্র প্রবেশ-প্রস্থান করিয়াছে—তাহার মধ্যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মৌলিক চরিত্রের ভূমিকা লইয়া বঙ্গজনরূপ দর্শক-সমাজকে হাসাইয়া, কাঁদাইয়া, শিখাইয়া, মোহিত রাখিয়া এই পুণ্য অগ্রহায়ণেই নিজ জীবনের তৃতীয়াঙ্কেই ভূমিকা শেষ করিয়া নেপথ্যাচার-গৃহে গমন করত দেহপরিচ্ছদ ত্যাগপূর্বক স্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

"নটবীর গ্যারিক-গিরিশেরও ভাগ্যে যাহা ঘটিয়ছিল, অভিনেতা মাত্রেরই যাহা কাম্য, জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল, অভিনয়কালে পাঁচকড়ির ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। এই—বাহবা! বাহবা! বাহবা! এই—দুয়ো দুয়োর চচ্চড়াচ্চড় তালি!···

"এ সমাজজীবন-নাটকে যবনিকাপতন নাই; অভিনয় চলিতেছে; কিন্তু প্রোগ্রাম খুলিয়া দেখিতেছি—পাঁচকড়ি এই-যে প্রস্থান করিল, এই তাহার শেষ প্রস্থান, আর তাহার প্রবেশ নাই; সে আর আসিবে না, আর তাহার উদ্দীপ্ত বাণী আমাদিগকে মাতাইয়া তুলিবে না, আর তাহার শেষ ভাগে আমরা হাসিয়া ঢলিয়া পড়িব না, আর তাহার জ্ঞানগর্ভ কথা আমরা মস্তিষ্কে মুদ্রিত করিয়া রাখিতে পাইব না! সে মাঝে-মাঝে পাঠ ভুলিয়া যাক, মাঝে-মাঝে অবান্তর কথা (Gag) প্রবেশ করাইয়া দিক, তাহার

ভূমিকা-গত সকল কথা আমাদের মনের মতো হউক বা না-হউক, অমনই মনে হইতেছে —আমাদের আনন্দতটিনী হইতে একটি নৃত্য শীলতরঙ্গ চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গেল।"

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে লেখা শোকপ্রবন্ধের শেষে আক্ষেপ করে পাঁচকড়ি বলেছিলেন : "চন্দ্রশেখর চলিয়া গেলেন—সে বাঙালী নাই—উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শোকগাথা লিখিবে কে ?"

মৃত্যুপারে উত্তীর্ণদের কাছে সংবাদ প্রেরণের উপায় আমাদের জানা নেই। থাকলে জানাতাম—পাঁচকড়ির উদ্দেশে উদ্‌ভ্রান্ত শোকগাথা রচনার জন্য জরাজীর্ণ অমৃতলাল জীবিত ছিলেন।

[এই প্রবন্ধ রচনার জন্য তথ্য সন্ধানকালে সাহিত্য পরিষদের শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাহায্য করেছেন। পাঁচকড়ির নাতি অধ্যাপক বিন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু সংবাদ দিয়েছেন। 'সাধের বউ' ও 'দরিয়া' উপন্যাস-দুটি ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পড়তে দিয়েছেন শিবপুরের শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায়। এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।]

('দেশ', ১০ আষাঢ়, ১৩৭৩ ; ২৫ জুন, ১৯৬৬)

পাদটীকা

১. পঞ্চানন তর্করত্ন পাঁচকড়ির বিষয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের অকুণ্ঠ প্রশংসার উল্লেখ করেছেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁকে, কি ইংরেজী, কি বাংলা, উভয় ভাষাতেই শ্রেষ্ঠ লেখক বলে মনে করতেন। সাংবাদিকতার ব্যাপারে এই যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর কাছে পাঁচকড়ি ঋণ স্বীকার করেছেন। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের উৎসাহে তাঁর বাংলা সাহিত্যে পদক্ষেপের সূচনা, এবং পাঁচকড়ির স্বীকৃতিমতো, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যগুরু।

২. পাঁচকড়ি আরও কিছু ভূদেব-স্মৃতি বিবরণ করেছেন। ঐ বৎসরই ছোটলাট স্যার অ্যাশলির সামনে পুরস্কার বিতরণ সভায় পাঁচকড়ি স্যার জন ক্যাম্বেলের উপর লিখিত এক বিচিত্র সংস্কৃত স্তোত্র 'মুক্ত স্বরে' আবৃত্তি করেছিলেন; ছেলেটির সপ্রতিভ ভাব-ভঙ্গিতে পরিতৃপ্ত ভূদেব স্নেহভরে তাঁকে এক কৌটা সন্দেশ খেতে দেন। [পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী (সাহিত্য পরিষদ) ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০-০২।] এই সন্দেশপ্রীতি পাঁচকড়ির সারা-জীবনের সাথী। শোনা যায়, যেদিন 'নায়কে' তিনি স্যার আশুতোষকে নিয়ে ঠাট্টা করতেন, সেইদিনই হাজির হতেন তাঁর বাড়িতে; আশুতোষের মুখোমুখি হবার আগে উক্ত ব্রাহ্মণের বাড়িতে ব্রাহ্মণভোজন-রূপে একথালা সন্দেশ নিঃশেষ করে, দক্ষিণারূপে আশুতোষের ক্ষমা আদায় করে নিতেন। আমার মন্তব্যের সমর্থনে শ্রীসুনির্মল ভাদুড়ী ১৬ জুলাই ১৯৬৬ তারিখের দেশ পত্রিকায় ব্যক্তিগত স্মৃতি জানিয়েছেন : "পাঁচকড়িবাবুকে আমি দেখেছি, তাঁর লেখা পড়েছি, স্বদেশী যুগে বিডন উদ্যানে (এখন রবীন্দ্র কানন) তাঁর জোরালো বক্তৃতা শুনেছি। তিনি সুপুরুষ এবং সুবক্তাও ছিলেন। আমি তাঁর 'নায়ক' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলাম। তার অধিকাংশ সংখ্যাতেই তিনি স্যার আশুতোষকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতেন। তাঁকে 'ভঁপো সরস্বতী' আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর কার্টুনও বের করতেন। ল কলেজের বিহারীমোহন মজুমদার মহাশয়কে 'ভাবর হাসি' বলে বিদ্রূপ

করতেন। স্যার আশুতোষের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ সম্বন্ধে যখন অতিরিক্ত মাত্রায় লেখা হতো তখন আমরা অত্যন্ত দুঃখবোধ করতাম। আমরাও শুনেছি, স্যার আশুতোষের বাড়িতে গিয়ে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে বলতেন, 'আপনার নামে ব্যঙ্গ করে দুটো পয়সা পাই। আপনি সেজন্য ক্ষুন্ন হবেন না। আপনি দেশের দশের এবং আমারও পরম শ্রদ্ধার পাত্র।' শেষের দিকে তিনি 'অবতার' নামে ছোট একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন। আমি সেখানিও নিয়মিতভাবে পড়তাম। ভাগলপুরে আমার একজন আত্মীয় ছিলেন। তাঁর মুখে পাঁচকড়িবাবুর অনেক সুখ্যাতি শুনতাম।"

৩. পাঁচকড়ি হাতে-গরম সাংবাদিকতা খুব ভাল জানতেন। শোনা যায়, হকারদের কাগজ-বিক্রীর ট্রেনিং তিনি নিজেই দিতেন। চেঁচাবার মতো গরম খবর না থাকলে তিনি নাকি—"পাঁচকড়ি ভয় খুন—বাবু, নায়ক"—এমন কথাও বলতে নির্দেশ দিতেন।

পাঁচকড়ির নাতি অধ্যাপক বিন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচকড়ির চতুর সাংবাদিকতার একটি দৃষ্টান্ত আমাদের দিয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পাঁচকড়ির কাগজে শিরোনামা বেরুল, "ইংরাজ সৈন্যের বীরদর্পে পলায়ন।" পুলিস কমিশনার পাঁচকড়ির কৈফিয়ত তলব করলেন। পাঁচকড়ি সবিস্ময়ে বললেন, "সে কি আমি তো ইংরেজীর অনুবাদ করেছি—The heroic retreat of the English soldiers ! —কেন অনুবাদ ভাল হয়নি ?"

৪. পাঁচকড়ি পিতার একমাত্র সন্তান অত্যন্ত আদরে মানুষ। অমৃতবাজার লিখেছিল, শেষদিন অবধি তিনি পিতামাতার কাছে খোকাটি থেকে গিয়েছিলেন ; পাঁচকড়ির জীবনের দুঃখযন্ত্রণার ভার এই পিতা-মাতাই বহন করেছেন। তাঁদের এত ভালবাসতেন যে চাইতেন—পিতামাতার মৃত্যু যেন একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর আগেই হয়। কিন্তু সে 'সৌভাগ্য' তিনি পাননি। পঞ্চানন তর্করত্ন লিখেছিলেন, পাঁচকড়ির "অশক্তাপত্য স্থবির পিতামাতার যে দুঃখ, তাহা তাঁহাদের মরণই বিদায় দিবে।...তাঁহারা জীবনে শোক পান নাই, একেবারেই ঘোরতর শোক—পুত্রশোক !"

৫. প্রবাহিণী থেকে পাঁচকড়ির কর্মচ্যুতির কারণ তিনি নাকি মালিকের বন্ধুর সাক্ষাতে মালিকের বাপান্ত করেছিলেন। (প্রবাহিণী ১৬ শ্রাবণ ১৩২১)। মালিক অবশ্যই নিজ স্বীকারোক্তিমতো পিতৃভক্ত। ফলে পাঁচকড়িকে তাড়ালেন। কর্মচ্যুত পাঁচকড়ি কী করলেন, প্রবাহিণীতে তার রিপোর্ট : "মুঙ্গের-ভাগলপুরে ডোম-ডোকলা, হাড়ি-মুচিতে তাড়ি খাইয়া যে-ভাষায় পরস্পরে গালিগালাজ করে, প্রবাহিণী হইতে কর্মচ্যুত হইয়া শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'নায়ক' কাগজখানায় সেই ভাষায় আমাদের গালি দিয়াছেন। বলাবাহুল্য যাহার শরীরে ভদ্রবংশের বিন্দুমাত্র রক্ত আছে সে কখনই এমন লেখার উদ্যোগ সাহিতে পারিত না।" [ঐ, ৯ শ্রাবণ ১৩২১]। ভদ্রবংশের প্রচুর রক্তসম্পন্ন প্রবাহিণীর মালিকের প্ররোচনায় জনৈক ফণীন্দ্রনাথ রায় কিন্তু একই সংখ্যায় পাঁচকড়ির কার্টুনের তলায় 'হনুর কারসাজি' নামক এক কবিতা ফাঁদলেন, যার প্রথম স্তবক : "ডালে ডালে পুচ্ছ তুলে নাচ্‌তেছিল হনুমান, / বিপারদের ঝাঁটার চোটে হয়েছিল সাবধান। / সেদিন এখন নাই ভেবে আর, / কিচির মিচির করছে আবার, / ডালে বসি ভাবছে হাসি' সবার মতো ধরাখান, মানুষ বত মেষের মতো—সে যে দক্ষ হনুমান।" ১৬ শ্রাবণের 'নানা কথায়' পাঁচকড়িকে অভদ্র কদর্য গালিগালাজ করা হল। তার কিছু ভদ্র অংশ এই : "মনে পড়ে বটে এই মর্কটই একদিন তাহার পিতৃতুল্য পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দকে মেছোহাটার ভাষায় গালি দিয়াছিল। মনে পড়ে বটে এই মর্কটই একদিন তাহার পিতৃতুল্য ৺ইন্দ্রনাথকে কামড়াইতে গিয়া ত্যাজ্যপুত্র হইয়াছিল। মনে পড়ে বটে এই মর্কটই একদিন তাহার পিতৃতুল্য ৺যোগেন্দ্রচন্দ্রের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে গিয়া মুখে পদাঘাত খাইয়াছিল। মনে পড়ে বটে এই মর্কটই একদিন টিকটিকি সাজিয়া তাহার পিতৃতুল্য অন্নদাতার সর্বনাশসাধনে তৎপর হইয়াছিল। আর আজ দেখিতেছি, এই মর্কটই বাংলা সাহিত্যের নন্দনকাননে লঙ্কাকাণ্ড করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে।"

রুচি বটে। এর উল্টোপিঠে, নায়ক কাগজে পাঁচকড়ি কোন্ মনুষ্যজন্তুর কুলজি রচনা করেছিলেন, তা

জানা না থাকায় ছবিটি সম্পূর্ণ করা গেল না। অর্থাৎ এখানে পাঁকে লুটোপুটি দুই প্রাণীর নর্মবিলাসলীলা। কিন্তু পাঁচকড়ির মধ্যে পংক্তোত্তীর্ণ হবার প্রতিজ্ঞা ছিল। তাই পাঁচকড়িরকৃত বাপার হজম করেও তাঁকে নবাহ্নিকীতে ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল।

পাঁচকড়ি ফিরেছিলেন। সে কি শুধু অর্থের প্রয়োজনে? না। পাঁচকড়ি তাঁর দ্বিতীয় সত্তার কিছু উৎসাহের সাধন করতে চেয়েছিলেন প্রবাহিনীকে। তিনি সত্যই লিখতে চেয়েছিলেন। না লিখে তাঁর উপায় ছিল না। তাঁর কলম, তাতে মন—হৃৎপিণ্ডে ধরা। "যতক্ষণ ঐ সাধের কথা লিখিতে থাকি ততক্ষণ আত্মহারা হইয়া থাকি। সংসারের সুখ দুঃখ মানামান ভুলিয়া বিভোর হইয়া বসিয়া লিখিতে থাকি। এ সুখ বড় সুখ। ইহজীবনে আর তো তেমন কোনো সুখ উপভোগ করি নাই—তাই এ সুখে বঞ্চিত হইতে চাহি না। প্রবাহিনী আমাকে এই ক্ষুদ্র সুখে সুখী হইবার অবসর দিয়াছে।" [প্রবাহিনী, ২৪ আশ্বিন ১৩২২]।

৬. "He was a fine speaker, and could command an audience of any magnitude by his powerful voice" (Statesman Nov. 17, 1923)

৭. "কুলোদরী নারীর ঘোমটাই আদর ছিল না" কলসীকক্ষে যুবতীদের ঘাটের পথে আসা যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য—পাঁচকড়ি বলেন—কটি-ব্যায়াম!! তিনি আরও রমণীয় তথ্য দিয়েছেন: বাঙালী নারীর ক্ষীণ কটির বিপরীত ঊর্ধ্বাঙ্গের সমৃদ্ধি দর্শনে আত্মহারা বীর রাজা মানসিংহ কলিযুগে বাংলা দেশে কাঁচুলী-হরণ উৎসব করেছিলেন। রূপবতী বাঙালী নারীরা তদুপরি শক্তিময়ীও; তাঁরা রীতিমত লড়াই করতে পারতেন—বাঁটুল ছুঁড়ে। অবশ্য লেখক সুবিধাজনকভাবে বলতে ভুলে গেছেন, কাঁচুলীহরণ অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে বঙ্গনারীরা বাঁটুলবর্ষণের নিদেশ জানিয়েছিলেন কি না!

৮. বাঙালী পুরুষ লাঠি খেলতে, সাঁতার দিতে, কুস্তী করতে না পারলে 'গোবর গণেশ' আখ্যা পেত। ঝিকিকাপড় পরলে সমাজে হাস্যাস্পদ হত। এবং দশ বিশ ক্রোশ পায়ে হাঁটতে ভয় পেলে 'ছি! ওটা আবার মানুষ!'—এই ধিক্কার পেত। বিলাসী সৌখীন কবি ভারতচন্দ্র নাকি নৌকায় যাতায়াত করতেন বলে ঐ ধরনের কটাক্ষের লক্ষ্যস্থল ছিলেন।

৯. তবু ধর্মঘটের কিছু বর্ণীয় ইতিকথা দেওয়া যাক। দেশের শিল্পীসম্প্রদায়ের মধ্যে আগে অত্যন্ত ঐক্য ছিল। মহারাজ নন্দকুমার মুর্শিদাবাদে নবাব সেরেস্তায় চাকরি পেয়ে টাকার গরমে মুর্শিদাবাদ থেকে কাপড় কিনে আনেন। সেজন্য তাঁর স্বগ্রাম ভদ্রপুরের শিল্পীরা এমনভাবে তাঁকে একঘরে করেছিল যে বাধ্য হয়ে তাঁকে বহুবায়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তারপর পাঁচকড়ি লিখেছেন:

"ধর্মঘট। সে এক অপূর্ব ব্যাপার ছিল।...যে শিল্পীজাতি বা গৃহস্থ ধর্মঘট স্থাপন করিত, সে বা সেই জাতির প্রধানগণ অন্যসকল শিল্পীজাতির প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিয়া গ্রামচত্বরে, বারোয়ারিতলায় বা শিবমন্দিরের সম্মুখে সমবেত করিত। সেই সভায় তাহারা জাতিগত বা ব্যক্তিগত অভিযোগের কথা ব্যক্ত করিত। তাহার পর 'ঘোঁট' হইত। ঘোঁট শব্দের অর্থ debate, discussion, বিষয়টিকে ঘুঁটিয়া তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ হইল ঘোঁট। এই ঘোঁট শেষ হইলে পুরোহিত ডাকিয়া ধর্মরাজের ঘট স্থাপনা হইত। ধর্মরাজ...গোদ বুদ্ধদেব।...ঘটকে জলপূর্ণ করিয়া তাহার মুখে আম্রপল্লব সাজাইয়া দেওয়া হইত। ঘটের গাত্রে সিন্দুর তৈলযোগে একটা চক্র অঙ্কিত করিয়া তাহারই নিম্নে যে-জাতি বা যে-গৃহস্থের বিরুদ্ধে ধর্মঘট স্থাপনা হইয়াছে, তাহার নাম লেখা হইত ...ঘটের সম্মুখে একতাড়া পান, সুপারি এবং হরিদ্রাখণ্ড সজ্জ করিয়া রাখা হইত। ভোজের শেষে প্রত্যেক শিল্পীজাতির মাতব্বরগণ একটা পান, একটা সুপারি ও একটা হরিদ্রাখণ্ড লইয়া ঘট স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেন যে, আমি অত্রকার ঘোঁট অনুসারে, স্থিরীকৃত ব্যবস্থা অনুসারে, অমুক গ্রামের অমুক ব্যক্তিকে বা বহুকারকে আমার স্বীয় শিল্পজাত সামগ্রী যোগাইব না। ধর্মরাজের পান সুপারি লইলাম, হুকুম অমান্য করিব না, এবং আমার গ্রামের সকলকে হুকুমমতো কাজ করিতে বাধ্য করিব। এই সংকল্প শেষ হইলে, ঐ ঘট বাধায় করিয়া

অভিযোক্তার দল দূরদূরান্তর গ্রামসকলে ঘট ঘুরাইয়া বেড়াইতেন। এক ঢাকী ঢাক লইয়া ঘটের সহিত বেড়াইত এবং প্রত্যেক গ্রামে যাইয়া ঢাকে কাঠি মারিয়া অভিযোগের বার্তা শুনাইত এবং সামাজিক যে ঘটের মীমাংসা গ্রামবাসীগণকে বলিত। এই ব্যবস্থা হইতেই বাঙ্গালার প্রবচন প্রচলিত হইয়াছে—'আর কি রক্ষে আছে। ঢাকে কাঠি পড়েছে।'

"...ধর্মের ঢাকে কাঠি পড়লে...একটা পরগনার মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বাস করিতে পারিত না।... ধোপা তাহার কাপড় কাচিত না, নাপিত কামাইত না, জলবাহী জল যোগাইত না, ঘরামী ঘর ছাইত না, এমন-কি মেথর-মুদ্দফরাসও তাহার সহায়তা করিত না। ইহা অতি দুর্দ্ধর্ষ শাসন ছিল; সমাজের এই ভীষণ শাসন মুসলমানেও মান্য করিয়া চলিত; 'ঠেকো'র ঘরের কাহাকেও মোসলেম ইমামগণও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিত না।" (পাঁচকড়ি রচনাবলী, ১ম, 'গোড়ার কথা', পৃ. ৬১-৬২)

১০. "হেঁয়ালী এখন শুধু বঙ্গভাষার পদ্যে নয়—গদ্যেও প্রচুর পরিমাণে প্রবেশলাভ করিয়াছে; আধুনিক অধিকাংশ নবীন লেখকই সাদাসিধে ভাষায়, সহজ ও সরলভাবে নিজের বক্তব্যকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করেন না—অথবা স্বচ্ছ ভাষায় স্বীয় উক্তি প্রকাশ করিতে পারেন না বলিয়াই ঐরূপ অচেষ্টা বা উপেক্ষার ভাব দেখাইয়া থাকেন।...হেঁয়ালীই এখনকার ভাষার যেন সবপ্রধান অলঙ্কার।...রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বঙ্গীয় গদ্য ভাষায় অস্ফুটতা-দোষের আমদানী করিয়াছেন।" [প্রবাহিণী, ১০ মাঘ ১৩২০]

১১. "বাংলা ভাষায় একখানি সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসও তিনি লিখিয়াছিলেন। তাহা ইংরাজ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ উৎপাদন করিবে এই অজুহাতে গবর্ণমেন্ট তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।"

[প্রবাসী, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৌষ, ১৩৩০]

১২. এই প্রসঙ্গে পিতৃতর্পণের উচ্চাঙ্গের ব্যাখ্যা স্মরণযোগ্য। আমি কয়েক লাইন মাত্র উদ্ধৃত করছি। তর্পণমন্ত্রের বিবৃতির পরে তিনি লিখলেন: "Patriotism-এর এমন প্রগাঢ় বিবৃতি, দেশাত্ম-বোধের এমন মূলস্পর্শিনী অভিব্যঞ্জনা, এমন বিশ্বব্যাপী মহাভাবের বিকাশ—তর্পণ ছাড়া আর কিছুতেই হয় না, হইবার নহে। তর্পণ করিতে করিতে মনে হয়, আমি ক্ষুদ্র নহি, সামান্য নহি, হীন হেয় নহি। মনে হয়, আমি তাঁহাদেরই একজন, যাঁহারা এক কালে জগদ্বরেণ্য, জগৎপূজ্য ছিলেন। মনে হয়, আমি তাঁহাদেরই, যাঁহারা বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ রচনা করিয়া গিয়াছেন। মনে হয়, আমার দেশের দুঃখী আতুর, অনাথ, কাঙ্গাল, দরিদ্র ভিখারী, সবাই আমার মধ্যে, আমাতে সন্নিহিত, আমি তাহাদের, তাহারা আমার। মনে হয়, পাপী-তাপী, রোগী ব্যথিত, পাষণ্ড, দুর্দ্ধর্ষ দস্যু, সবাই আমার, আমার দেশের, আমার জাতির, সুতরাং আমার নিজস্ব। মনে হয়, আমার আমাতে—আমার এই ক্ষুদ্র আমিত্বটুকুর মধ্যে—আমার দেশ, আমার জাতি, আমার বর্ণ, আমার ধর্ম, আমার শিল্প সাহিত্য, শ্লাঘা কলঙ্ক, আমার সর্বস্ব লুকান, মাখান, জড়ান আছে। তাহাদের তৃপ্তিতে আমার তৃপ্তি, তাহাদের উদ্ধারে আমার উদ্ধার। আমার জাতির অতীত ইতিহাস, আমার জাতির গৌরব ও কলঙ্ক, আমার মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে নিবদ্ধ। তর্পণ স্মৃতির আলোড়ন, তর্পণ বিস্মৃতিসাগরের মন্থন, তর্পণ আমার আমিত্বের পরিচয়, আমার অতীত ও বর্তমানের সমাহার।" ('নায়কের তর্পণ')।

এই লেখার মধ্যে বক্তৃতার ছাঁদ থাকলেও মনন ও আবেগের সৌন্দর্যও আছে। পাঁচকড়ির ব্যক্তিগত নিবন্ধজাতীয় রচনাগুলির মধ্যে যেটিকে শ্রেষ্ঠ মনে করি সেই 'মাটি নিবি গো'র মধ্যে তাঁর দেশপ্রীতির মূল উপাদান মৃত্তিকাপ্রীতির রূপ দেখা যায়। এই মৃত্তিকাপ্রীতি থেকে তাঁর স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেম এসেছে। গভীর বেদনায়, আনন্দে, রসে-রহস্যে রোমাঞ্চিত এ লেখাটিতে যদি কেউ আবেগ-বাহুল্য দেখেন তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলবই, তিনি আপাদমস্তক বুদ্ধিমান।

১৩. 'সাধের বউ' ও 'দরিয়া' উপন্যাসে যথেচ্ছ এমন সমস্ত ঘটনা ঘটেছে—মনে হয়, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে আছি। পাঠক জেনে খুশি হবেন, ভারতীয় সন্ন্যাসীদের ইন্টারন্যাশনাল যোগাযোগ আছে জলে-স্থলে। রুশ নিহিলিস্টদের সঙ্গে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের

সংবাদের চমকপ্রদ সংবাদ পাঠক এতে পড়বেন। ভারতীয় সন্ন্যাসীরা কয়েকবার রুশ সম্রাটের প্রাণরক্ষা করেছে এমন সংবাদ, কিংবা রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য—ভারত থেকে স্থলপথে নেপাল বা তিব্বত যাওয়া যায়!! —এও মিলবে। এর সঙ্গে অবিরাম গুজবকথা। লেখক বই দুটিকে উপন্যাস নাম না দিয়ে উপন্যাসকে চিন্তামুক্ত করেছেন। বিস্ময়ের কথা, এই পাঁচকড়িই 'স্ত্রী' প্রবন্ধে বঙ্কিমের কল্পনার বাস্তবতা চরিত্রের তীক্ষ্ণ এবং অনেকাংশে সঙ্গত, সমালোচনা করেছেন!

সংযোজন

ডঃ অরুণকুমার মিত্র ১৬ জুলাই ১৯৬৬ তারিখের দেশ পত্রিকায় যে-চিঠি পাঠিয়েছিলেন তা সংযোজন করে দিচ্ছি প্রবন্ধ শেষে।—

১০ই আষাঢ়ের 'দেশে' শঙ্করীপ্রসাদ বসুর লেখা 'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়' পড়ে খুব ভাল লাগল। তথ্য ও রসপূর্ণ এ প্রবন্ধে তিনি অমৃতলাল বসুর 'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়' রচনাটি থেকে একাধিক উদ্ধৃতি দিয়ে সাংবাদিক ও মানুষ পাঁচকড়ির চারিত্র-পরিচয় সুন্দররূপে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। প্রবন্ধটির একাংশে বৃদ্ধ অমৃতলাল সম্পর্কে সাংবাদিক পাঁচকড়ির রসকটাক্ষটিকে শঙ্করীবাবু অতি সঙ্গত কারণেই 'শারীরিক এবং স্থূল' বলেছেন। পাঠক-সাধারণ কিন্তু ঐ মন্তব্যটি পড়ে বুঝবেন যে, পাঁচকড়ি অমৃতলালকে ঠিক পছন্দ করতেন না। আসল সত্য এর বিপরীত।

আমার সংগ্রহে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অপ্রকাশিত পত্র আছে। পত্রটি অমৃতলালকে লেখা। শ্লেষসিদ্ধ পাঁচকড়ি অমৃতলাল সম্পর্কে কতটা 'স্পর্শকাতর' ছিলেন তা এ পত্র থেকে আমরা জানতে পারব। ক্ষিপ্রলেখনী সাংবাদিকের অন্তর্লোকও এ পত্রে উন্মোচিত হয়েছে।

পত্রটি উদ্ধার করার আগে অমৃতলালকে কেন পাঁচকড়ি এ পত্র লিখেছিলেন তা জানা দরকার।

এক সময়ে গ্রে স্ট্রিটের মোড় থেকে বিডন স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িগুলো পতিতালয়ে পরিণত হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে একটা জনমতও গড়ে উঠেছিল। অমৃতলাল স্টার থিয়েটার থেকে (১৪ই মার্চ, ১৯০৩) 'Social Evil in Cornwallis Street' নামে একটি দীর্ঘ পত্র লিখলেন 'বেঙ্গলী' কাগজে। তাতে বাড়িওয়ালাদের সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ ছিল—

"Respectable tenants were not wanting but the owner meant to make every brick pay ; and money earned with honesty and decency could not cope with their demands."

পাঁচকড়ি পত্রলেখকের সমাজ-সংস্কারের প্রয়াসটিকে কটাক্ষ করে 'রঙ্গালয়' পত্রে (১৫ই মার্চ ১৯০৩) দীর্ঘ আলোচনা করলেন। সে আলোচনায় বিদ্রূপ ও কটূক্তি

দুই-ই ছিল। 'রঙ্গালয়'-এর ঐ সংখ্যারই অন্য পাতায় 'নিন্দা ও স্তুতি' শিরোনামে আরও দু কলম লিখে পাঁচকড়ি অমৃতলাল প্রভৃতির প্রচেষ্টাকে "বুজরুকী" ও "Humbuggism" বলে আখ্যাত করলেন।

পাঁচকড়িকে অমৃতলাল খুব স্নেহ করতেন। তাঁর আচরণে তিনি অত্যন্ত মনঃকষ্ট পেলেন। অমৃতলালের এ মর্মপীড়ার কথা হারাণচন্দ্র রক্ষিত পাঁচকড়িকে জানালেন। শুনে পাঁচকড়ি সঙ্গে সঙ্গে অমৃতলালকে লিখলেন এই পত্র :—

105, Cornwallis Street.
25th March 1903

কল্যাণবরেষু বাবাজীউ, এবারকার রঙ্গালয়ে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার একাংশে আপনার প্রতি কটাক্ষ আছে। হারাণভায়া সেই অংশের কথা লইয়া আমাকে অনুযোগ করিলেন। আপনি যে ঐ অংশ পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। যুক্তির খাতিরে আমি লিখিয়াছিলাম, বেশ্যার সমর্থন করা আমার অভিপ্রেত নহে। তবে এই সকল হুজুগের মধ্যে কেবল Humbuggism আছে ইহাই আমি দেখাইতে চাহি। আপনার অগোচর কিছুই নাই, আমার যাহা কিছু বিদ্যা আপনাদের প্রসাদেই : আমি সত্য কথা লিখিতেছি কি মিথ্যা লিখিতেছি তাহা আপনি মনে মনে বেশ বুঝিতে পারেন। পরন্তু আপনি আমার কথায় নিজে ব্যথিত হইলে আমি বড়ই মর্মপীড়িত হইব। কেমন করিয়া লিখিলে আপনার রাগ পড়ে আমি তেমনি করিয়া লিখিতে প্রস্তুত।…আমাকে স্নেহ করেন বলিয়া আমি আপনার জন্য এত চিন্তিত। আপনার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা তাহা আগামীবারে প্রকাশিত হইবে। ইতি— শ্রীপাঁচকড়ি দেবশর্মা বন্দ্যোপাধ্যায়

অমৃতলাল সম্বন্ধে পাঁচকড়ির ধারণা 'রঙ্গালয়'-এর যে-সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার কথা, দুর্ভাগ্য যে, অনেক খুঁজেও তা পাইনি। 'রঙ্গালয়'-এর কয়েকটি খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সংখ্যা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে। দ্রষ্টব্য সংখ্যাটি সেগুলির মধ্যে নেই। সাময়িকপত্রে যাঁকে, 'বছর বিউনী' ও 'বুড়ো মুর্গীর' সঙ্গে উপস্থিত করে পাঠকদের কৌতুকরসের যোগান দিয়েছিলেন, তাঁরই কাছে বিনীত পত্র লিখতে কোন কুণ্ঠা ছিল না পাঁচকড়ির। এই অকপটতাই তাঁকে অমৃতলালের আত্মীয়তুল্য করে তুলেছিল। তাঁর সম্পর্কে অমৃতলালের মনোভাব যে কী ছিল, তার অনেকটাই তো তাঁর লেখা থেকে তুলে দিয়েছেন শঙ্করীবাবু।

'অরবিন্দ প্রসঙ্গ'

'কাছের মানুষ অরবিন্দ'—এই নামের কোনো প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করা সত্যই কঠিন, কারণ অরবিন্দ চিরদিনই দূরের মানুষ। অরবিন্দ ঘোষ বা শ্রীঅরবিন্দ—কোনোরূপেই তিনি জনগণের মানুষ নন—এবং যেহেতু সবদাই নিজের জগতে বাস করেছেন, তাই দৈনন্দিনের প্রাণোত্তাপে পূর্ণ মানুষকে আমরা তাঁর বিষয়ক রচনাগুলি থেকে খুঁজে পাই না। তিনি সত্যই বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। একদিন যখন তাঁর নাম বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক জীবনে বিদ্যুৎশিহরণ আনত তখনো তাঁকে সন্নিধানে পায়নি সাধারণে। সুতরাং অরবিন্দের জীবনীকার যদি কেউ হতে চান, তাঁকে তাঁর বাহিরঙ্গ কিছু কীর্তিকথার নিবেদনে এবং ধর্মজীবন সম্পর্কিত তত্ত্বালোচনাতেই প্রধানত সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

তবু আমরা যারা সাধারণ মানুষ—যারা মহাপুরুষের মধ্যেও সাধারণ মানুষকে চাই—আমরা কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মানবিক রূপকে দেখার আকাঙ্ক্ষা দমন করতে পারি না। এক্ষেত্রে আমাদের প্রায়শ হতাশ হতে হয় নিতান্তই তথ্যাভাব—অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ রূপ-চিত্রণ প্রায় মেলে না। পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সংলাপের বিবরণ যাঁরা লিখেছেন, তাঁরাও এক্ষেত্রে যথেষ্ট উপাদান দিতে পারেননি—তাঁরা 'শ্রীঅরবিন্দের কথাবার্তা' দিয়েছেন কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে দেননি।

এমনই পরিস্থিতিতে অনেক দিনের পুরনো একটি বই হাতে পড়ল—বইটি আবার পড়লাম এবং খুব খুশি হলাম। বইটির নাম 'অরবিন্দ প্রসঙ্গ', লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়।

দীনেন্দ্রকুমার রায় বাংলাদেশে বিস্মৃত সাহিত্যিক। এখনো যেটুকু বেঁচে আছেন তা রেক-কাহিনীর জন্য—তাঁর পেটের দায়ের সেকেণ্ড হ্যাণ্ড সৃষ্টি। এই দীনেন্দ্রকুমার যে, অনবদ্য পল্লীচিত্রের লেখক—সেকথা ক-জনের জানা আছে? কথায় ছবি আঁকতে মানুষটির বিশেষ ক্ষমতা ছিল।

বিলেতে শিক্ষা শেষ করে, বহু বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়ে, এবং মাতৃভাষা প্রায় না জেনে, অরবিন্দ দেশে ফিরেছিলেন; তারপর তিনি বরোদা রাজ্যে চাকরি নেন। বহু ভাষাবিদ্ দেশপ্রেমিক এই মানুষটিকে মাতৃভাষা না জানার লজ্জা বিঁধেছিল। দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁর বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে বরোদায় একত্র দুবছর কাটিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার কিছু কথা তিনি 'অরবিন্দ প্রসঙ্গ-এর মধ্যে লিখেছেন।

বইটি ক্ষুদ্রাকার; পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রথম সংস্করণে মাত্র ৮৪। তার মধ্যেও ইতস্তত নানা কথা জুড়ে আছে অনেকখানি জায়গা; সাক্ষাৎ অরবিন্দ-কথা ৪০ পৃষ্ঠাও বোধ হয় হবে না। কিন্তু ঐ কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে অরবিন্দের যে নিকট-ছবি পাই, তা অন্যত্র দুর্লভ বলে অত্যন্ত মূল্যবান, অন্তত আমার মতো বাহ্যমুখী মানুষের কাছে।

দীনেন্দ্রকুমারের লেখাটি বড়ো ঝরঝরে ঝরঝরে। মাঝে মাঝে তাতে প্রসন্ন কৌতুকের কিরণসম্পাত। স্নিগ্ধ অথচ গভীর শ্রদ্ধায় চর্চিত অরবিন্দের ছবিখানি ফুটে আছে তারি মধ্যে। কিন্তু তবু বলতে হবে, সে ছবি প্রচলিত অর্থে চিত্তাকর্ষক নয়, কেননা তা বহির্বিমুখ আত্মলীন ভাবুক একটি মানুষের রূপচিত্র।

অরবিন্দ তাই ছিলেন। কী ছিলেন, সেটা জানাই একটা বড়ো লাভ। দীনেন্দ্রকুমার স্বল্প পরিসরে তা আমাদের জানাতে পেরেছেন।

দীনেন্দ্রকুমারের সীমাবদ্ধতাও ছিল। তিনি সবিনয়ে (এবং মিথ্যা বিনয়ে নয়) জানিয়েছেন, অরবিন্দের বিরাট পাণ্ডিত্য বোঝার কোনো ক্ষমতা তাঁর ছিল না। না, অরবিন্দের রাজনীতিও তিনি বুঝতেন না, বা বুঝতে চাইতেন না। অরবিন্দের পুস্তকাগারের 'অগণ্য' গ্রন্থস্তূপের মধ্যে "বিপ্লববাদের সমর্থক কোনো গ্রন্থ" কোনোদিন দেখতে পাননি। "মহিমান্বিত ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি অবজ্ঞাসূচক কোনো উক্তি কোনোদিন তাঁহার মুখে শ্রবণও" করেন নি। "বস্তুত ইংরাজকে ভারত ছাড়া করিবার দুরভিসন্ধি যে, কোনোদিন তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল—তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া ও দুই বৎসরের অধিক কাল তাঁহার সহিত দিবারাত্রি এক কক্ষে বাস করিয়া মুহূর্তের জন্যও" তা বুঝতে পারেন নি দীনেন্দ্রকুমার। অরবিন্দকে তাঁর মনে হয়েছিল, "নির্বিরোধ, উদারপ্রকৃতি, ধর্মভীরু, দয়ার্দ্রহৃদয়, পরদুঃখকাতর, হিংসাবিদ্বেষ-বর্জিত" মানুষ—তিনি যে ভীষণ বোমার ষড়যন্ত্রে বা জনক্ষয়কর কোনো অনুষ্ঠানে কখনো লিপ্ত থাকতে পারেন তা "সম্পূর্ণ অসম্ভব", এবং তাঁর "প্রকৃতি-বিরুদ্ধ" বলে দীনেন্দ্রকুমারের মনে হয়েছিল।

দীনেন্দ্রকুমার যে-সময়ে অরবিন্দের কাছে ছিলেন, সে-সময়ে অরবিন্দ সত্যই বৈপ্লবিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন নি। যদি পড়তেনও, দীনেন্দ্রকুমারকে নিশ্চয় তিনি সে-বিষয়ে অবহিত করতেন না, কারণ দীনেন্দ্রকুমার কী ধরনের মানুষ, তা বুঝবার মতো লোক-চরিত্রজ্ঞান অন্তত অরবিন্দের ছিল। অরবিন্দের তৎকালীন রাজনৈতিক ধারণা সম্বন্ধে দীনেন্দ্রকুমারের বোধের অগভীরতা ধরা পড়েছে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে 'ইন্দুপ্রকাশে' লিখিত অরবিন্দের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য থেকে। "কংগ্রেসের কতকগুলি ত্রুটিই" মাত্র নাকি সেই প্রবন্ধগুলিতে দেখানো হয়েছিল। খুবই সুখের বিষয়, দীনেন্দ্রকুমার অরবিন্দকে "ঐ সকল প্রবন্ধের মর্ম কী তাহা কখনো জিজ্ঞাসা" করেন নি ; যদি করতেন, এবং অরবিন্দ যদি উত্তর দিতেন, তাহলে অবশ্যই ভয়ঙ্কর কিছু কথা শুনতেন, কারণ ঐ প্রবন্ধগুলিতে ভাবী বিপ্লবের ছন্দ বেজেছিল—অহিংস বিপ্লব নয়—"অগ্নি ও রক্তস্নান" যাতে, এমন বিপ্লব। "কংগ্রেসের কতকগুলি ত্রুটি," অরবিন্দ যা দেখিয়েছিলেন, তা আর কিছু নয়—কংগ্রেস বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান, জমিদার ও আইনজীবীরা তার সাহায্যে স্বার্থোদ্ধার করছে—প্রলিটেরিয়েটের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগ নেই, ইত্যাদি।

সুতরাং অরবিন্দের পাণ্ডিত্য বা রাজনীতি, এমন-কি অরবিন্দের ধর্ম-ধারণার বিষয়ে জানবার জন্য এই স্মৃতিকথাটি আমরা পড়ব না। খুবই বিস্ময়ের কথা, দু'বছরের উপর এক ঘরে অরবিন্দের সঙ্গে বাস করেও দীনেন্দ্রকুমার পরবর্তী যোগী অরবিন্দের ধর্মভূমিকার

কোনো পরিচয় দেননি। কিন্তু তা যদি না দিয়ে থাকেন, তার একমাত্র কারণ, তখনো অরবিন্দের মধ্যে যোগীর আবির্ভাব হয়নি, যদিও যোগীর উপাদানগত সমস্ত লক্ষণই তাঁর মধ্যে প্রকটিত ছিল। এবং সেই 'উপাদানে'র উন্মোচন এই পুস্তকের একটি প্রধান মূল্য।

বইয়ের আরম্ভটি বড়ো সুন্দর। বিনা ভূমিকায় সরাসরি মূল বিষয়ে নেমে পড়েছেন লেখক স্বচ্ছন্দ সরসতায়:

"শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ এত অল্পদিনের মধ্যে এরূপ বিখ্যাত হইয়া উঠিবেন, সমগ্র ভারতের পুলিশবাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত হইবে, এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার নর্টন সাহেব তাঁহাকে রাজদ্রোহী প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভারতের দরিদ্র প্রজার শোণিততুল্য সহস্র-সহস্র মুদ্রা শাম্পেন-পানি অপেক্ষাও সহজে গলাধঃকরণ করিবেন, বোমার মামলা আরম্ভ হইবার পূর্বে একথা আমার কল্পনার অতীত ছিল।"

দীনেন্দ্রকুমার যখন অরবিন্দের বাংলাশিক্ষকরূপে বরোদা গিয়েছিলেন তখন অরবিন্দ বিখ্যাত হননি, কিন্তু লেখক এইটুকু জেনে নিয়েছিলেন, অরবিন্দ "প্রগাঢ় পাণ্ডিত লোক", সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় গ্রীক ল্যাটিনে রেকর্ড-নম্বর পেয়েছেন, এবং ৫।৬ বৎসর বয়স থেকে ১৮।২০ বছর পর্যন্ত একাদিক্রমে বিলাতে কাটিয়েছেন। সুতরাং তিনি ছাত্রের একটা চেহারা অগ্রিম কল্পনা ক'রে নিয়েছিলেন: "'সাহিত্য'-সম্পাদক বন্ধুবর সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের ন্যায় প্রকাণ্ড জোয়ান; চোখে চশমা, অধিকন্তু আপাদমস্তক হ্যাট-কোট-বুটে মণ্ডিত, মুখে বাঁকাবাঁকা বুলি, চক্ষুতে কটমট চাহনি, মেজাজ ভয়ঙ্কর রুক্ষ।"

আর সাক্ষাতে কি দেখলেন?...

"বলাবাহুল্য অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতে বড়ই নিরাশ হইয়াছিলাম। তখন কে ভাবিয়াছিল যে, পায়ে শুঁড়ওয়ালা সেকেলে নাগরা জুতা, পরিধানে আমেদাবাদ মিলের বিশ্রী পাড়ওয়ালা মোটা থান, কাছার আধখানা খোলা, গায়ে আঁটো মেরজাই, মাথায় লম্বা-লম্বা গ্রীবাবিলম্বিত বাবরিকাটা পাতলা চুল, মধ্যে চেরা সিঁথি, মুখে অল্প-অল্প বসন্তের দাগ, চক্ষুতে কোমলতাপূর্ণ স্বপ্নময় ভাব, শ্যামবর্ণ ক্ষীণদেহধারী এই যুবক ইংরাজী, ফরাসি, ল্যাটিন, হিব্রু, গ্রীকের সজীব ফোয়ারা শ্রীমান্ অরবিন্দ ঘোষ। দেওঘরের পাহাড় দেখাইয়া যদি কেহ বলিত—ঐ হিমালয়।—তাহা হইলেও বোধহয় ততদূর বিস্মিত ও হতাশ হইতাম না।"

"হতাশা" কেটে অতঃপর কিভাবে শ্রদ্ধার সঞ্চার হল, কিভাবে বুঝলেন যে, "অরবিন্দ এ-পৃথিবীর মানুষ নহেন"—তাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য—এবং পাঠককে তা জানতে হলে এই গ্রন্থের কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টে নিতে হবে।

দীনেন্দ্রকুমারের বর্ণনা থেকে এই কালের অরবিন্দের যে-রূপ দেখি, তাতে দুটি ছবি বার-বার ঘুরে ফিরে এসেছে—প্রথম ছবি—সুখে বা কষ্টে অনুদ্বিগ্ন এক মানুষের,

দ্বিতীয় ছবি—গ্রন্থনিমজ্জিত তদ্গত মানুষের। এই কালে অরবিন্দ যদি তপস্বী হয়ে থাকেন, দীনেন্দ্রকুমারের বর্ণনা অনুযায়ী সে তপস্যার বেদীপীঠ গ্রন্থাগার।

অরবিন্দের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার কথা আমরা এই রচনায় পেয়েছি। পোষাকে বা খাদ্যে কোনো বিলাসিতা তাঁর ছিল না—প্রখর শীতে গ্রীষ্মেও নির্বিকার থাকতেন। অর্থ সম্বন্ধে তাঁর কোনো আসক্তি ছিল না। অরবিন্দের পাচক ও ভৃত্যদের মুক্ত স্বাধীন আচরণের কৌতুকজনক বিবরণ লেখক দিয়েছেন।

অরবিন্দ অল্পাহারী ছিলেন, তবে নিরামিষাশী নন। মাছ মাংস সবই খেতেন। নিয়মিত ইসবগুল খেতেন, সিগারেটও খেতেন। অরবিন্দের বন্ধু কম ছিল, তবে মাঝে-মাঝে গল্প করতে ভালবাসতেন। তখন কোমল হাসিতে ভরে থাকত মুখ। ব্রাহ্ম-পরিবারের মানুষ হলেও থিয়েটারের প্রতি জাতক্রোধ ছিলেন না। তিনি সাধারণভাবে জনপ্রিয় ছিলেন না, যদিও ছাত্র ও শিক্ষক মহলে তাঁর প্রচুর খ্যাতি ছিল। আর বরোদার রাজা যেহেতু তাঁকে খাতির করতেন, তাই প্রায়ই সুপারিশপ্রার্থীর দল তাঁর কাছে হাজির হত। অরবিন্দ আত্মমর্যাদা বজায় রেখে রাজার সঙ্গে ব্যবহার করতেন, এমনকি কোনো-কোনো সময় আহূত হয়েও কাজ ছিল বলে রাজসকাশে যাননি, অথচ এই রাজার প্রতি (সয়াজীরাও গায়কোয়াড়) তাঁর প্রচুর শ্রদ্ধাও ছিল।

অরবিন্দের ধর্মবিশ্বাসের কোনো কথা দীনেন্দ্রকুমারের লেখাতে না পাওয়া গেলেও "জ্যোতিষে প্রগাঢ় বিশ্বাসের" পরিচয় পেয়েছি। "মানবজীবনের উপর গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রভাব আছে ইহা তিনি স্বীকার করিতেন। কোষ্ঠীপত্র দেখিয়া জাতকের জীবনের শুভাশুভ জানিতে পারা যায়, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।" সুতরাং লেখক যখন তাঁর স্বগ্রামবাসী "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক, জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত" কালীপদ ভট্টাচার্যকে দিয়ে অরবিন্দের কোষ্ঠী তৈরি করিয়ে নেবার প্রস্তাব করেছিলেন তখন অরবিন্দ রাজি হয়েছিলেন; এমনকি "প্রতি দিবসের ফলাফল" জানা যায় এমন বিস্তারিত কোষ্ঠী করিয়ে নেবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। কালীপদ ভট্টাচার্যের কাছে অরবিন্দের কোষ্ঠী-গণনার ফল শুনে দীনেন্দ্রকুমার চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন: "তোমার ছাত্রটি অসাধারণ ব্যক্তি; তিনি রাজার প্রিয়পাত্র হইলেও তাঁহার অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে; গার্হস্থ্য জীবনের সুখ তাঁহার অদৃষ্টে বড় অধিক নাই।" এই গণনা বিস্ময়কর বটে, কারণ "সেই সময় অরবিন্দ বিবাহের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। শীঘ্রই তিনি বিবাহ করিবেন। বরোদায় তিনি অনেক টাকা বেতনের চাকরি করেন। তাঁহার স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ। তাঁহার অদৃষ্টে গার্হস্থ্যসুখ নাই!"

শেষ পর্যন্ত দেখা যায়—দীনেন্দ্রকুমারের রচনায় জ্ঞানতপস্বী অরবিন্দের ছবিই গভীর রঙে আঁকা হয়েছে। অরবিন্দ রাশি-রাশি বই কিনতেন, আর প্রায় দিবারাত্র তাতে ডুবে থাকতেন। "এরূপ পাঠানুরাগ আমি কাহারও দেখি নাই।" "অরবিন্দ রাত্রি একটা পর্যন্ত দুঃসহ মশক দংশন উপেক্ষা করিয়া টেবিলের ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া জুয়েল-ল্যাম্পের আলোকে সাহিত্যালোচনা করিতেন। তাঁহাকে পুস্তকের উপর

বদ্ধদৃষ্টি অবস্থায় একইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সেই স্থানে উপবিষ্ট দেখিতাম। যোগনিমগ্ন তপস্বীর স্থায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ঘরে আগুন লাগিলেও বোধহয় তাঁহার হুঁশ হইত না। তিনি এইভাবে প্রতিদিন রাত্রি জাগরণ করিয়া ইউরোপের নানা ভাষার কত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিতেন, তাহার সংখ্যা ছিল না। অরবিন্দের পাঠাগারে ইউরোপের নানা ভাষার গ্রন্থ স্তূপীকৃত ছিল। ফরাসি, জার্মান, রাশিয়ান, ইংরাজি, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু প্রভৃতি কত ভাষার কত রকমের পুস্তক, তাহার পরিচয় আমার জানা ছিল না।…হোমারের ইলিয়াদ, দান্তের মহাকাব্য, আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থাবলী, সমস্তই অরবিন্দের পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল। রুশীয় ভাষার তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন, কি চিত্রশিল্পে, কি সাহিত্যে, রুশিয়া একদিন ইউরোপের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।"

অরবিন্দ ক্লাসিক সাহিত্যের বিশেষ ভক্ত আমরা জানি—দীনেন্দ্রকুমারের রচনা থেকে অধিকন্তু জেনেছি—পৃথিবীর ক্লাসিক সাহিত্যে বাল্মীকির রামায়ণকে তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। তিনি রামায়ণ মহাভারতের ইংরেজি অনুবাদও শুরু করেছিলেন। সে কাজ তাঁর আগে খানিক করেছিলেন সুবিখ্যাত রমেশ দত্ত। রমেশ দত্ত অরবিন্দের অনুবাদ দেখে যে-মন্তব্য করেছিলেন, তার থেকে বড় প্রশস্তি বোধহয় সম্ভব নয়—"তোমার এইসব কবিতা দেখিয়া, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে আমি কেন পণ্ডশ্রম করিয়াছি ভাবিয়া দুঃখ হইতেছে। তোমার এই কবিতাগুলি আগে দেখিলে আমি আমার লেখা কখনই ছাপাইতাম না। এখন মনে হইতেছে আমি ছেলেখেলা করিয়াছি।"

দীনেন্দ্রকুমার রমেশ দত্তের মন্তব্য উদ্ধৃত করার পরে যোগ ক'রে দিয়েছেন—"অথচ রমেশ দত্ত মহাশয়ের সেই রামায়ণ মহাভারতের [অনুবাদের] প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনায় ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিকের স্তম্ভ পূর্ণ হইয়াছিল।"

একটা জিজ্ঞাসা থেকে যাচ্ছে—যে-মাতৃভাষা শেখবার জন্যে অরবিন্দ দীনেন্দ্রকুমারকে শিক্ষক ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই বাংলা ভাষাশিক্ষার কতদূর হয়েছিল? হাঁ, বাংলা তিনি শিখেছিলেন, সাহিত্য উপভোগের পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল, যদিও সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। অরবিন্দ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইংরেজী ভাষারই লেখক। তাহলেও এইকালে, অর্থাৎ প্রথম পরিচয়ে, বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কী দাঁড়িয়েছিল? বিশেষ সংবাদ পাই না, কিছু 'বি'ক্ষিপ্ত সংবাদ মাত্র মেলে। অরবিন্দ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, দীনবন্ধুর সধবার একাদশী, লীলাবতী, তারকনাথের স্বর্ণলতা পড়েছিলেন। সাধু বাংলা ভালো বুঝতেন, কিন্তু চলতি বাংলার ইডিয়ম বুঝতে অসুবিধায় পড়তেন। স্বর্ণলতার গার্হস্থ্যচিত্র অরবিন্দকে মুগ্ধ করেছিল। "স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা প্রবন্ধগুলি পাঠে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন। আমাকে বলিতেন, স্বামীজীর ভাষায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। ভাষায় ভাবে এরূপ ঝংকার, শক্তি ও তেজ অন্যত্র দুর্লভ।" রবীন্দ্রনাথের কবিতাও তখন তিনি পড়েছিলেন। "এই কোকিল-কবির প্রতিও তিনি যথেষ্ট

শ্রদ্ধাবান ছিলেন," কিন্তু "রবীন্দ্রনাথের সকল কবিতাই প্রকাশের যোগ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইত না।"

অরবিন্দ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অনুরাগী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস তিনি নিজেই পড়তেন ও "বেশ বুঝিতে পারিতেন।" "বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। তিনি বলিতেন, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অতীত ও বর্তমানের ব্যবধানের উপর স্বর্ণ সেতু।"

অরবিন্দের জীবনী-পাঠক মাত্রেই জানেন তাঁর উপর বঙ্কিমচন্দ্রের কী গভীর প্রভাব ছিল। সে প্রভাব সাহিত্য থেকে রাজনীতিতে পৌঁছেছিল। 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গে অরবিন্দ' একটি বৃহৎ প্রসঙ্গ—তার মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা এখন আমার নেই—কিন্তু আমরা জানি যে, দীনেন্দ্রকুমার যে-সময়ের কথা বলছেন (১৮৯৮—১৯০০), তার চার-পাঁচ বছর আগেই অরবিন্দ বঙ্কিমের দেহত্যাগের সূত্রে বিস্তারিত এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায়, ইংরেজী ভাষায়। সে প্রবন্ধগুলি নবীন যুবকের লেখা—উচ্চ এবং সশব্দ ভঙ্গি কিছুটা সেখানে আছে, কিন্তু বাংলার 'নবজন্ম' এবং বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এমন কতকগুলি বাক্য তাতে আছে যার থেকে উদাত্ত গভীর রচনা প্রায় দেখা যায় না। ক্লাসিক্যাল গাম্ভীর্যের সঙ্গে রোমান্টিক আবেগ মিশে গিয়েছিল সেই রচনায়। আর সে কী আহত মর্যাদার স্পর্ধাযুক্ত ঘোষণা বঙ্কিমচন্দ্রের 'অসম্মানের' বিরুদ্ধে! 'বঙ্কিম বাংলার স্কট'—আত্মভ্রষ্ট পরমুখাপেক্ষী বাঙালি এই কথাটি বলতে পেরে সেদিন কী পুলকিত! কথাটা শুনে লজ্জায় মাথা কাটা গিয়েছিল অরবিন্দের। এক দ্বিতীয় শ্রেণীর রসবোধহীন স্কটিশ সাহিত্যিক—নারীচরিত্র আঁকার সময়ে যিনি কতকগুলি পুতুল ভিন্ন আর কিছু সৃষ্টি করতে পারেন নি—তাঁর সঙ্গে সমকালীন পৃথিবীর প্রথমশ্রেণীর এক প্রতিভার তুলনা! বঙ্কিমের ঐ তথাকথিত সম্মানের চেয়ে বড় অসম্মান আর কিছু সম্ভব নয়। ধিক্কার দেবার অধিকার অরবিন্দের অবশ্যই ছিল—কারণ তিনি বিদেশী সাহিত্যের নামজাদা ছাত্র, এবং এমন ইংরাজী জানতেন যে—"বিলেতের মেথরানীও গড়-গড় ক'রে ইংরেজী বলে, অহো কি আশ্চর্য!'—এই সহর্ষ উন্মাদনা বোধ করার প্রয়োজন তাঁর হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র-প্রসঙ্গে অরবিন্দের ওই প্রাথমিক রচনা প্রায় আশি বছর পরেও অংশত অনতিক্রান্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্য দিয়ে অরবিন্দ বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের সমকালীন সাহিত্যকে প্রথম চিনেছিলেন। আই-সি-এস পড়ার সময়ে তিনি নাকি মূল বাংলায় বঙ্কিম পড়েছিলেন। তাই হয়ত দীনেন্দ্রকুমার তাঁকে সহজেই বঙ্কিম পড়তে দেখেছিলেন, চার বৎসর পরে।

অরবিন্দের যাঁরা জীবনী লিখবেন তাঁদের পক্ষে, এবং অরবিন্দকে সহজরূপে কাছ থেকে দেখবার ইচ্ছা যাঁরা করবেন তাঁদের পক্ষেও, দীনেন্দ্রকুমারের রচনা অবশ্যপাঠ্য।

দীনেন্দ্রকুমার তাঁর বইটি শেষ করেছেন বিচিত্রভাবে, মনে হয় কিছুটা অসংলগ্নভাবে।

শেষের দিকে তিনি অরবিন্দ-প্রসঙ্গ ছেড়ে বরোদার নানা অভিজ্ঞতার বর্ণনায় মেতে গিয়েছিলেন। একবার বিজয়াদশমীর সময়ে "রাজকীয় শোভাযাত্রার অগ্রে বৃহৎ অশ্বে উপবিষ্ট, দাড়ি গোঁফহীন নিরস্ত্র এক সৈনিকের দীর্ঘ মূর্তি" তিনি দেখেন। গম্ভীর মর্যাদা-সম্পন্ন সেই অশ্বারোহী কিন্তু হিন্দু নন, জাতিতে মুসলমান। মুসলমান অথচ শ্মশ্রু-গুম্ফহীন? পিছনের ইতিহাস চমকপ্রদ। ইনি বরোদার ভূতপূর্ব সেনাপতি; এঁর প্রভু ছিলেন মলহররাও গায়কোয়াড়। ইংরেজ রেসিডেন্টকে বিষ প্রয়োগের অভিযোগে তাঁকে রাজ্যচ্যুত করা হয়। মহারাজের এই অসম্মানের বিরুদ্ধে এই সেনাপতি সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলেন। সে বিদ্রোহ নিশ্চিত আত্মঘাতী হবে জেনে মলহররাও সম্মত হননি। তখন সেনাপতি রাজার পদতলে তরবারি বিসর্জন দিয়ে ঘরে ফিরেছিলেন। ঘরে ছিলেন তাঁর তেজস্বিনী বৃদ্ধা জননী। পুত্র নিমকের মান রাখেনি—জননী বলেছিলেন, ধিক! বলেছিলেন—ঐতিহাসিক বীরযুগের রমণীর মতোই—"আর কিছু করতে না পারিস, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন করতে পারিস তো! তা না ক'রে যখন হাতিয়ার ছেড়ে চলে এসেছিস, এখন তোর আর দাড়ি-গোঁফ রাখা শোভা পায় না। তুই দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে পুরুষের নিদর্শন বিসর্জন কর!"

তারপর থেকে এই পুরুষবীর মুণ্ডিতমুখ, কৃপাণহীন—শোভাযাত্রার অগ্রশোভামাত্র! সেই সুবিশাল অসম্মানিত মর্যাদার দিকে তাকিয়ে কেন জানি দীনেন্দ্রকুমারের চোখে ভেসে উঠেছিল "অরবিন্দের সৌম্য শান্তমূর্তি!"

অরবিন্দ রাজদ্রোহী হতে পারেন—একথা কখনো বিশ্বাস করতে পারেনি দীনেন্দ্রকুমারের সাবধানী সতর্ক হিসাববুদ্ধি। কিন্তু তার আত্মা আর্তনাদ করে বলেছিল—না না, আমার ধারণা মিথ্যা, মিথ্যা! সেই যন্ত্রণাকাতর প্রাণরেখাই রচনাশেষের অসংলগ্ন ভাবনার মধ্যে আঁকাবাঁকা হয়ে ফুটে উঠেছে।

'পার্থসারথি', শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৭৯

সত্যজিৎ রায়

॥ ১ ॥

'অপুর সংসার'—বাংলার যৌবনস্বপ্ন

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং শর্মিলা ঠাকুর এখন পৃথিবীর চোখের সামনে। পিছনে আছেন সত্যজিৎ রায়। লাইম লাইটের বৃদ্ধ অভিনেতাটির কথা আমার মনে পড়ছে। সে তুলে ধরেছিল একটি ভগ্ন প্রতিভাকে। নবজীবনের উল্লাসে মেয়েটি নৃত্যচ্ছন্দে যখন নিজেকে বিকিরিত করছে রঙ্গমঞ্চে, পর্দার আড়াল থেকে তখন নিজ সৃষ্টির দিকে শেষদৃষ্টি মেলে শুয়ে আছে মরণাহত বৃদ্ধ অভিনেতা—তার চোখের আলোয় রাত্রির পদধ্বনি। সেটা সেটা ছিল গল্প। আজ বাস্তবে কি বিপরীত দেখলুম। কোথা থেকে এক নতুন শর্মিলা ও নতুন সৌমিত্র এসে পর্দায় প্রাণ ছড়িয়ে গেল, তাঁদের দিকে দৃষ্টি মেলে আছেন স্রষ্টা সত্যজিৎ—তিনি কিন্তু আরো বেঁচে উঠছেন। তাঁর দ্বার খুলে যাচ্ছে। চার্লি চ্যাপলিন জীবনরসকে গাঢ় করে দেখিয়েছেন, দেখিয়েছেন হাসির পিছনে কান্নার ঐশ্বর্য, দেখিয়েছেন জীবন-পুষ্পের বিকাশের জন্য প্রয়োজন যে জীবনরস সে আসলে মৃত্যুরস, দেখিয়েছেন জীবনের সুন্দর আলোকলতাটি পরজীবী। সত্যজিৎ দেখালেন অন্য জিনিস, সহজ জিনিস। রঙ্গমঞ্চের অত্যুজ্জ্বল আলোকের পরিবর্তে সংসারের সস্নেহ দীপ। জীবন একদিকে মথিত ও ভয়ঙ্কর, অন্যদিকে স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছও বটে। জীবন নাটক—আবার কাব্য। যে যেভাবে ছাখে। লাইম লাইটের জীবনদর্শন থেকে 'অপুর সংসারে'র জীবন-রূপ যদি আমার বেশি ভালো লেগে থাকে, সে রুচির দায়িত্ব অবশ্য আমারই।

'অপুর সংসার'-এ সত্যজিৎ বিভূতিভূষণকে সর্বাধিক লঙ্ঘন ক'রে সর্বাধিক গ্রহণ করেছেন।

'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত' যখন দেখেছিলুম তখন সত্যজিতের নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়েও আবিষ্ট থেকেছি বিভূতিভূষণের মহিমার ধ্যানে। চিত্রপরিচালক-রূপে সত্যজিৎ বিভূতিভূষণকে কিছু পরিমাণে উদ্ঘাটিত করতে পেরেছ সেখানে ধন্য স্রষ্টা। কতবার এমনকি অভিযোগ আক্ষেপ বোধ করেছি—সত্যজিৎ বিভূতিভূষণকে অস্বীকার করেছেন, বিভূতিভূষণের সদানন্দ বিমুগ্ধ ভুবনে সত্যজিৎ কঙ্কালের শীর্ণতা এনেছেন অতিরিক্ত পরিমাণে। সত্যজিতের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে মাসিকপত্রে দীর্ঘ যুক্তির বিস্তার দেখে হেসেছি। এত যদি বস্তুপ্রীতি, বাস্তববাদী কোনো সাহিত্যিককে নিলেই হতো, বিভূতিভূষণের উপর অত্যাচার কেন? আবার যেখানে শিশু অপুর চোখ-জোড়া বিস্ময়, কি দুর্গার অবাধ্য চাঞ্চল্যকে 'পথের পাঁচালী'তে সত্যজিৎ উদ্ঘাটিত করতে পেরেছেন, তাঁর জয় দিয়েছি মুক্তকণ্ঠে। কিন্তু 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'তে বিভূতিভূষণ যেখানে সৃষ্টিশীলতার চূড়ান্ত স্তরে—সেখানে তাঁকে রূপব্যক্ত করা সাধ্য ছিল না সত্যজিতের পক্ষে।

বিভূতিভূষণ যেখানে ম্লান ম্রিয়মাণ, সত্যজিতের আত্মপ্রতিষ্ঠার সেইখানে অবসর। শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী বলেছিলেন—সত্যজিতের কৃতিত্ব, পর্দায় 'পথের পাঁচালী'র সম্ভাবনাকে অনুভব ও কিছু পরিমাণে রূপায়িত করার মধ্যে। সে-কথা হয়ত কিছু পরিমাণে সত্য। কিন্তু ঐ মন্তব্যের মধ্যে যদি সত্যজিতের প্রতিভা সম্বন্ধে প্রশংসার বিরুদ্ধে কোনো সংশোধনী কটাক্ষ থাকে, সত্যজিৎ প্রায় 'অপুর সংসার'-এ তার উত্তর দিয়েছেন। সত্যজিৎ এখানে বিভূতিভূষণকে উজ্জ্বলতর করেছেন। গ্রাম থেকে নগরে প্রবাসী যুবক অপূর্ব জীবন-জিজ্ঞাসায় যত অধীর হয়েছে, মুগ্ধ শৈশবকে ততই হারিয়েছে। শৈশবহারা বিভূতিভূষণ 'আত্ম'-হারা। তা বুঝেই পরিণত বয়সেও অপুর মধ্যে অবিকৃত শৈশবকে দেখবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছেন। তাতে ঘটেছে আত্মানুকরণের দোষ। আদি বিভূতিভূষণের সমর্থনে চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ এইখানে এসেছেন। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'তে নগ্ন দুঃখবাস্তবের স্রষ্টারূপে যে-সত্যজিতের সমালোচনা করেছি, তিনি 'অপুর সংসার'-এ শুধু স্বপ্ন দেখেছেন—ঘরের স্বপ্ন, প্রেমের স্বপ্ন। শিশু-স্বপ্নের সেই হল পরিণত রূপ। অপুকে গ্রাম থেকে সহরে এনে, টালার রেল-লাইনের ধারে একটা পুরোনো বাসাবাড়ীতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিভূতিভূষণের ছিন্ন স্বপ্নের পুনর্জীবন ঘটেছে সত্যজিতের হাতে 'অপুর সংসার'-এ। স্বয়ং সত্যজিৎ 'অপুর সংসার'-এ আত্মশোধন করেছেনও বটে। অথচ শেষ পর্যন্ত তাঁর বাস্তববোধ, পরিস্থিতিবোধ, সত্যবোধ কোথাও ক্ষুণ্ণ নয়। বাংলাদেশের স্মরণীয়তম আশ্চর্যতম চলচ্চিত্রের স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়। চিত্রটির নাম বলা বাহুল্য, 'অপুর সংসার'।

কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারছি না। একেবারে গোড়াতেই আরম্ভ করা যাক। শেয়ালদার মোড়ে চটের ক্যানভাসে আঁকা একটা বড় ছবি উঠেছে, একদিন দেখলুম। বিশাল করে আঁকা একটি যুবকের মুখ, মুখের একটা পাশ। তার কানের ধার দিয়ে লোটানো চুল, লম্বা সুন্দর নাক, সরু চিবুক, চওড়া কপালে ভ্রূর কাছে অল্প কুঞ্চন, নাকের পাশে গভীর রেখা। সুন্দর যৌবন, কিন্তু সমস্যায় ঈষৎ ক্লিষ্ট। এবং অন্তর্নিবিষ্ট। তারই পাশে গা ঘেঁষে একটি মেয়ে, তারও মুখটুকুই আঁকা আছে, তবে সামনে ফেরানো মুখ। বাংলাদেশের গ্রাম-কিশোরী। একরাশ কালো চুল, টিকলো নাক, কপালে টিপ। দীঘল ডাগর চোখ; চোখে সরল বিস্ময়, অগাধ কৌতূহল, আর অসীম আশ্রয়। ঘন সান্নিধ্যের নির্ভরতা। একটি যুবক এবং একটি কিশোরীর মুখ পাশাপাশি—শেয়ালদার সদাব্যস্ত জনারণ্যের উপরে। চটের ছবির ডান দিকে তারপর অনেকখানি ফাঁক। এক কোণে একটি শিশু। ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে। উদ্ধত সন্দিগ্ধ শৈশব। কেমন অস্বস্তিকর।

শেয়ালদার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমার এক বন্ধুকে বলেছিলুম—'অপুর সংসার' বই যেমনই দাঁড়াক, সত্যজিৎ বিজ্ঞাপনে নিজেকে জ্ঞাপন করেছেন। একই কথা মনে হয়েছিল কয়েক বছর আগে হাওড়া-ব্রিজের কাছে 'পথের পাঁচালী'র শিশু অপুর ছবি দেখে।

সত্যজিৎ ছবি এঁকেছেন ক্যামেরার তুলিতে। 'ক্যামেরার তুলি' কথাটা মোটেই সুন্দর শুনতে নয়। কিন্তু কথাটা বলতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়েছি। সত্যজিতের পূর্ব-পরিচয় ছিল সুকুমার রায়ের পুত্ররূপে, আর শিল্পীরূপে। সাহিত্যের রক্তে শিল্পের জন্ম। তদুপরি বিজ্ঞানচেতন শিল্পী। সত্যজিৎ সাহিত্যিকের কল্পনা নিয়ে দেখেছেন এবং শিল্পীর চোখ দিয়ে এঁকেছেন। বিজ্ঞানবোধ সে-ছবিতে এনেছে প্রজ্ঞা ও পরিমিতিবোধ। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'র রাশি রাশি ছবি সত্যজিৎ মনে-মনে রচনা করে গেছেন। তারপর খুঁজেছেন মানুষ, আর মুখ, আর পৃথিবী, ঐ মনে-আঁকা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে। আর্টিস্ট-রূপে তাঁর সততা এইখানে, যতক্ষণ-না বাস্তব মিলেছে কল্পনার সঙ্গে, থামেন নি সন্ধানে। সত্যজিৎ রায় নিজের জগতের অহঙ্কারী, অসন্তুষ্ট অধিপতি।

তাই সত্যজিৎ কত নতুন মুখ আনতে পারলেন পর্দায়। তিনি শুধু সুন্দর মুখ চাননি, চেয়েছেন বাঙ্ময় মুখ। বাংলা ছায়াছবির পর্দায় মুখের ভাষার এতবড় কবিশিল্পী আর কেউ নেই। সবজয়ার নিগ্রহ-কঠিন মাতৃত্ব, ইন্দির ঠাকরুনের শতাব্দীর ক্ষয়, অপুর শরতের-আলো-মাখা বিস্ময়, দুর্গার সজীব সবুজ লোলুপতা—সত্যজিৎ ফুটিয়েছেন মুখের পটে, পর্দার পটভূমিকায়।

সৌমিত্র আর শর্মিলার আবিষ্কারই মস্ত আবিষ্কার।

বাংলাদেশের আহত তবু অব্যাহত যৌবন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের দেহরূপে বেঁচে রইল টালা-ব্রিজের একটা পুরোনো বাসাবাড়ীর নোংরা একটা ঘরের মধ্যে। আর গ্রামের কালো দীঘি ও শ্যামল জীবন—কথা বলে গেল শর্মিলা ঠাকুরের রহস্যঅতল চোখে ও মুখের রেখায়।

জীবন এত সুন্দর, ভালবাসা এমন পবিত্র—কলকাতা সহরের 'মানুষ-কীট'দের মধ্যেও? একি বিশ্বাস্য?

অপূর্বর সঙ্গে অপর্ণার বিয়ে হয়েছিল বাংলাদেশের সহজ দুর্ভাগ্যের ঘটনাসূত্রে, সাহসী যৌবনের মরীয়া বরণে। এ দেশের বাপ-মা অ-শিবকে 'গৌরীদান' করেন চোখের জল মুছে। অপর্ণার ছিল শিবপূজার জোর, পেয়ে গেল পটের ঠাকুরকে। নদীর ধারে হাতের বাঁশি মাটিতে রেখে গাছের তলায় শুয়ে ছিল অপূর্ব ঠাকুর, তাকে উঠে আসতে হলো বরাসনে, তার আগে কুণ্ঠিত হয়ে বললে, দূর ছাই, দাড়িটাও কামানো হয়নি, জামাকাপড় কোথা পাই!

সত্যজিৎ রায় তারপর একটি ফুলশয্যা দেখিয়েছেন। বোম্বাই কিংবা হলিউড হায়-হায় করে উঠবে—এমন সুযোগ নষ্ট! আমরা সত্যজিৎকে নমস্কার করে বলব, আদিরস যে 'মধুর' রস, তা দেখলুম ছবির পর্দায়।

তারপর অপূর্ব-অপর্ণার দাম্পত্য জীবন। রসের তুলির প্রতিটি আঁচড়ে ফুটেছে একটি অক্ষর—'জিনিয়াস'। অপরিসীম স্বাদু ও মধুচেতনায় বিবশ মন শুধু দেখে গেছে গৃহের কথাকাব্য। বস্তুর মতো সত্য কিন্তু স্বপ্নের মতো মনোহর।

এই কালেই সেই গদ্য প্রেমকবিতাটি পেয়েছি যার নাম দিতে পারি 'অনুশোচনা কাব্য'। অপর্ণার কষ্ট দেখে অপূর্ব দুঃখিত হয়ে বলল, আমাকে বিয়ে করে তোমার বোধহয় অনুশোচনা হচ্ছে। অপর্ণা বুঝেও বুঝল না, বলল যে, সে শক্ত বাংলা বোঝে না। অপূর্ব প্রতিশব্দ জোগাল—আফশোস। পরিচ্ছন্ন দৃঢ়তায় অপর্ণা তখন অনুশোচনা শব্দটিকে প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু অপূর্ব শান্তি পায় না। বড়লোকের মেয়ে অপর্ণাকে স্বামীর সংসারে দাসীবৃত্তি করতে হচ্ছে। অপূর্ব মরীয়া হয়ে ছুটল ঝি জোগাড় করতে। তার জন্য আরো একটা টিউশনি সে করবে। অপর্ণা স্বামীর ঘনিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে আরো দেরী ক'রে বাড়ি ফিরবে?'—'হাঁ।' 'তাতে কি ফল?'—'তোমার কষ্ট যাবে।' অপর্ণা বলল, কষ্ট যাবার একটা ভালো উপায় সে জানে।—'কি?' 'যে দুটো টিউশনি করছ, সেগুলোও ছেড়ে দাও।' তাহলে অপর্ণা তার গরীব স্বামীকে আরো বেশি ক'রে পাবে। তাহলে তার আর "অ-নু-শো-চ-না" থাকবে না।

এ মেয়ে মরে যাবে। প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি দর্শক ভাববেন, তাঁর নিজের মেয়ে বা বোন মরে গেল। কিশোরী মেয়েটিকে সামান্যক্ষণের মধ্যে সকলে কী-যে স্নেহ করেছে—হাঁ স্নেহ। বাড়ীর মেয়ের মতো মনে করেছে। এই সাধারণী বাৎসল্যের সৃষ্টি করেছেন সত্যজিৎ বাংলাদেশের চিরন্তন হৃদয়-বেদনায় টান দিয়ে। মানবী কন্যার ভালবাসার আগমনীতে যখন প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি প্রাণ ঝঙ্কৃত, তখন সুরের তার ছিঁড়ে দেওয়া হলো হঠাৎ নিষ্ঠুরভাবে। রেল-লাইনের উপর দাঁড়িয়ে অপূর্ব যখন প্রতি মাসে নির্ধারিত আটটা চিঠির বদলে সাতটা লেখার বিরুদ্ধে অপর্ণার অনুযোগ-মধুতে মশগুল, সেইসময় মৃত্যুদূত এল অপর্ণার ভাইয়ের মূর্তিতে। এমন অবিশ্বাস্য অন্যায় অপরাধী মৃত্যু দেখিনি। সে-মৃত্যুতে কোনো আর্ট ছিল না, ছিল 'নেচার'। সে-মৃত্যুকে আমরা কিছুতে মেনে নিতে পারিনি। লেখকের কলমের এক খোঁচায় অপ্রস্তুত সৃষ্টি। আত্মবিস্মৃত অপূর্ব ভগ্নদূতকে আঘাত করেছে বজ্র ক্রোধে। তাতে অস্বস্তিবোধ করেছেন কেউ-কেউ। আমিও। প্রয়োজনীয় অস্বস্তি। আর্টের উপর নেচার জয়ী হ'লে তার প্রকাশ রূঢ় হয়ই। বিশ্ব-শিল্পকে বিনষ্ট দেখে অপূর্ব ক্রোধে যা করেছে, সেই স্থূল কর্ম ছাড়া ঐ পরিবেশে আর কোনো কিছুকে আমি স্বাভাবিক ভাবতে পারি না।

তারপর সত্যজিতের ক্যামেরা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখের সামনে আর্তভাবে ছটফট করেছে—চেয়েছে, সেখানে মৃত্যুশোক আসুক—আসুক চোখের কালিতে, মুখের কুঞ্চনে, উদ্‌ভ্রান্ত আচারে, মূর্ছিত নিশ্বাসে। অদ্ভুত অভিব্যক্তিতে সৌমিত্র সত্যজিৎকে সাহায্য করেছেন। অভিনয় হয়েছে অসামান্য। কিন্তু কিছু হয়নি। অপর্ণার মৃত্যুশোক ফোটাতে পারেন নি কি নায়ক কি পরিচালক। একটি অনিবার্য ব্যর্থতার পটে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে কয়েক হাজার ফুট-ভরা পূর্বের পূর্ণ জীবন। প্রথম দেখলুম, মিলনের কাব্য ছাড়িয়ে গেল বিরহের কাব্যকে। সান্ত্বনা ও সহানুভূতিভরা মন নিয়ে সকল দর্শক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে দাঁড়াল। অপর্ণাকে হারানোর বেদনা ফোটানো সম্ভব নয় বলেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পারেন নি।

অপর্ণা পালিয়ে গেছে অপূর্বকে ছেড়ে। অপূর্ব এবার পালাতে চাইল অপর্ণার কাছ থেকে। অর্থাৎ নিজের কাছ থেকে। পাঁচ বছর ঘুরল পথে প্রান্তরে অরণ্যে। তার জীবনে অপর্ণা এমন সর্বগ্রাসী সত্য যে, অপর্ণার সন্তানকে পর্যন্ত মেনে নিতে পারল না। অপূর্বর শিশুপুত্র বছরের পর বছর পড়ে রইল মাতুলালয়ের অবহেলিত জীবনে। এই সময় সকল দর্শকের মনে একটিই কথা উঠেছে, সকলে বুঝেছে অপূর্ব কেন ছেলেকে ফিরে চাইছে না, অপূর্বর বক্তব্য সকলেরই মনে মনে জানা হয়ে গেছে, সে নিশ্চয় বলবে, নিজের মাকে মেরে এসেছে, এমন ছেলেকে চাই না। দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ করে বন্ধু পুলুকে অপূর্ব সেই কথাই বলেছিল। আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু বললেন, কিন্তু আমি গল্পলেখক হিসাবে সেইখানে সত্যজিতের কাছে হেরে গেছি। আমি ভাবতেই পারিনি কথাটা ঐ অসাধারণ ভাষায় বলা যায়। অপূর্ব বলেছিল—কাজল আছে তাই অপর্ণা নেই, এই কথাটা ভুলতে পারছি না কোনোমতে।

অসামান্য প্রেম। অসামান্য এবং মহৎ। মহৎ? স্বার্থপর নয়? গল্পকার ও নাট্যকার সত্যজিৎ দেখালেন অপূর্বর ভালবাসার সংকীর্ণতা। কাজলের মাথায় তার দাদুর লাঠি যখন উঠেছে, তখন স্পষ্টভাবে অপূর্ব বুঝল, আমরাও বুঝলুম, অপূর্বর প্রেমের বিশ্বরহিত আত্মকেন্দ্রিকতা। পরিচালক আগে থেকে তা আমাদের বোঝাচ্ছিলেন। শিশু কাজল মুখে রাক্ষসের মুখোস এঁটে পাখী মারছে—কাজল, যে অপুর ছেলে!! কাজলের নিষ্ঠুরতা অপুর আত্মমগ্নতার তীব্রতম প্রতিবাদ।

'অপুর সংসার'-এর স্মরণীয় দৃশ্যগুলি চোখের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেছে। গল্প-নাটক-কাব্যের মিশ্ররসে ভরে গেছে মন। এক কথায় রবীন্দ্রনাথের গল্পরসে। 'অপুর সংসার'-এর সংসার রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সংসার, যেমন মৃত্যুশোকার্ত অপূর্ব রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত চেহারার প্রতিরূপ। প্রতিটি মুহূর্ত যেখানে জীবন্ত, সেখানে বিশেষ করে কোনো ক্ষণকে স্মরণ করা শুধু শক্ত নয়, অনুচিত। তাতে করে অতিনাটকীয়তার প্রতি আমাদের আকর্ষণের পরিচয় দেওয়া হয়। তবু ধরা যাক, পুলুর সঙ্গে আধো-অন্ধকারে অপুর ভ্রমণ এবং যৌবনস্বপ্নের আত্মজীবনীর অংশটুকু। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় গর্ব করতে পারেন, বাংলাদেশের প্রথম তারুণ্যকে তিনি পর্দায় প্রথম সার্থকভাবে উপস্থিত করতে পেরেছেন। কিংবা ধরা যাক, নৌকার উপর অপূর্বর আবৃত্তি শুনে মাঝির নিগূঢ় অবোধ হাসি। কিংবা তা হাসি নয়—বিস্ময়, আর স্নেহ—যৌবনের আতিশয্য-দর্শনে অশিক্ষিত পিতার স্নেহময় প্রশ্রয় যেন প্রকাশিত। এই হাসির প্রসঙ্গে সত্যজিতের আত্মসংশোধন মনে পড়বে। স্মিত মন সৃষ্টিতে তিনি অনেক সময় ব্যর্থ হয়েছেন আগে, এখানে সে-ব্যাপারে অনেক স্বচ্ছন্দ। কিংবা ধরা যাক, নৌকায় অপূর্বর উপন্যাস শেষ করে ইঞ্জিনিয়ার পুলুর অগোছালো আবেগ, যেমন কাজের মানুষের হয়ে থাকে সেন্টিমেন্ট প্রকাশের সময়। তার উচ্ছ্বাসের ভাষা—'দে তো হাতটা, আগে দে দেখি।' অত্যন্ত 'ক্যাড' ভঙ্গি, যা সুনিপুণ হ'লে কিন্তু ছন্দোনাশ হতো। কিংবা ধরা যাক—। সমস্ত বইটি ধরা সম্ভব নয়, অতএব থাক।

যে বইকে আমি বাংলা চলচ্চিত্রের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি বলে মনে করি, তার বিষয়ে আমার সবটুকু বক্তব্য বলে উঠতে পারব, এমন ক্ষমতা নেই। বইয়ের ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে। বুদ্ধিমান সে-কথা জানাবেন। আমি খুশি আছি তাই যথেষ্ট। খুশি আরো এইজন্য যে, সত্যজিৎ বিভূতিভূষণের ব্যাখ্যাকে ক্ষেত্রবিশেষে অতিক্রম করেছেন এই রচনায়। সত্যজিতের মনোভূমে অপূর্বর দুই-নারী-প্রেম সম্ভব নয়, যদিও বিভূতিভূষণ তেমনি ভেবেছিলেন। প্রেমের একমুখী চিন্তা মনে আনে প্রাকৃতিক শুদ্ধতার চেতনা, যাকে বালক অপু একদিন পেয়েছিল গাছের পাতায়, পদ্মের পাপড়িতে, আকাশের মেঘে। বিভূতিভূষণের অপু সরে গেছে জীবনের অখণ্ড সমাচ্ছন্ন আবেশ থেকে বিক্ষত জিজ্ঞাসায়। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে দার্শনিক কিংবা কাল্পনিক শৈশবে। কিন্তু সত্যজিতের অপূর্ব—শৈশবস্বপ্ন থেকে উঠে এসেছে যৌবন-রসানন্দে। সেই হলো স্বাভাবিক মানসগতি। সত্যজিতের অপূর্ব অনেক মেয়ের ছায়া এড়িয়ে একটি মেয়ের ছায়াতে ছায়া মিশিয়েছে, বেঁচে উঠেছে অক্ষয় অপরিমেয় একলক্ষ্য প্রেমে। বিভূতিভূষণ গিয়েছেন। বিভূতিভূষণ চিরজীবী হয়েছেন।

॥ ২ ॥

গল্পের মৃত্যু সিনেমার জন্ম

সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার সার্থকতা ও সীমাবদ্ধতা 'দেবী' ছবিতে প্রকট হয়েছে উগ্ররূপে—সীমাবদ্ধতাই বেশি। সত্যজিৎ সব-কিছু পারেন না, যেমন—নাটক সৃষ্টি করতে। 'দেবী' ছবি দেখে এইটুকু পরিষ্কার বুঝেছি। আমাদের বোঝা যেন ভুল বোঝা হয়, সত্যজিৎ তাঁর পরের ছবিতে আশা করি তা প্রমাণ ক'রে আমাদের আশ্বস্ত করবেন।

মস্ত প্রত্যাশা নিয়ে 'দেবী' দেখতে গিয়েছিলুম। 'দেবী' প্রভাতকুমারের এবং বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। বিজ্ঞাপনে দেখলুম—'দেবী, সত্যজিৎ রায়ের বলিষ্ঠতম সৃষ্টি'। মনে মনে উল্লসিত হলুম, নিশ্চয় তাই হবে। সত্যজিতের সৃষ্টির দিক-পরিবর্তনও কল্পনা করতে লাগলুম। এবার তিনি নাটক সৃষ্টি করতে চাইছেন। এতদিন তাঁকে জগৎ-দৃশ্যের মহান দর্শকরূপে জেনেছি। বিভূতিভূষণের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা-পৃথিবীর ছবি দেখেছেন। এবার দেখবেন জীবনের নাট্যলীলা। তাই নিয়েছেন প্রভাতকুমারকে। আনন্দময় নিরাসক্ত শিল্পী প্রভাতকুমার; 'দেবী' গল্পে আনন্দের দুর্বলতা যিনি পরিহার ক'রে অতি নির্মম দ্রষ্টা হয়েছেন। 'বলিষ্ঠতম' সৃষ্টিতে সত্যজিৎ সেই ট্রাজেডির রূপ ফোটাতে চলেছেন। নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে 'বলিষ্ঠতম' বিশেষণটি নিশ্চয় সত্যজিতেরই দেওয়া। তাঁর রচনার একটি অক্ষরও তাঁর শাসনের বাইরে নয়।

আমার আরো একটি ব্যক্তিগত প্রত্যাশা ছিল। সত্যজিৎকে কোনো সময় প্রাণহীন বুদ্ধিবাদী ভাবতে পারিনি। আমার বিশ্বাস ছিল, দেশের সর্বাত্মক অনুভূতির রূপ তিনি ধারণা করতে পারেন—সমস্ত মিলিয়ে যে-দেশ আছে—আবেগ আতিশয্য বিচার

সংস্কার ও কুসংস্কার নিয়ে আমার যে-দেশ। অভিব্যক্তির ব্যাপারে সত্যজিৎ সংযত হলেও, বল্লাক্ষরের মধ্যেই যেন তাঁর ঘন আবেগকে অনুভব করেছি। তিনি দেশের কুসংস্কারকে দেখাবেন, নিশ্চয়। আবার সংস্কারের সৌন্দর্যও দেখাবেন। তিনি তিক্তকণ্ঠ সংস্কারক হবেন না। মঞ্চবক্তার দায়িত্ব তিনি নেবেন কেন? তিনি প্রকাশ করবেন সব-কিছু, ভালো এবং মন্দ, সুন্দর গভীর যা আছে।

আমি তাই ভেবেছিলুম, 'দেবী' গল্পের চিত্ররূপের মধ্যে শক্তিসাধনার উদার মহান এবং ক্ষেত্রবিশেষে অশোভন রূপের পটভূমিকা পাব। মহাকালীর নয়নের প্রসন্ন হাসি এবং রক্তাক্ত ওষ্ঠের সর্বনাশের পটভূমিকায় করুণ একটি মানবী-কাহিনী উপস্থাপিত হবে। সত্যজিতের বিজ্ঞাপনের প্রকৃতি দেখে সে বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল। বিজ্ঞাপনের ছবিতে দেখে-ছিলুম—কোথাও অতি ভীষণ ত্রিনয়ন, কোথাও দেবী-প্রতিমার মতো একটি সুন্দর নারী-মুখ, যার একার্ধ গৌর, অপরার্ধে নীলকালী। জীবন ও মৃত্যু, দিবা ও রাত্রি পাশাপাশি।

আমার সে আশা ব্যর্থ হয়েছে। হোক্‌গে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো যে একটি আশা ব্যর্থ হয়েছে তাকে 'হোক্‌গে' ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ সে আশা ধর্মাবেগ-মূলক নয়, শিল্পগত। সত্যজিৎ প্রভাতকুমারের শিল্পসৃষ্টিকে সংহার করেছেন। যদি এই চিত্র আন্তর্জাতিক পুরস্কার পায়—প্রভাতকুমারের সমাধিমূলে দাঁড়িয়ে সত্যজিৎ সে-মালা গলায় পরবেন।

সত্যজিৎ কর্তৃক বিভূতিভূষণের ব্যবহার সম্বন্ধে একই কথা উঠেছিল বাংলাদেশে। সেদিন ব্যাপারটি গুরুতর মনে হয়নি। দুজনেই দর্শক, বিভূতিভূষণ এবং বিভূতিভূষণের মধ্য দিয়ে সত্যজিৎ। যদি সত্যজিৎ কোথাও সরে গিয়ে থাকেন, বিভূতিভূষণের প্রশান্ত অনুভূতিময় সৃষ্টি তাতে বিপর্যস্ত হয়নি। কারণ বিভূতিভূষণ তাঁর রচনার মধ্যে নিখুঁত অপরিবর্তন কোনো সৃষ্টিরূপ আনেননি, এনেছিলেন সরল ব্যাপক দৃষ্টিময় ভালবাসার প্রকৃতি। সত্যজিৎ সেই ভাবদৃষ্টি ও রূপদৃষ্টিকে মোটামুটি অনুসরণ করলেই পারবেন। করেছিলেনও তাই। প্রভাতকুমারের ক্ষেত্র কিন্তু ভিন্ন। তাঁর সৃষ্টি—তার বিশেষ রূপের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। তাতে হস্তক্ষেপ করলে মূল সৃষ্টির প্রাণের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। প্রভাতকুমার 'দেবী' গল্পে একটিও অনাবশ্যক কথা বলেননি। প্রতিটি রেখা টেনেছেন প্রয়োজনে। তিনি চরম নাট্যধর্মী একটি ছোটগল্প লিখেছেন। তার সঙ্গে বড় জোর কিছু যোগ করা চলে, অত্যন্ত সাবধানে, নাটকীয় কল্পনার সঙ্গতি রেখে। কিন্তু বদলানো চলে না। একেবারে নয়।

সত্যজিৎ সেই সাহস দেখিয়েছেন। যদি তার দ্বারা মহত্তর কিছু সৃষ্ট হোত, প্রভাত-কুমারের ক্ষতিকে না-হয় মেনে নেওয়া যেত অধিকতর প্রাপ্তির খুশিতে। কিন্তু প্রভাত-কুমারের দেবী যে-রসানন্দের সৃষ্টি করেছে, সত্যজিতের দেবী তার ধারে-কাছেও যেতে পারেনি। দর্শক যখন হল্‌ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, অতৃপ্তি অস্বস্তি কিংবা সহাস্য বিরক্তিতে ভরে ছিল তার মন। আমি অসাধারণ দর্শকের কথা বলছি না, বলছি সাধারণ দর্শকের কথা। তারা গভীর বা মহৎ কিছু পায়নি। রস-নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হয়েছেন পরিচালক।

প্রভাতকুমারের রচনার সঙ্গে সত্যজিতের রচনার আভ্যন্তরীণ রূপ-পার্থক্যের সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। আমি জানি এখনি সত্যজিৎ কিংবা তাঁর পক্ষীয় কেউ সিনেমার স্বাধীনতা দাবি করবেন। কলমে লেখা গল্প আর সেলুলয়েডে ওঠানো ছবি এক জিনিস নয়। তা ছাড়া পনেরো পৃষ্ঠার একটি গল্পকে দশহাজার ফুটের ছবি করতে হচ্ছে। সে কথা ঠিক, কিন্তু এর বিপক্ষে বলা চলে, নিতান্ত গতিহীন ঐ দশহাজার ফুটের অনেকখানি অংশ নির্বাক অভিনয়ে পূর্ণ। সেই চোখে-মুখে ভাবের খেলায় নতুন কাহিনী সংযোজনের প্রয়োজন প্রায় হয়নি। দ্বিতীয়ত, যেখানে যোজনা করতে হচ্ছে, সেখানে ছবি-কর্তার নিশ্চয় এমন কোনো নৈতিক অধিকার নেই, যার দ্বারা রচনার মূল রসরূপ তিনি পরিবর্তিত করতে পারেন। সত্যজিৎ সম্ভবত কৌশলের সঙ্গে এ-ব্যাপারে আত্মসমর্থন করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারকে এই গল্পের প্লট দিয়েছিলেন, এ-কথা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে পর্দায় বিজ্ঞাপিত হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে— রবীন্দ্রনাথের প্লট, লিখেছেন প্রভাতকুমার, ছবি করেছেন সত্যজিৎ। এককথায় ত্রিবর্গীয় সাধনা। একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি,— একটা বড় ধরনের তুলনাই দেওয়া যাক—কালিদাস শকুন্তলার প্লট নিয়েছিলেন মহাভারত থেকে—সে কথা কি সত্যজিৎ, যদি তিনি শকুন্তলার ছবি ওঠান (ওঠান না সত্যজিৎবাবু, বড় সুন্দর হয়!), সাড়ম্বরে পর্দায় লিখে দেবেন? রবীন্দ্রনাথ অতি মহৎ লেখক ব'লে কি তাঁর নামের চাপে প্রভাতকুমারের সৃষ্টিগৌরবকে লঘু করব? সাহিত্যে তো শেষ রূপটিই সবচেয়ে মূল্যবান।

প্রভাতকুমার ও সত্যজিতের দেবী-র আভ্যন্তরীণ পার্থক্যের কথা তুলেছিলাম। 'দেবী' গল্পে প্রভাতকুমারের স্পষ্ট-উচ্চারিত কোনো বাণী ছিল না। বেদনা ছিল। শেষ পর্যন্ত বেদনাই চরম বাণী। প্রভাতকুমার—ঐ গল্পে কোনো মানবী দেবী হতে পারে কিনা— এই গুরুতর প্রশ্নের মধ্যে অবতরণ করেননি। তিনি দেখিয়েছেন, দয়াময়ী নামক ষোলো বছরের সুন্দর মেয়েটি দেবী ছিল না। অথচ তার উপর দেবীত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে আত্মহত্যা করে নিজের দেবীত্বের প্রতিবাদ করে গেল। তার হচ্ছে ব্যক্তিগত ট্রাজেডি। যদিও ওই ট্রাজেডির পিছনে আছে বাংলাদেশের একশ্রেণীর ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস। এইখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য চোখে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ শাক্ত-সাধনাকে সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি 'বিসর্জন'-এর মূল দুর্বলতা আছে রঘুপতির মতো চরিত্রে কোনোপ্রকার মহিমার্পণ করবার মানসিক অসামর্থ্যের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত বিরাগ রঘুপতির বিরুদ্ধে নাটকের মধ্যেই সংগ্রাম করেছে। রবীন্দ্রনাথ যদি 'দেবী' গল্প স্বয়ং লিখতেন তাহলে 'হয়ত' সেই একই ত্রুটি ঘটত। হয়ত রবীন্দ্রনাথ সে-বিষয়ে সচেতন ছিলেন ব'লেই প্লটটি প্রভাতকুমারকে দিয়েছিলেন। কিংবা হয়ত, যেটা বেশি স্বাভাবিক, বিলোবার মতো যথেষ্ট ঐশ্বর্য রবীন্দ্রনাথের ছিল। সে যাই হোক, প্রভাতকুমার 'দেবী' গল্পে দেখিয়েছেন, নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাসের ট্রাজেডিকে কিভাবে গল্পে ফোটানো যায়। প্রভাতকুমার হিন্দু ছিলেন।

প্রভাতকুমারের গল্পের রসকেন্দ্র-অনুধাবনে অসামর্থ্য সত্যজিতের সৃষ্টিকে নষ্ট করেছে। যদি এটি কাহিনীকারের গৌণ সৃষ্টি হোত, কথা ছিল না। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির (সর্বশ্রেষ্ঠ?) মধ্যে পড়ে। এই গল্পে তিনি ব্যক্তি-ট্রাজেডির এক চরম ক্ষণকে স্পর্শ করেছেন। প্রভাতকুমারের হাতে যা ছিল ব্যক্তিজীবনের ট্রাজেডি (যদিও তাতে আপেক্ষিকভাবে সমাজরূপের প্রাধান্য), সত্যজিতের হাতে তাই হয়েছে কুসংস্কারের কীর্তি। এতেই বিপত্তি। প্রভাতকুমারের এই গল্পে কোনো বৃহৎ ধর্মীয় ট্রাজেডির উপাদান নেই। ধর্মীয় ট্রাজেডির ক্ষেত্র ভিন্ন। ধর্মের খোলস চাপা পড়ে বহু মানুষ রুদ্ধশ্বাস হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু শ্বশুরের স্বপ্নাদেশে দেবী হয়ে আত্মহত্যা করেছে এমন দৃষ্টান্ত বেশি মিলবে না। বরং যদি সত্যজিৎ দেবদাসী বা ভৈরবী প্রথার উপর ছবি তুলতেন, সেক্ষেত্রে তিনি সংখ্যাগত যাতনাকে অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রকাশ করতে পারতেন। যদি বলা হয়, দেবীর দুর্গতির মূলে আছে অন্ধবিশ্বাস, তদুত্তরে বলা যায়, সে-অন্ধবিশ্বাস সর্বদেশীয়, এবং বর্তমান ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ, সচেতনভাবে উৎপীড়ক নয় কোনোমতে। সত্যজিৎ অস্থানে গুরুত্ব আরোপ করেছেন সংস্কারক হবার প্রলোভনে।

উভয়ের ঘটনা-বিন্যাসের রূপ বিশ্লেষণ করা যাক। প্রভাতকুমারের গল্পের সূচনায় আছে, বিংশতি বৎসরের যুবক উমাপ্রসাদ তার ষোড়শী পত্নী দয়াময়ীর প্রণয়মাদকতায় ভরপুর। ব্যাপারটা দেড়শো বছর আগেকার। উমাপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক মনের, সংস্কৃত ছেড়ে ফার্সী পড়ছে। দয়াময়ীকে নিয়ে তার পশ্চিমে চাকরি করতে যাবার ইচ্ছা, কারণ সেখানে দয়াময়ীকে কাছে পাওয়া যাবে দিনে-রাতে। সত্যজিৎ রায়ের বিশ্বাস নেই ফার্সী-পড়া মডার্নত্বে। সুতরাং প্রভাতকুমারের দেড়শো বছরের প্রাচীন ঘটনা সত্যজিতের হাতে তরুণতর হয়েছে। সত্যজিতের উমাপ্রসাদ কলকাতায় ইংরেজি শেখে, রামমোহন রায়ের রেফারেন্স দেয়, বিধবা-বিয়ের পক্ষে বিদ্যাসাগরের যুক্তিগুলি পড়া-শোনার ফাঁকে-ফাঁকে মুখস্থ করে। এ-সকলই সত্যজিৎকে করতে হয়েছে, কারণ তিনি 'প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের সংঘর্ষে'র মতো বৃহৎ ব্যাপার দেখাতে চান। প্রভাতকুমারে আছে—একদিন উমাপ্রসাদ ও দয়াময়ী প্রভাত পর্যন্ত "পরস্পরের বক্ষনিবদ্ধ হইয়া" নিদ্রিত, এমন সময় দ্বারের বাইরে স্বপ্নোদ্বুদ্ধ পিতা কালীকিঙ্করের আগমন এবং কম্পিত-কণ্ঠে পুত্রবধূ দয়াময়ীকে স্বয়ং আদ্যাশক্তিরূপে ঘোষণা। স্বামী-স্ত্রী দুজনের নিবিড় প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে প্রভাতকুমারের গল্পে এইভাবে বিচ্ছেদ-দেবীর প্রবেশ। সত্যজিৎ, কাহিনীর বিস্তৃতির জন্য এবং উমাপ্রসাদকে আধুনিক মনের প্রতিনিধিত্বে দীক্ষিত করবার জন্য, এই ঘটনার আগেই তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেখানে সে থিয়েটার দেখছে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, এবং ভয়াবহ-রকমে আড়ষ্ট এক শিক্ষকের কাছে জীবনাদর্শের পাঠ নিচ্ছে। আদর্শ মানে কি আড়ষ্টতা?

ওদিকে গ্রামে পুজা চলছে দয়া-দেবীর। প্রভাতকুমারের মতে প্রথম তিন-দিন দয়াময়ী কেবল কেঁদেছে এবং তিন-দিনের পর রাত্রে উমাপ্রসাদ যখন লুকিয়ে তার কাছে

হাজির হয়েছে, স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে চোখের জলে ভেসে বলেছে—'আমি দেবী নই, কালী নই, তোমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নই।' উমাপ্রসাদ পালিয়ে যাবার কথা বলাতে সাগ্রহে রাজি হয়েছে, কারণ তার বক্তব্য—'এখানে থাকলে আমি মরে যাব, নয়ত পাগল হয়ে যাব।' সত্যজিতের হাতে ব্যাপারটা ভিন্ন। দয়াময়ী 'দেবী' হবার বেশ কিছু পরে বৌদির চিঠি পেয়ে থিয়েটার ও এক্সাবিনে ব্যস্ত উমাপ্রসাদ হাজির হল বাড়িতে, কাণ্ডকারখানা দেখে সংযতভাবে চেঁচামেচি করল বাপের সঙ্গে, কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুই করতে পারল না, কারণ সেই নাটকীয় মুহূর্তে মুমূর্ষু বালককে দেবী-চরণামৃতে বাঁচানোর জয়ঢাক বেজে উঠল প্রবলভাবে। এরপর সত্যজিতের ছবিতে দয়াকে নিয়ে উমাপ্রসাদের পলায়নের মতলব থাকবে, কিন্তু তাতে থাকবে না কাহিনীর ঘনত্ব, কারণ তখন, ঐ মুমূর্ষু বালকের প্রাণলাভের ঘটনার পর থেকে দয়ার নিজের মনেই দ্বিধার সঞ্চার হবে। প্রভাতকুমারের দয়া স্বেচ্ছায় সাগ্রহে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। সত্যজিতের ক্ষেত্রে উৎসাহ-সঞ্চার করতে হয়েছে পলায়নে। প্রভাতকুমারের তাই যেখানে দয়ার পরবর্তী পলায়ন-প্রত্যাখ্যান গাঢবর্ণ, সত্যজিতে তা লঘুতাময়।

প্রভাতকুমারের গল্পে দয়া চরিত্রের তিন স্তর। প্রথম স্তরে দয়া—বধূ। দ্বিতীয় স্তরে—বধূ এবং দেবী। তৃতীয় স্তরে—শুধু দেবী। মুমূর্ষু বালকের জীবনলাভের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম স্তর বিস্তৃত, যদিও কাহিনীর দিক দিয়ে দয়ার জীবনে ইতিমধ্যে বিরাট ওলটপালট হয়ে গেছে—সে শ্বশুরের স্বপ্নলব্ধ প্রত্যাদেশ-মতো দেবী হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে বধূ থেকে গেছে ভিতরে ভিতরে; দেবীত্বে অভিষেকের তিন দিন পরেও উমাপ্রসাদের আলিঙ্গনে ও আদরে ধরা দিয়েছে, সাগ্রহে রাজী হয়েছে পলায়নে। মরণাপন্ন বালকের প্রাণলাভ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু। এই ঘটনায় এবং পরবর্তী আরো কয়েকটি ঘটনায় নিজের দেবীত্ব বিষয়ে দয়ার বিশ্বাসের সূচনা। এইখানেই তার আত্মপ্রবঞ্চনার সূত্রপাত। তবু এখানো মানবীত্ব যায়নি। দেবীতে মানবীতে মেশামেশি। পত্নীভাবে তাকে স্পর্শ করতে সে-যে উমাপ্রসাদকে নিষেধ করেছিল, তা দেবীসুলভ স্পর্শভীরু শুচিতার জন্য নয়, তার আশঙ্কা তাতে উমাপ্রসাদের অকল্যাণ হবে। উমাপ্রসাদ রাগ করতে সে আক্ষেপ করে বলেছিল, তুমিও আমাকে বুঝলে না? এর পর উমাপ্রসাদ নদীর ঘাট থেকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল এবং দয়া উঠে এল সেখান থেকে মন্দিরে। দয়ার জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ের শুরু হোল। তার জীবনের পথ থেকে তার স্বামী এখন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে; দ্বিধা জাগাতে আর কেউ নেই। দয়া এখন ভক্তের বন্দনায় এবং নিজের ধারণায় নিশ্ছিদ্র দেবী। তার আত্মপ্রবঞ্চনা ক্রমে বেড়ে উঠে তাকে এমন অবস্থায় নিয়ে গেল, যেখান থেকে সে সগর্বে ঘোষণা করতে পারল, আমি খোকাকে ভালো করে দেব। এইখানে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মতো প্রভাতকুমার ট্র্যাজেডির গভীরতম প্রত্যাশা পূরণ করেছেন: প্রথমে একটি সরল মেয়ের উপর দেবীত্বের আরোপ, তার মনের বিপর্যস্ত রূপ, তার প্রতিরোধ-চেষ্টা। তার পরে ভ্রান্তি-সহায়ক আপাত-অনুকূল কয়েকটি ঘটনার সন্নিবেশ (রোগ-নিরাময় ইত্যাদি), তার দ্বারা আত্মপ্রতারণার সূচনা, তারই

ক্রমিক ব্যাপ্তি। অবশেষে চরম ক্ষণে অতিস্ফীত অহং-এর উপর নিয়তির অভ্রাঘাত। তারপরেই শূন্যের হাহাকার। দয়াময়ীর জীবনের সেই অবস্থাটির চিত্রণ প্রভাতকুমারের শিল্প-সাফল্যের দৃষ্টান্ত। খোকার মৃতদেহের সামনে বসে যমরাজকে খোকার আত্মা খোকার শরীরে ফিরিয়ে দিতে আজ্ঞা—পরে মিনতি—ক্রন্দন—প্রার্থনা—এবং তারপরে নিজের দেবীত্বে অবিশ্বাস—নিজের হত্যাকারিণী মূর্তির স্বরূপ-বোধ—অনুশোচনা ও আত্মগ্লানির যাতনা—তারপরে আত্মহত্যা। কয়েক ছত্রে প্রভাতকুমার শ্রেষ্ঠ শিল্প সৃষ্টি করেছেন।

দয়ার চরিত্রের এই তিনটি স্তর সম্বন্ধে একেবারেই অবহিত থাকেননি সত্যজিৎ। তাঁর ছবিতে প্রতিবাদের নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান উমাপ্রসাদ খোকার মৃত্যুর পরে 'নাটকীয়' মুহূর্তে বাড়ি ফিরবে, ভগ্ন পিতাকে প্রায় নিষ্কম্পকণ্ঠে বিচারকের রায় শোনাবে—তুমিই হত্যাকারী। ঘরে ঢুকে দেখবে কাজল-মাখা সুসজ্জিতা পাগলিনী। ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে যাতনায়। একসময় দয়াময়ী ঘর থেকে বেরিয়ে নদীর পথে (যে-পথে তাকে উমাপ্রসাদ একদিন ডাক দিয়েছিল) দারুণ দৌড় দেবে; সিনেমার দর্শকের মনকে মথিত করার চেষ্টায় উমাপ্রসাদ তার সন্ধানে ছুটবে; এবং সবশেষে দেখা যাবে 'ধপাস করিয়া পতিতা' দয়ার কাছে উপস্থিত উমাপ্রসাদ (পথিমধ্যে দর্শক দেখবে বিসর্জিত দেবী-মূর্তির কাঠামো), এবং সে পত্নীর ঠোঁট-নাড়ানো থেকে বুঝে নেবে এই স্বীকারোক্তি—না না সে দেবী নয়, তারপর সব শেষ, শান্তিজল। প্রভাতকুমার থেকে সত্যজিৎ দু'কদম এগিয়ে রইলেন। প্রভাতকুমারের দয়া প্রথমদিকে পরিষ্কার বলেছিল, সে দেবী নয়। সত্যজিতের দেবী তা বলতে পারেনি, কারণ তাকে মরবার আগে শব্দহীন ঠোঁট-নাড়ার সাহায্যে সেই কথা বলতে হবে। এটা সিনেমার প্রয়োজন, স্মরণীয় দৃশ্য তো চাই! সত্যজিৎ অধিকন্তু দয়াময়ীর মতো সুন্দর মেয়েটার গলায় দড়ি দিতে পাবেন না। হার্টফেল—অমন মেয়ের চমৎকার পরিণতি—লম্বা দৌড়ের পর।

ফল কি হয়েছে? একটি গল্পের মৃত্যু এবং সিনেমার সৃষ্টি। প্রভাতকুমারের দয়াময়ী ছিল রক্তমাংসের মানুষ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। সত্যজিতের দয়াময়ী প্রথমদিকে রক্তমাংসের, ক্রমে সত্যজিতের। সত্যজিতের দয়া সত্যজিতের শাসনে বাক্যহারা। সে বাইরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকবে। ঘরে গিয়ে নাড়াচাড়া করবে স্বামীর চিঠির, টিয়ার গায়ে হাত বুলোবে, দূর থেকে খোকাকে সতৃষ্ণনয়নে দেখবে, অর্থাৎ হিসেবী অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য যা প্রয়োজন সব পাবে পরিমিত মাত্রায়, কেবল প্রাণটুকু বাদ। দেবী হয়ে দয়া সত্যই ইট-কাঠের দেবী হয়েছিল সত্যজিতের বেদীতে। সত্যজিৎ সবচেয়ে আপত্তিকর মারাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন দয়ার জীবনের শেষ অধ্যায়ের চিত্রণে। তিনি দয়ার মধ্যে অহঙ্কার দেননি (মাজেশানে দিয়েছিলেন কি, কি জানি!)। এর দ্বারা তিনি প্রভাতকুমারের অনভিপ্রেত দিকে নিয়ে গেছেন তাঁর ছবিকে। সত্যজিতের হাতে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে নিছক নিষ্ঠুর পীড়নের—ধর্মের গোঁড়ামি কিভাবে একটি মেয়েকে

শ্বাসরোধ করে মারল। সত্যজিৎ পারলে তার গলার উপরে গোঁড়াবিরর পাঁচটি আঙুল পর্যন্ত দেখাতেন। ট্রাজেডির পরিণতিতে দয়ার ভূমিকাকে তিনি নিতান্ত গৌণ করে দেখিয়েছেন। তাঁর উমাপ্রসাদ শিক্ষকের কাছে দয়ার বিষয়ে করুণ কণ্ঠে বলেছে, সে কি করবে, তাকে যা বোঝানো হচ্ছে সে তাই বুঝছে—she is only seventeen। সত্যজিতের বোঝা উচিত ছিল, সে-যুগে সতেরো যথেষ্ট বয়স ; এবং দয়া যেখানে আত্মসমর্পণ করেছে, সে-পরিস্থিতিতে সতেরো বা সাতচল্লিশে কোনো পার্থক্য আনে না। কালীকিঙ্কর দয়াময়ী সকলেই বিশ্বাসের ও অবস্থার দাস। প্রভাতকুমার সেই জিনিসটি রচনায় ফুটিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, একদিকে শ্বশুরের ধর্ম-বিশ্বাসের অন্ধতা দয়াময়ীকে মেরেছে, অন্যদিকে দয়া নিজে মেরেছে নিজেকে। গল্পে আছে দুটি হত্যা—একটি আত্মার, অন্যটি দেহের। 'মা' 'মা' রব তুলে দয়াময়ীর আত্মাকে গোড়ার দিকে মারতে চেয়েছে দয়ার গুরুজন ও গ্রামবাসী মিলে। প্রথমে বাধা দিলেও, ক্রমশ দয়াময়ী সে-হত্যাকে বরণ করে নিয়েছে। নিজের দেবীত্বে বিশ্বাস করা দয়ার আসল আত্মহত্যা। দয়া তা বুঝতে পারেনি। বুঝল খোকার মৃত্যুর পরে। তখন গলায় দড়ি লাগিয়ে আত্মহত্যা সম্পূর্ণ করে দিল। ব্যাপারটা ভিতরের এবং বাইরের। সত্যজিতের ছবিতে মৃত্যুর কারণ সম্পূর্ণ বাইরের। ফলে পীড়নের কষ্টবোধ করেছি, ট্রাজেডির গভীরতা পাইনি।

কালীকিঙ্করের জীবনের ট্রাজেডি সম্বন্ধেও সত্যজিৎ উদাসীন। কালীকিঙ্কর ভ্রান্তবুদ্ধি, কিন্তু তাঁর বিশ্বাসে ফাঁকি ছিল না। গল্পে দয়ার সামনে তাঁকে প্রণত দেখে যে-হাসি আসে তা দুঃখের, ব্যঙ্গের নয়। প্রভাতকুমার প্রহসন সৃষ্টি করতে বসেন নি। এইসব ক্ষেত্রে অবশ্য সত্যজিতের ছবি থেকেও হাসি এসেছে, তার প্রকৃতি কিন্তু একেবারে ভিন্ন। সে-হাসি সত্যজিতের রচনার গাম্ভীর্যের প্রতি দর্শকের অচেতন সমালোচনা। যে-তারাপ্রসাদ প্রভাতকুমারের গল্পে ছিল পিতৃভক্ত অনুগত পুত্র, সত্যজিতের দৃষ্টিতে সে হল হাস্যরসের উপাদান, ভাঁড়-বিশেষ। তাই কালীকিঙ্কর-তারাপ্রসাদের দেবী-ভক্তিতে দর্শকদের হাসির পুরস্কার লাভ করে সত্যজিৎ প্রহসন-রচনায় সাফল্য দেখিয়েছেন, ততোধিক নয়। সত্যজিতের অনেক আবেগঘন মুহূর্তে দর্শক মজাবোধ করেছে। সত্যজিৎ অনেক জিনিসের মতো 'অবতার' শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্র জানেন না, তাও দেখা গিয়েছে। 'অবতার' শব্দ বাংলায় মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। তাদের বেলায় বলা হয়—দেবী ভর করেছেন, স্বয়ং আদ্যাশক্তি আবির্ভূত হয়েছেন, ইত্যাদি। প্রভাতকুমারের রচনাতে তাই পাওয়া যাবে।

সত্যজিতের নাট্যবোধের অভাব আরো ফুটেছে কাহিনীর পরিণতিকালে। প্রভাতকুমারে খোকার মৃত্যু ও দয়ার আত্মহত্যা, এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান বেশি নেই। দেওয়াও চলে না। খোকার মৃত্যুর পরে যখনি দয়া নিজের দেবীত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করল, তখনি তাকে গ্রাস করেছে ভয়াবহতম অন্তর্জ্বালা। অসীম শূন্যতার মধ্যে তার স্বামীহীন নিঃসঙ্গ জীবন নিক্ষিপ্ত হয়েছে। দ্রুত আত্মনাশ তার একমাত্র পরিণতি। প্রভাতকুমারে

দয়ার অন্তর্দাহের যে-রূপ কয়েক ছত্রেও ফুটেছে—সত্যজিৎ, মনস্তত্ত্ববাদী সত্যজিৎ, সে বিষয়ে উদাসীন থেকে দয়াকে পাগলিনী বানাবার সস্তা কৌশল নিয়েছেন। দয়াকে তিনি সঙ্গে-সঙ্গে মেরে ফেলতে পারেন না, স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন দরকার। সমস্ত ব্যাপারটাকে তরল করে উমাপ্রসাদ স্ত্রীর কাছে হাজির হয়েছে, যার সমাপ্তি একটি বৃহৎ দৌড় এবং পতন ও মৃত্যুতে। এমন করতে হয়েছে, তার কারণ সত্যজিতের ছবিতে মূল ট্র্যাজেডি দয়ার নয়—সে ধর্মগোঁড়ামির শিকার মাত্র। কালীকিঙ্করের নয়—তিনি দয়ার দুর্ভাগ্যের নিষ্ঠুর কারণরূপে সকলের প্রত্যক্ষ বিদ্বেষের পাত্র। ট্র্যাজেডি হল সুন্দরী সপ্তদশী পত্নীর প্রণয়ে বঞ্চিত রীতিমতো নায়ক উমাপ্রসাদের।

সত্যজিতের কঠিন সমালোচনা করেছি। যে-কোনো সমালোচনা চেয়ে বড়ো শিল্পী সত্যজিৎ রায়। আমি তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। সেইসঙ্গে এও বুঝেছি, তাঁর সীমাবদ্ধতা আছে। তিনি জীবনের ওঠা-পড়া-ভাঙার উত্তাল রূপ দেখতে পারেন না, অন্তত এখনো পর্যন্ত পারেন নি। যা পারেন তাই যথেষ্ট। সে হল, উপর-তরঙ্গের অপূর্ব দর্শন। সংঘাতময় নাট্যরূপের কী প্রয়োজন—পৃথিবীর আশ্চর্য দৃশ্যরূপ তিনি দেখুন, আমাদের দেখান। দোহাই সত্যজিৎ রায়, বাণী দেবেন না। আমাদের উপদেশ দিতে পৃথিবীতে রুক্ষভাষী হৃদয়হীন বহু ব্যক্তি আছেন। আপনি শুধু দর্শন করুন। যদি তার দ্বারা জীবনের কোনো অসঙ্গতি প্রকট হয়, এবং মানুষ সংশোধিত হয় (তার দ্বারাই হয়), সেই ভালো। আর একটি কথা, মাঝে-মাঝে অভিনেতাদের স্বাধীনতা দেবেন। নিজের মতো করে তাঁদেরও কিছু বলবার থাকতে পারে। আপনার বিদগ্ধ সংযমের অধিকারী নয় সাহিত্যের সব চরিত্র। কী অপূর্বতা ছিল আপনার 'দেবী' ছবির প্রথমাংশে! দেখে মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর সেরা এক সিনেমা-শিল্পীর রচনা দেখছি। নিরাভরণ মৃন্ময়ীর বোধন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত। উমা-দয়ার প্রণয়-মাদকতার রূপ। দয়ার ভালবাসার বিস্তার—স্বামী শ্বশুর শিশু ও পাখী পর্যন্ত। সবই সুন্দর। তারপরে সহসা সব বদলে গেল, বাংলাদেশের অপরূপ আরতির মহিমায় ধরা রইল না স্রষ্টার মন। শেষপর্যন্ত যে নিরপেক্ষ গাম্ভীর্য ছিল প্রভাতকুমারের মধ্যে, তাকেও সম্মান করা হল না। শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়, আপনাকে বলে রাখি, যদি দ্বিতীয়বার 'দেবী' দেখতে যাই, সে যাব মাটির-দুর্গার প্রাণপ্রতিষ্ঠা থেকে বিজয়া পর্যন্ত অসাধারণ চিত্রাংশটুকু দেখবার জন্য। যাব না মৃত সমস্যার উপর উদ্দীপ্ত অস্ত্রাঘাত দেখতে। দেড়শো বছর আগেকার সামাজিক সমস্যা এখনকার সমস্যা নয়। আর যাদের মধ্যে দুর্ভাগ্যবশত সে সমস্যা থাকতে পারে, সেই মূর্খরা আপনার ছবি দেখে না। কেবল মানুষের ব্যক্তিজীবনের সমস্যা সর্বকালের। সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যাকে অবলম্বন করে সেই ব্যক্তিক বেদনায় পৌঁছেছেন বলে প্রভাতকুমারের 'দেবী' গল্পের আবেদন চিরন্তন। আপনার দেবী সেখানে সমস্যার গ্রাস্থিতে আবর্তিত।

সত্যজিৎ রায়, যাঁর উপর আমাদের প্রভূত আশা এবং আন্তরিক দাবি, তিনি যদি

জীবনের মহৎ উন্মোচক হওয়ার পরিবর্তে জাতীয় সংস্কারের উপর তুচ্ছ আক্রমণের বাহবার প্রত্যাশী হন, তাহলে অবশ্যই তিনি বাহবা পাবেন সেন্টিমেন্ট-বিরোধী প্রগতিবিলাসীর কাছে, এবং হয়ত, প্রাচ্য কুসংস্কারে শিহরিত-চিত্ত বিদেশবাসীর নিকটে। তখন হয়ত মেরী-কন্যাগণের অলৌকিক কাহিনীবহুল পুণ্যচরিতকথায় গদ্‌গদ-চিত্ত পাশ্চাত্ত্য বিচারকগণ ভারতীয় ধর্ম-গোঁড়ামির অতিবাস্তব চিত্র দেখে একটা বৃহৎ রকমের পুরস্কার সত্যজিৎকে দিয়ে ফেলবেন। শুনছি, সত্যজিৎ বিদেশী ফিল্ম-কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছেন। যদি তা ঘটে তাহলে সত্যজিতের ছোট পর্দা অনেক ছড়িয়ে সিনেমাস্কোপের ঘরজোড়া পর্দা হয়ে উঠবে। সেখানে অপূর্ব আলোক-সম্পাত হবে আমাদের কোনো অমার্জনীয় দুর্বলতার উপরে।

মহান বাঙালী শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের জীবনের সেই পরিণতি বিলম্বিত হোক, দেবীর কাছে এই প্রার্থনা করি

(সত্যজিৎ রায়ের দুই চিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে দুটি লেখা বসুধারা পত্রিকায় বেরিয়েছিল —এখানে সে দুটিকে একত্র করে দেওয়া হয়েছে। বসুধারা-র জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬ সংখ্যায় প্রকাশিত রচনার নাম ছিল, "সত্যজিৎ রায় ও অপুর সংসার", এবং চৈত্র ১৩৬৬ সংখ্যায় প্রকাশিত রচনাটির নাম ছিল, "গল্পের মৃত্যু সিনেমার জন্ম।")

নাম সূচী